ভালমন্দ

ভালমন্দ

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
সম্পাদিত

●

লেখকগোষ্ঠী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সরোজকুমার রায়চৌধুরী
প্রবোধকুমার সান্যাল
নরেন্দ্র দেব
রাসবিহারী মণ্ডল
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

●

লেখক-পরিচিতিকার
বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়
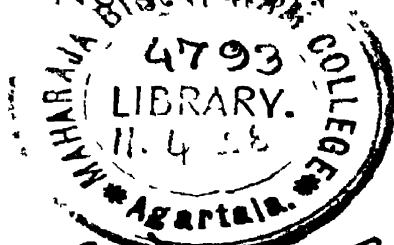
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন
সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
৯, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১
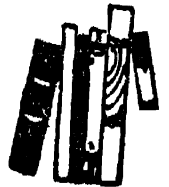
'ভালমন্দ'র জন্ম-রহস্য

১৩৪৪ সাল। আশ্বিন মাস। উদাস-করা শরতের মধ্যাহ্ন। পূজার আর বাকি নেই বললেই হয়। শরৎচন্দ্রের কলিকাতার বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। নীচের বৈঠকখানায় আরাম-কেদারাটার উপরে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন আমারই বাঞ্ছিত,—যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার জন্যে নয়, যদিও তিনি সত্যিই ক্লান্ত—খুবই ক্লান্ত, কারণ শরীরটা তাঁর মোটেই ভালো যাচ্ছিল না, তার উপর আমারই মত কে-একজন দর্শন প্রার্থী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁকে ঘণ্টা দুই বকিয়ে গেছেন।

খুবই সন্তর্পণে প্রবেশ করেছিলুম। কিন্তু তাঁর চোখে তো নিদ্রা ছিল না—তা যে অবসাদের আচ্ছন্নতা মাত্র, তাই জেগে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। প্রথমটা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, অবিনাশ, শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে—আর বোধহয় বেশীদিন দাদার উৎপাত সহ্য করতে হবে না!

চুপ ক'রে রইলুম। বেশ বুঝলুম, এ তাঁর স্বভাবসুলভ পরিহাস নয়—এর মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুর সত্য উঁকি মেরে রয়েছে।

কৈ,—কিছু বলছ না?

আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি সত্যিসত্যিই রেগে উঠলেন। বললেন, এ তোমাদের কি রকম 'কালচার' বল ত? আজকাল এই যে একটা ঢং উঠেছে, এতে মানুষ মানুষকে চিনবে কি ক'রে। আচ্ছা, আমার এই কথায় তুমি যে কষ্ট পেয়েছ তা কি আমি জানি না, কিন্তু তা প্রকাশ করতে কি অপরাধ! এতে 'কালচারের' হানি হয় কোথায়। সেদিন কি বিপদ হয়েছে জান? এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমিষ্ট্রির কত কথা বললুম, যেন তিনি কিছুই জানেন না, আর আমি সব জানি। পরে, ভদ্রলোকের এক চিঠি পাই। সেই চিঠির উপরে তাঁর ছাপা-নামের সঙ্গে যে সব ডিগ্রী দেখলুম তাতে আমার চক্ষুস্থির! আচ্ছা, নিজের পরিচয় না দিলে কে কাকে বুঝবে বল! মনের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—যা হচ্ছে তা তখনি বলতে হবে, নইলে সত্যিসত্যিই কি হচ্ছে কি ক'রে মানুষ বুঝবে!

সময় একবার এস—নিশ্চয় এস—একটা বিশেষ দরকার। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমারও কিছু লাভ হবে, অতএব না এলে নিজেই ঠকবে।

প্রশ্ন করলুম না, এতটুকু ঔৎসুক্য প্রকাশ করলুম না—পাথরের মত ভারী মন নিয়ে তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম—রৌদ্রতপ্ত রাস্তার উপর চলতে চলতে কেবলি মনে হ'তে লাগল : সত্যিই কি উনি ভিতরে ভিতরে এত রুগ্ন। এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই !

* * *

বহু আশার পরশু দিন। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন, না এলে ঠকতে হবে !

তখন সবেমাত্র বাড়ীতে ধুনো দেওয়া হয়েছে – শুধু আলো জ্বালতেই বাকি। বাইরেব বস্তু খুব স্পষ্ট নয়। পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অবিনাশ যে, তোমার কথাই আজ হচ্ছিল—আজ তুমি একটা বড রকমের উপহার পাবে।

অবাক্ হ'যে বললুম, সুরেনদা, কবে এলেন আপনি ?

তিনি বললেন, আমি তো ক'দিন এখানেই আছি। তুমি ব'স – আমি ওপরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমাকে একবার এখনি বাইরে যেতে হবে।

বাইরের ঘরে খানিকক্ষণ বসবার পরই শরৎচন্দ্র নেমে এলেন হাতে খানকতক কাগজ।

ঘবের মধ্যে এসেই চেঁচিয়ে চাযেব জন্যে হুকুম করলেন।

চা খাওযা চলতে লাগল—এ কথা সে-কথার পর হাতেব কাগজগুলো তুলে বললেন, এগুলো কিসের কাগজ বল ত ? কিন্তু আমায় কিছু বলতে হ'ল না। তিনিই বলতে লাগলেন, দেখ, এটা একটা উপন্যাসের সূচনা—ভারী ভালো জিনিস, অনেকদিন এত ভাল আরম্ভ ক'রে কিছু লিখিনি—এই লেখাটা যদি তোমাকে দিই তাহলে কি কর ?

বললুম, যা করতে বলবেন তাই করব।

বললেন, কিছুদিন ধবে একটা বড উপন্যাসের ভাব মনেব মধ্যে এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারচি না, অথচ শরীর এত খারাপ যে তাকে কাজে লাগানও যায় না। কিন্তু সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা জিনিস মাথায় এল, যদি এটাকে আমি আরম্ভ ক'রে দিলে তুমি আরো কয়েকজন সাহিত্যিককে দিযে লিখিয়ে নিতে পার, তাহলে মন্দ হবে না।

বললুম, বেশ ত। সে তো ভালই হবে।

তিনি বললেন, তবে এ ধরনের লেখায় যদি লেখকরা পরিশ্রম করতে না চায় তাহলে বই কখন ভাল হয় না। প্রথম যখন 'বারোয়ারী উপন্যাস' নামে বইটা লেখা হয়, তখন একদিন চারু এসে বললে, দাদা, এবার বাঁচান—সবাই মিলে নায়িকাকে ইডেন গার্ডেনে ঢুকিয়ে এমনি ঘোরাচ্ছে যে তাতে পাঠকদের ঘূর্ণিরোগ হ'য়ে যাবার অবস্থা হয়েছে—এখন আপনি যদি মেয়েটার একটা গতি না করেন তাহলে আমরা আর মুখ দেখাতে পারব না। বললুম, তা যা বলেছ চারু—ঠিক তাই-ই হচ্ছে—ইডেন গার্ডেন থেকে বেরুবার যেন কেউ পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আসল কথা কি জান, যারা লিখচে তারা মোটেই ভাবচে না—আর নইলে তাদের ভাববার শক্তি নেই। তারপর আমার লেখা বেরুতে ওরা নাকি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তুমি কিন্তু এমনি ভুল কিছুতেই হ'তে দিও না। যাঁদের দিয়ে লেখাবে তাঁদের যেন লেখার প্রতি দরদ থাকে, আর সেই সঙ্গে লেখার শক্তিও থাকে, নইলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

বললুম, কাদের দিয়ে লেখালে ভালো হয়, তাঁদের নাম করুন না—চেষ্টা ক'রে দেখব।

তিনি বললেন, সাহিত্যিকরা তো সবাই তোমার বন্ধু—যাকে বলবে, সে-ই তোমার জন্যে লিখে দেবে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না। আচ্ছা, নবেনের আরম্ভ-করা ঐ উপন্যাসের নাম তো 'অষ্টমী'। ওর শেষ অংশ লেখা তো তোমার?

বললুম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, দেখ, এই ধরণের উপন্যাসের শেষের লেখকের দায়িত্ব খুব বেশী। বইয়ের সবরকম lapses তাকেই শোধরাতে হয়—এ কাজে তুমি তো খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছ। সেদিন কার কাছে তোমার এই লেখা নিয়ে বলেছি বলেও মনে পড়চে—

হেসে বললুম, কারুর কাছেই বলেন নি, শুধু আমাকে খুশী করবার জন্যে আমার কাছেই বলছেন।

তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, আমি যে তোমাকে প্রশংসা করতে পারি, এটা তুমি বিশ্বাসই করতে পারচ না?

বললুম, এ বিশ্বাস করা কি সহজ।

এমনি হাসি-তামাসার মধ্যে খানিকক্ষণ কাটবার পর তিনি বললেন, আচ্ছা, কেন যেচে এই লেখাটা তোমায় দিচ্ছি বল ত ?

মুখের দিকে উৎসুক হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম।

বললেন, দেখ, যেদিন আমি থাকব না—সেদিন এই লেখাটাই তোমাকে তোমার শরৎদা'কে মনে করিয়ে দেবে। আমার হাতের লেখা এই কাগজগুলো কখন কারুকে দিও না। এই ব'লে 'ভালমন্দ'র পাণ্ডুলিপি আমার হাতে তিনি তুলে দিলেন।

কিন্তু এই লেখাটুকুই যে তাঁর জীবনের শেষ-লেখা হ'য়ে থাকবে তা তখনও ভাবতে পারিনি, কারণ এর কিছু দিনের মধ্যেই তার শরীর এত খারাপ হয় যে তিনি আর কলম ধরতে পারেন নি। লেখাটি তাড়াতাড়ি বাতায়নের পূজা-সংখ্যায় (১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪) প্রকাশ ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু সকল কথার মধ্যে তাঁর অসুস্থতার কথাটাই সবচেয়ে বড় হ'য়ে বুকের মধ্যে বাজতে লাগল। যে দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে আশ্রয় করেছিল তখন তার প্রকোপ সুরু হ'য়ে গেছে। এর পর, পুরো চার মাসও তিনি জীবিত ছিলেন না।

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুরূপ লেখকদের লেখা দিয়েই এই উপন্যাসখানা শেষ করবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেও, সামান্য অদল-বদল না ক'রে পারি নি। বইখানি সম্পূর্ণ হ'তে যে অনেক দেরি হ'য়ে গেছে তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে, সুখের কথা, বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের দিয়েই এর কলেবর পুষ্ট করা হয়েছে। যাঁরা এই উপন্যাসখানির গঠনে বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, প্রবোধ কুমার সান্যাল, নরেন্দ্র দেব ও রাসবিহারী মণ্ডল। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা যে কতখানি তা আমি লিখে বুঝাতে পারব না। আরও একটা বড় কথা। এই উপন্যাসের সূচনা যে শরৎচন্দ্রের—কোন লেখকই যে সে-কথাটা এক মুহূর্ত্ত বিস্মৃত হন্‌ নি তা তাঁদের লেখার আন্তরিকতা ও গভীরতা থেকেই পাঠক-পাঠিকারা উপলব্ধি করবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এই গ্রন্থের লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্র যাঁদের নামোল্লেখ করেছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন

তাঁদেরই অন্যতম। শরৎচন্দ্রের এই ইচ্ছার কথা শুনে তিনি যে লিখতেও সম্মত হয়েছিলেন, রাঁচী থেকে আমাকে লেখা তাঁর একখানি পত্র থেকে তা বোঝা যাবে। পত্রখানি হচ্ছে এই :

কল্যাণীয়েষু,

এখানে এসে অবধি কোন লেখা লিখে উঠতে পারছি নে। এমন কি চিঠিরও উত্তর হাতে হাতে দিতে পারছি নে। তুমি যখন লিখেছ যে, শরৎবাবুর গল্পের দ্বিতীয় ধাপ শীগ্‌গির লেখা চাই, তখন সে ধাপ যত শীগ্‌গির পারি গাঁথব। লিখতে বেশী সময় লাগে না, সময় লাগে কি লিখব তাই মনে মনে গড়ে নিতে। এক এক সময় মনটা অজন্মা হয়ে পড়ে, তখন তাকে পতিত রাখাই নিরাপদ। নইলে সে সময়ের লেখাটা হাতের লেখাই হয়, মনের লেখা হয় না। ইতি। ১৪-১১-৩৭

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এমনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন যে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আর লিখে উঠতে পারেন নি।

এই গ্রন্থের শেষে লেখকদের যে পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তার লেখক হচ্ছেন আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুসাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা বড় কম নয়।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

অবিনাশ ঘোষাল আরও বছর কয়েক চাকরি করতে পারতেন কিন্তু তা সম্ভব হোলো না। খবর এলো এবারেও তাঁকে ডিঙিয়ে কে একজন জুনিয়ার মুনসেফ সব-জজ হয়ে গেল। অন্যান্য বারের মতো এবারেও অবিনাশ নীরব হয়ে রইলেন, শুধু প্রভেদ রইলো এই যে, এবারে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সমেত অবসর গ্রহণের আবেদন যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। আবেদন মঞ্জুর হবেই এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

অবিনাশ সুজন, সুবিচারক, কাজের ক্ষিপ্রতায় সকলেই খুশী, ভদ্র আচরণের প্রশংসা সবাই করে, তবু এই দুর্গতি! এর পিছনে যে গোপন ইতিহাসটুকু আছে কম লোকেই তা জানে। সেটা বলি। তাঁর চাকরির গোড়ার দিকে, একবার এক ছোকরা ইংরেজ আই. সি. এস জেলার জজ হযে আসেন অফিস ইন্‌সপেকসনে। সামান্য ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে প্রথমে ঘটলো মতভেদ, পরে পরিণত হলো সেটা বিষম বিবাদে। ফিরে গিযে জজ সাহেব নিরন্তর ব্যাপৃত রইলেন তাঁর কাজের ছিদ্রান্বেষণে, কিন্তু ছিদ্র পাওয়া সহজ ছিল না। জজ সাহেবের মন তাতে কিছুমাত্র প্রসন্ন হলো না। রায় কেটেও দেখলেন হাইকোর্টে সেটা টেঁকে না—নিজেকেই অপ্রতিভ হতে হয় বেশী! বদ্‌লির সময় হযেছিল, অবিনাশ চলে গেলেন অন্য জেলায়, কিন্তু দেখা করে গেলেন না। শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচলিত রীতিতে তাঁর দারুণ ত্রুটি ঘটলো। তারপরে কত বছর কেটে গেল, ব্যাপারটা অবিনাশ ভুলেছিলেন কিন্তু তিনি ভোলেন নি। তারই প্রমাণ এলো কিছুকাল পূর্ব্বে। সেই ছোকরা জজ হযে এসেছেন এখন হাইকোর্টে, মুনসেফ প্রভৃতির দণ্ডমুণ্ডের মালিক হযে। অবিনাশ সিনিযর লোক, কাজে সুনাম যথেষ্ট, উন্নতির পথ সম্পূর্ণ বাধাহীন, হঠাৎ দেখা গেল তাঁকে ডিঙিয়ে নাচের লোক হয়ে গেল সব-জজ। আবার এখানেই শেষ নয়, পরে পরে আরও তিনজন তাঁকে এমনি অতিক্রম করে উপরে উঠে গেল। যাঁরা জানেন না তাঁরা বলবেন, এ কি কখনো হয়? এ যে গবর্ণমেন্টের চাকরি! তায আবার এত বড চাকরি! এ কি কাজির আমল

কিন্তু অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলবেন, হয়। এবং আরও বেশী কিছু হয়। সুতরাং, অবিনাশ মনে মনে বুঝলেন এর থেকে আর উদ্ধার নেই। আত্মসম্মান ও ও চাকরি দু'নৌকোয় পা দিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় না—যে-কোন একটা বেছে নিতে হয়। সেইটেই এবার তিনি বেছে নিলেন।

বাসায় অবিনাশের ভার্য্যা আলোকলতা, আই-এ ফেল করা পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা শাশ্বতী। ঝি-চাকরের সংখ্যা অফুরন্ত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না—এত বেশী।

সেদিন অবিনাশ আদালত থেকে ফিরলেন হাসিমুখে। যথারীতি বেশভূষা ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে জলযোগে বসে বললেন, যাক, এতদিনে মুক্তি পাওয়া গেল ছোট বৌ। সরকারি ভাবে খবর না এলেও হাইকোর্টের এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ টেলিগ্রাম পেলাম আমার জেলখানার মিয়াদ ফুরলো বলে। অধিক বিলম্ব হবে না। বিলম্ব যে হবে না তা নিজেই জানতাম।

আলোকলতা অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সেলাই করছিলেন,' এবং কন্যা শাশ্বতী পিতার পাশে বসে তাঁকে বাতাস করছিল, শুনে দু'জনেই চমকে উঠলেন।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এ কথার মানেটা কি?

অবিনাশ বললেন, শুনেছ বোধ হয় কে একজন গোবিন্দপদবাবু এবারেও আমাকে ডিঙিয়ে মাস ছয়েকের জন্যে সব-জজ হয়ে গেলেন। হগ সাহেব হাইকোর্টে আসা পর্য্যন্ত বছর তিনেক ধরে এই ব্যাপারই চল্‌চে—একটা কথাও বলিনি। ভেবেছিলাম ওদের অন্যায়টা একদিন ওরা নিজেরাই বুঝবে, কিন্তু দেখলাম সে হবার নয়। অন্ততঃ ও লোকটি থাকতে নয়। অবিচার এত দিন সয়েছিলাম, কিন্তু আর সইলে মনুষ্যত্ব যাবে।

কাল বিকেলেই সদরআলার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে এমনি ধরনের একটা কথা আলোকলতা আভাসে-ইঙ্গিতে শুনে এসেছিলেন কিন্তু অর্থ তার বুঝতে পারেন নি। এখনো পারলেন না, শুধু বললেন, তদ্‌বির-তাগাদা না করলে আজকালকার দিনে কোন্ কাজটা হয়? মনুষ্যত্ব যাতে না যায় তার কি করেছ শুনি?

অবিনাশ বল্‌লেন, তদ্‌বির-তাগাদা পারিনে, কিন্তু যেটা পারি সেটা করেছি বৈকি।

আলোকলতা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে এখনও তাৎপর্য্য ধরতে পারলেন না, কিন্তু ভয় পেলেন। বললেন, সেটা কি শুনি না? কি করেছ বলো না?

অবিনাশ বল্‌লেন, সেটা হচ্ছে কাজে ইস্তফা দেওয়া—তা দিয়েছি।

আলোকের হাত থেকে সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেল। বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বল্‌লেন, বলো কি গো? এতগুলো লোককে না খেতে দিয়ে উপোষ করিয়ে মারবার সঙ্কল্প করেছ? কাজ ছাড়ো দিকি—আমি তোমার দিব্বি করে বলচি সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।'

অবিনাশ স্থির হয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না।

দরখাস্ত যদি দিয়ে থাকো, কালই উইথড্র করবে বলো?

না।

না কেন? মনের দুঃখে ঝোঁকের মাথায় কত লোকেই ত কত কি করে ফেলে, তার কি প্রতিকার নেই?

অবিনাশ আস্তে আস্তে বললেন, ঝোঁকের মাথায় ত আমি করি নি ছোট বৌ। যা করেছি ভেবে চিন্তেই করেছি।

উইথড্র করবে না?

না।

আমার মরণটাই তাহলে তুমি ইচ্ছে করো?

তুমি ত জানো ছোট বৌ সে ইচ্ছে করিনে। তবু স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীর মর্য্যাদা এমন করে নষ্ট করে দাও যে মানুষের কাছে আর মুখ তুলে দাড়াতে না পারি, তাহলে—

কথাটা অবিনাশের মুখে বেধে গেল—শেষ হলোনা। আলোকলতা বললেন, কি তাহলে—বলো?

উত্তরে একটা কঠোর কথা তাঁর মুখে এসেছিল, কিন্তু এবারেও বলা হোলো না। বাধা পড়লো কন্যার পক্ষ থেকে। এতক্ষণ সে নিঃশব্দেই সমস্ত শুনছিল, কিন্তু আর থাকতে পারলে না। বল্‌লে, না বাবা, এ সময়ে মার ভেবে দেখবার শক্তি নেই, তাঁকে কোন জবাব তুমি দিতে পারবে না।

মা মেয়ের স্পর্দ্ধায় প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, পরক্ষণে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, শাশ্বতী, যা এখান থেকে, উঠে যা বলচি।

মেয়ে বল্‌লে, যদি উঠে যেতে হয়, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো মা। তোমার কাছে ফেলে রেখে যাবো না।

কি বল্‌লি ?

বল্‌লাম, তোমার কাছে ওঁকে একলা রেখে আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। চলো বাবা, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে। সন্ধ্যের পরে আমি নিজে তোমার খাবার তৈরী করে দেবো—এখন থাক্‌গে খাওয়া। ওঠো বাবা, চলো। এই বলে সে তাঁর হাত ধরে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ওরা সত্যিই চলে যায় দেখে আলোক নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌লেন, একটু দাঁড়াও। সত্যিই কি একবারও ভাবোনি, চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বাড়ীর এতগুলি প্রাণী খাবে কি !

অবিনাশ উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু এবারেও বাধা এলো মেয়ের দিক থেকে। সে বল্‌লে, খাবার জন্যে কি সত্যিই তোমার ভয় হয়েছে মা ? কিন্তু হবার তো কথা নয়। চাকরি ছাড়লেও বাবা পেনশন পাবেন—সে তিনশ' টাকার কম হবে না। পাশের বাড়ীর সঞ্জীববাবু ষাট টাকা মাইনে পান, খেতে তাঁর ন-দশ জন। কতদিন দিন দেখে এসেছি, খাওয়া তাঁদের আমাদের চেয়ে মন্দ নয়। তাঁদের চলে যাচ্চে, আর আমাদের তিন চার জনের খাওয়া-পরা চলবে না !

মায়ের আর ধৈর্য্য রইলো না, একটা বিশ্রী কটূক্তি করে চেঁচিয়ে উঠলেন—যা দূর হ আমার সুমুখ থেকে। তোর নিজের সংসার হলে গিন্নীপনা করিস্, কিন্তু আমার সংসারে কথা কইলে বাড়ী থেকে বার করে দেবো।

মেয়ে একটু হেসে বললে, বেশ তো মা, তাই দাও। বাবার হাত ধরে আমি চলে যাই, তুমি আর দাদা বাবার সমস্ত পেনশন নিয়ে যা ইচ্ছে ক'রো, আমরা কেউ কথা কবনা। আমি যে-কোন একটা মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করে আমার বুড়ো বাপকে খাওয়াতে পারবো।

মা আর কথা কইলেন না, দেখতে দেখতে তাঁর দু'চোখ উপচে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো।

মেয়ে বাপের হাতে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে, বাবা, চলোনা যাই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অবিনাশ পা বাড়াতেই আলোকলতা আঁচলে চোখ মুছে ধরা-গলায় বল্‌লেন, আর একটু দাঁড়াও। তোমার এ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা? এর নড়চড় কি নেই?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললেন, না। সে হবার জো নেই।

দেখো, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী—

অবিনাশ বাধা দিলেন, বললেন, তা যদি সত্যি হয় তো আমার সুখের ভাগ এতদিন পেয়েছ, এবার আমার দুঃখের ভাগ নাও।

আলোক বললেন, রাজি আছি কিন্তু সমস্ত মান-ইজ্জত বজায় রেখে এতগুলো টাকায় চলে না, এই সামান্য ক'টা পেনশনের টাকায় চালাবো কি ক'রে?

অবিনাশ বললেন মান-ইজ্জত বলতে যদি বড়মানুষি বুঝে থাকো ত চলবেনা আমি স্বীকার করি! নইলে সঞ্জীববাবুরও চলে।

কিন্তু তোমার মেয়ে? উনিশ-কুড়ি বছরের হলো, তার বিয়ে দেবে কি করে?

মেয়ের সমস্যার সমাধান করতে শাশ্বতী বললে, মা, আমার বিয়ের জন্যে তুমি ভেবোনা। যদি নিতান্তই ভাবতে চাও তো বরঞ্চ ভেবো সঞ্জীববাবু কি করে তাঁর দুই মেযেব বিযে দিয়েছেন।

উত্তর শুনে মায়ের আর একবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সজল চক্ষু দৃপ্ত হলো, ধরা-গলা মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ হয়ে কণ্ঠস্বব গেল উঁচুপর্দায চড়ে। বললেন, শাশ্বতী, পোড়ার-মুখী, আমার সুমুখ থেকে এখনো তুই দূর হযে গেলিনে কেন? যা' যা' বলছি।

যাচ্চি মা। চলোনা বাবা।

পাশের ঘরে হিমাংশু কবিতা রচনায় রত ছিল। আই. এ. পরীক্ষার তৃতীয় উদ্যমের এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তার কবিতা 'বাতায়ন' পত্রিকায় ছাপা হয়, আর কোন কাগজওয়ালা নেয় না। 'বাতায়ন'-সম্পাদক উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন, "হিমাংশুবাবু, আপনার কবিতাটি চমৎকার হয়েছে। আগামীবারে আর একটা পাঠাবেন—একটু ছোট ক'রে। এবং ঐ সঙ্গে শাশ্বতী দেবীর একটি রচনা অতি অবশ্য পাঠাবেন।" জানিনে, বাতায়ন-সম্পাদক সত্যি বলেন, না ঠাট্টা

করেন। কিম্বা তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য আছে। শাশ্বতী দেখে হাসে—বলে, দাদা, এ চিঠি বন্ধু মহলে আর দেখিয়ে বেড়িও না।

কেন বল্‌তো ?

না, এমনিই বলচি। নিজের প্রশংসা নিজের হাতে প্রচার করে বেড়ানো কি ভালো ?

কবিতা পাঠানোর আগে সে বোনকে পড়ানোর ছলে ভুল-চুকগুলো সব শুধরে নেয়। সংশোধনের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে পড়লে লজ্জিত হয়ে বলে, তোর মত আমি ত আর বাবার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িনি, আমার দোষ কি ? কিন্তু জানিস শাশ্বতী, আসলে এ কিছুই নয়। দশটাকা মাইনে দিয়ে একটা পণ্ডিত রাখলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু কবিতার সত্যিকার প্রাণ হলো কল্পনায়, আইডিয়ায়, তার প্রকাশ-ভঙ্গীতে। সেখানে তোর কলাপ মুগ্ধবোধের বাপের সাধ্যি নেই যে দাঁত ফোটাব।

সে সত্যি দাদা।

হিমাংশুর কলমের ডগায় একটি চমৎকার মিল এসে পড়েছিল, কিন্তু মায়ের তীব্র কণ্ঠ হঠাৎ সমস্ত ছত্রভঙ্গ করে দিলে। কলম রেখে পাশের দোর ঠেলে সে এ ঘরে ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, জানিস হিমাংশু, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হলো ? উনি চাকরি ছেড়ে দিলেন,—নইলে মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছিল। কেন ? কেননা কোথাকার কে-একজন ওঁর বদলে সব-জজ হয়েছে, উনি নিজে হতে পারেন নি। আমি স্পষ্ট বলচি, এ হিংসে ছাড়া আর কিছু নয় ! নিছক হিংসে !

হিমাংশু চোখ কপালে তুলে বললে, তুমি বলো কি মা ! চাকরি ছেড়ে দিলেন ? হোয়াট ননসেন্স !

অবিনাশের মুখ পাংশু হয়ে গেল, তিনি দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে স্থির হয়ে রইলেন। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তাঁর সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক প্রকার অদ্ভুত দেখালো।

শাশ্বতী পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো—উঃ—জগতে ধৃষ্টতার কি সীমা নেই বাবা ! তুমি চলো এখান থেকে নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। ব'লে, অর্দ্ধ-সচেতন বাপকে সে জোর করে টেনে নিয়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল

দুই

নদীর তীরে যখন শাশ্বতী তার বাবার সঙ্গে পৌছল তখন সূর্য্য সবে অস্তমিত। ভাঙ্গা মেঘের উপর সোনালি আলো প'ড়ে পশ্চিম দিকটা ঝলমল্ ক'রছে। পাখীরা সেই দিকে দ্রুত উড়ে চ'লেছে যেন দিনের হারান সৌভাগ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্যে!

একটু দূরে একটা বটগাছের পাশ দিয়ে পাথর-ঘাট নেবে গেছে; সেটা আড পড়ে বলে সেদিকে বড়-একটা কেউ যায় না। অবিনাশ সেই ঘাটটাতে বসতে ভালবাসতেন। সেদিনও তাঁরা সেইদিকে গেলেন। বিস্তৃত চাতালের উপর বসলেন অবিনাশ; আর দু'ধাপ নীচে তাঁর পায়ের কাছে বসল শাশ্বতী।

পশ্চিমে, খানিকটা দূরে একটা টিলার উপর মন্দির। সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। তার প্রতিধ্বনি পাথর-ঘাটের পিছনের ভাঙ্গা নীল-কুঠির দীর্ণ-বিদীর্ণ থিলেনগুলোর গহ্বরের মধ্যে গোঁ গোঁ ক'রে গোঙাতে লাগল।

দু'জনেই স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন। মনটা না থিতোলে কথা কওয়া অসম্ভব।

কিছুক্ষণ পরে শাশ্বতী প্রথমে কথা কইলে: কোথাও চ'লে গেলে ভালো হয় না, বাবা?

কোথায় আর যাব মা?

কিন্তু ·· শাশ্বতী থেমে গেল।

মুস্কিল এড়িয়ে চলায় আরাম থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে আরাম পঙ্গু মনেরই কাম্য তোমার মা তোমার দাদা ঠিক যে কি জন্যে আমার চাক্‌রি· রাখাটা সম্ভব হচ্চে না, তা বুঝে উঠ্‌তে পারে নি······

কোনদিন পারবে ব'লেও তো মনে হয় না বাবা।

কেন শাশ্বতী, এমন কথা ব'লছ? ওদের ওপর হয়ত' অবিচার ক'রবো, যদি ওদের এম্নি ক'রে দেখি।

শাশ্বতী চুপ ক'রে রইল।

অবিনাশ বল্লেন: পৃথিবীর যত-কিছু বাদ-বিসম্বাদ, মতভেদ, অনৈক্য—এ সবেরই গোড়ায় আছে পরস্পরকে না বুঝতে পারা···ওরা আমাকে ঠিক বুঝে

উঠতে পারছেনা... কিন্তু শাশ্বতী, তোমার মার সঙ্গে আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ... ওদের ছেড়ে গেলে, ওরা আর কোনদিন আমাকে বোঝার চেষ্টাও ক'রবে না।

কিন্তু বাবা, মা তোমার জীবন নিশ্চয় দুর্ভর করে তুল্‌বে; আর মা একলা হ'লেও রক্ষে ছিল। দাদা সঙ্গে থাকায় কোন দিন ব্যাপারটাকে ঠিক নিরপেক্ষভাবে বুঝে দেখার কথাও ওদের মনে আসবে না।

না আসাই সম্ভব মা, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্য নিয়ে ক'জন জীবন কাটিয়ে যেতে পারে? আমি চাচ্চি সুদুর্লভ বস্তু; তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে আমাকে হয়ত আজীবন, তিলে তিলে, পলে পলে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে!

কিন্তু এত খতিয়ে এত তলিয়ে কে দেখে বাবা, তোমার মত?

অবিনাশ মৃদু হাসলেন; বল্লেন: তাতেও কিছু এসে যায় না। লোকেব বাহবা পাওয়ার জন্যেই শুধু কেউ যদি এ কাজ করে তো বলতেই হবে যে সে ঘোর বোকা! আমার মান, সেতো নিতান্ত আমারই। যে একটু দূরে গেছে তার পক্ষে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা কি সম্ভব?... ওরা একটু দূরে সবে গেছে—তাই তোমার মত ওরা পাচ্চে না দেখতে, আমাব উপব তোমাব যে আকর্ষণ— তা হয়ত...

শাশ্বতী অধীর হ'য়ে ব'লে, বাবা, আমি মাকে একটুও কম ভালোবাসিনে

অবিনাশ হাস্‌তে লাগলেন—শাশ্বতী বলেই চ'ল্ল: শুধু আমাব সঙ্গে মতে মেলেনা সেইখানেই যেখানে জীবনেব ছোট সুখ, ক্ষুদ্র আরামকেও বড় করে

ঠিক তাই, শাশ্বতা!

চাকর এসে বল্লে: মা ডাক্‌চেন।

তুমি এগোয গোন্না: আমরা যাচ্চি

একটু ইতস্ততঃ করে গোন্না বলে: সঙ্গে নিয়ে যাবাব কথা ব'লে দিয়েছেন·

অবিনাশ উঠে পড়ে বল্লেন: তাগিদটা একটু কড়া বলেই মনে হয়,—চলো, দেরি ক'রে কাজ নেই...

পথে আস্‌তে আসতে শাশ্বতী মনে করেছিল যে, তাব মার সঙ্গে, বাবাব খাবাব তৈরি নিয়ে শেষপর্য্যন্ত, একটা ছোট-খাট লড়াই বেধে যেতে পারে। একদিন এই নিয়ে কারুর কোন খেয়ালই ছিল না; কিন্তু আজ যা ঘটতে চ'লেছে—তারপর

জোর-জবরদস্তি ক'রলে—ফাটার চিড়টা ফাটলে দাঁড়াবে গিয়ে। বাবার দিক দিয়ে এগুলো শেষ পর্য্যন্ত মারাত্মক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তিনি সমস্ত দুঃখ নিঃশব্দে বুকের মধ্যে বইতে চান—চুপ-চাপ !

শাশ্বতী আঁচলে তিন্‌টে বড় বড় গাঁট বেঁধে বার বার প্রতিজ্ঞা ক'রলে : কিছুতেই আর কারুর সঙ্গে ঝগড়া নয়। চুপ, চুপ, চুপ !

অবিনাশ ঢুকলেন বাথরুমে স্নান ক'রতে, শাশ্বতী খাবার ঘরে ঠাঁই ক'রে গিয়ে দেখলে,—খাবার তৈরি ক'রে ঠাকুর হাঁটুর উপর দুটো হাত লম্বা করে ব'সে আছে ; আর মা, সাজাচ্চেন খাবারগুলো।

শাশ্বতীকে আড়চোখে দেখে মা জিজ্ঞেস ক'রলেন—কৈ তিনি ?

আসচেন মা, বাথরুমে।

তুই ঠাঁই করে দে।

দিয়েছি মা।

উনি এলে তুই গা-ধুয়ে নিগে যা,—মিছি মিছি দেরী করিস নে।

কথার উত্তর না দিয়ে শাশ্বতী অন্য জায়গায় চ'লে গেল।

গা-ধুয়ে নেওয়ার মধ্যে আর একটি তাগিদ নিহিত ছিল। বাবার খাবার তৈরি করে তাঁকে খাইয়ে—সেই পাতে খাওয়া ছিল শাশ্বতীর দীর্ঘদিনের নিয়মিত কাজ. আজ তার প্রথম ব্যতিক্রম।

শাশ্বতীকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার সময় তার মা আপত্তি করেছিলেন যে, পাঠের অভিনিবেশে মেয়েরা গৃহস্থালী কাজের অবহেলা করে। কথার মধ্যে সত্য হয়ত কিছু ছিল : তাই অবিনাশ এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ ব্যবস্থার ফলে ঘরে বাইরে শাশ্বতীর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঘরের লোককে প্রতি নিয়তই শাশ্বতীর রান্না বলে দিয়ে যেত যে পাচক ব্রাহ্মণের ঐ কাজ শুধু অনধিকার চর্চা নয়, ধৃষ্টতার একটা অভ্রান্ত পরিচয়।

তার উপর আর যা ছিল সেটি পিতা-পুত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। যে রান্নাটি শাশ্বতী প্রাণমন দিয়ে রাঁধত তার প্রশংসায় মুখর হতেন অবিনাশ, কিন্তু খেতেন সবচেয়ে কম করে। গিন্নী আপত্তি তুল্লে ব'লতেন হাসতে হাসতে : 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'—ওগো, উপনিষদের এই বাণী মহর্ষি জীবনে মূর্ত্ত ক'রে গেছেন : আমার শুধু অক্ষম অনুকরণ।

সেদিন শাশ্বতী খেতে ব'সে অবাক্ হ'য়ে গেল, আর পরিষ্কার বুঝলে যে এবার তার বাবার জীবনে নূতন পালা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। যেখানে ভোগের শেষ,—ত্যাগের সূচনা, সেই পরিবর্ত্তনই দেখা দিয়েছে।

অন্যদিন্ অবিনাশ খাওয়ার পর নিজের বিছানায় এসে বসেন আর শাশ্বতী পাশের কোচ থেকে সেদিনের খবরের কাগজটা প'ড়ে শোনায় কিন্তু সেদিন তিনি গিয়ে ব'স্লেন পাশের ঘরের লেখার টেবিলে —যে টেবিলটার পাশেই তাঁর স্ত্রীর বিছানা।

শাশ্বতী পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে : বাবা, আজকের কাগজ।

এই যে যাচ্চি মা, একখানা চিঠি লিখে দিয়ে···

অন্যদিন হ'লে শাশ্বতী নিশ্চয় জিজ্ঞেস্ ক'রত : কাকে চিঠি দিচ্চ বাবা? কিন্তু আজ তার যেন সে সাহস নেই, সে নৈকট্য নেই,—সে যেন কোথায় স'রে গেছে। মনের এই শূন্যতা তাকে প্রায় মুহ্যমান ক'রে দিয়েছিল।

ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়ল শাশ্বতী। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তার মনের উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেছে, তাতে শুধু শ্রান্ত, ক্লান্ত ক'রে দিয়ে যায়নি তাকে—একটা নিদারুণ অবসন্নতায় যেন সে ডুবে গেল।

কোনদিন অবিনাশ খাওয়ার পর লেখার ঘরে যান না। লেখার কাজ তো দূরের কথা। এত বড় কি জরুরি চিঠি, কাকেই বা দেওয়া হচ্চে, আজ? যেটা লেখার জন্যে তার ডাক প'ড়ল না!

শূন্যতার আকাশে অভিমানের মেঘ জমা হচ্ছিল, অবশেষে চোখ দুটি যেন সীসের মত ভারী হ'য়ে গেল।

রাতে যখন ঘুম ভাঙল তখন শাশ্বতী দেখ্লে তার মাথার শিয়রের আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, আর বাবার বিছানায় তিনি নেই। বুকের মধ্যে যেন সমস্ত পৃথিবীটা একটা রূঢ় ধাক্কা দিয়ে গেল। বিছানার উপর উঠে ব'স্তে সে শুন্‌তে পেলে তার বাবা মাকে ব'লছেন : হয়ত' তুমি যে কথা ব'লছ, তার মধ্যে দূরদর্শিতা আছে; কিন্তু আমার মনে হয় যে, শাশ্বতীকে কিছুতেই তুমি রাজী ক'রাতে পারবে না।

কথার খেই ধ'রে নিতে শাশ্বতীর একটুও দেরি হ'ল না। সে মনে-মনে বল্লে : ও! মা আমাকে সরিয়ে দিয়ে সংসারটা ছোট ক'রে নিতে চান্।

স্ত্রী উত্তর করলেন : ওর মতামতের দামই বা কি! বল না গো? রুগী কি

স্বেচ্ছায় ওষুধ খায়? ছেলেরা কি নিজের ইচ্ছেতে পড়াশুনো ক'রতে চায়? দেখছ ত' নিজের ঘরে! তেমনি, মেয়েদের বিয়ে আর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথায়, ঠিক ভূতের ভয়ের মতই ভয়! জোর না ক'রে উপায় কি?

ও ত' সাধারণ মেয়ের মত নয়! তা ছাড়া···

গিন্নী তাড়া দিয়ে উঠলেন: ব'লচি যা' তা' তোমাকে ক'রতেই হবে; ওর বিয়েটা যত শিগ্‌গির পার দিয়ে দাও। কি হবে-না-হবে সে আমি পরে দেখ্‌ব।

শাশ্বতী উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল। তার মার কথা সে কল্পনা দিয়ে ধ'রতে পারে, জানে যে কি বলা হবে; কিন্তু বাবা যে কি ব'লবেন তা' কল্পনার নাগালের বাইরে! কিন্তু সেই কথাই তার জীবনের কম্পাস!

আগ্রহে শাশ্বতীর দেহ আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে রইল। কিন্তু অবিনাশ আর কথা কইলেন না।

তাড়া এল: চুপ ক'রে রইলে যে?

চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় কি? তোমার জেদ যখন, তখন আর কারুর কোন কথা বলা সাজেও না, উচিতও নয়। যা' ব'লছ তা' করার চেষ্টা ক'রব। তারপর, বাকিটা ভাগ্য আর ভগবানের হাতে রইল।

ও-সব গোলমেলে কথা শুন্‌তে চাইনে। তোমার ছুটি হ'লে তুমি চ'লে যাও ক'লকাতা। আর পনর দিনের মধ্যে ঠিক ক'রে ফিরে এস।

পনর দিনের মধ্যে কিছু ঠিক করতে হলে তোমাকেও সঙ্গে যেতে হয়!

আমি? আমি যাব কলকাতা—বাপের বাড়ী, এই কালামুখ নিয়ে? এ জীবনে তা আর হবে না।

তবে?

সঙ্গে নিয়ে যাও তোমার ঐ ধিঙ্গী, বিদ্যেধরীকে···

এতক্ষণে শাশ্বতী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। সে জানত যে এতবড় দুঃসময়ে বিয়ের কথাটাই কঠোর নিদ্দয়তা—তার বাবার উপর; ঠিক হওয়া বিয়ে এমন হলে ভেঙ্গে যায়! কিন্তু তার মাকে সে চিন্‌তো, এই দুঃসময়েব সুযোগে নিজের সুবিধে করে নিতে তাঁর কোথাও বাধত না। তিনি সঙ্গে যেতে চাইলে শাশ্বতী হয়ত পালিয়ে আত্মরক্ষা করত; কিন্তু এই শেষের প্রস্তাবটির সম্ভাবনা ছিল অগণিত, অপরিমিত। তাই সে সুস্থ বোধ করলে।

তারপরই তার মনে হ'ল যে তার পক্ষের একটা ভুল কি উল্‌টো পাল্‌টা চালে সব ভেস্তে যেতে পারে; সেই বিকেলের প্রতিজ্ঞার কথা ও মনে করে মনে মনে বল্লে: শুধু সাবধান! তারপর নিজের জিভটা দাঁতে চেপে ধ'রে রইল—পাছে একটা কথা ফ'সকে বেরিয়ে যায়।

অবিনাশ নিঃশব্দে ফিরে এলেন নিজের বিছানায়, তারপর এপাশ ওপাশ করে দিনের প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি বুঝেছিলেন, শাশ্বতী জেগেই আছে।

যখন ও-ঘরের নিশ্বাসের শব্দে বোঝা গেল যে মানুষটা ঠিক ঘুমিয়েই পড়েছে তখন শাশ্বতী ধীরে ধীরে উঠে অবিনাশের পায়ের কাছে বসে তাঁর পা দু'খানি নিজের কোলের উপর নিতেই রুদ্ধ অশ্রু ঝ'রে পড়ে সিক্ত করে দিলে তার পরম আশ্রয়ের স্থলটি।

অবিনাশ নিঃশব্দে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শাশ্বতী সঙ্গে গিয়ে বল্লে: কোথায় যাচ্ছ, বাবা?

ঘরের মধ্যে দম যে বন্ধ হয়ে আসে, মা। একটু ছাদে গিয়ে বসব।

তাই চলো বাবা!

দুজনে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন।

দিকচক্রের উপর শুকতারা উঠে স্নিগ্ধ আলোতে আকাশের অনেকখানি পরিষ্কার করেছে। পাখীরা চোখ চেয়ে চমকে উঠে আহ্বানের বাণী উচ্চারণ করে বলছে: আর দেরি কেন? এস, এস!

অদূরে মঙ্গল-আরতির শাঁক-ঘণ্টা বেজে উঠল মন্দিরে। স্নানার্থীদের সকালের ভজনের জবাবে পথের কুকুরগুলো ঝামরে উঠচে।

শাশ্বতী চাপা গলায় বল্লে: একটু ঘুমুতে পারনি, বাবা?

অবিনাশের শান্ত গম্ভীর মুখে প্রদোষের আকাশের রশ্মি-রেখার মতই মৃদু-হাসি ক্ষীণ হয়ে ফুটে উঠল: তিনি বল্লেন: ঘুমিয়েছি বৈকি, গোড়ার দিকটায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শাশ্বতী বল্লে: তবে কি আমার বিয়ে দেওয়াই স্থির করলে বাবা?

অবিনাশ আবার হাসলেন, বল্লেন ধীরে ধীরে : কোন কিছুর ঠিক করা মানুষের হাতে নেই, এই ভরসা। মানুষ এক মনে করে, ভগবানের বিধানে ঘটে আর একটা কিছু বিচিত্র এবং অভিনব, শাশ্বতী! তোমার মা জিদ ধরেছেন ; না বল্লে জান ত' প্রলয় সুনিশ্চিত ; দেখি না—ও দিক দিযেই কোথায় গিয়ে দাঁড়ান যায়।

একটু উত্তেজনার সঙ্গে শাশ্বতী বল্লে : আর আমি যদি বলি—না।

তাও শুনব, বলে তিনি হাসলেন : ঐ জন্যেই বুঝি, মানুষের আছে দুটো কান। কিন্তু সত্যের পথ একটি মাত্র। সেইটের সন্ধানে এতদূর এগিযে এসেছি, যে, আর ফেরার উপায় নেই! পথে বাধা আসেই, তাকে নিঃশব্দে অতিক্রম করতে হবে, মা। বৃথা লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করতে চাইনে, মা! আর তার বয়সও নেই।

কিন্তু বাবা···

তোমাকেও শান্ত হতে হবে—তোমাকেও শ্রেয়র পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার ভার, হয়ত আমারই হাতে। তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার দাদাকে অস্বীকার করে তোমার জীবনটা হবে এমন অস্বাভাবিক, ফাঁকা এবং নিরাবলম্ব, যে সে কথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। এর সমন্বয় খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই। এ কথা তোমার ভুললেও চলবে—কিন্তু আমার পক্ষে হবে সমূহ কর্ত্তব্যহানি!

শাশ্বতী দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বল্লে : কিন্তু মাব মতলবটা আন্দাজ করতে গেলেও আমি যে হয়ে উঠি বড অধীর।

শাশ্বতী, অধৈর্য্য কোন দিক দিয়েই তোমার কি আমার পক্ষে কল্যাণের হবে না, নিশ্চয়। সেটা ভালো করে বুঝে আমাদের চিত্ত করতে হবে স্থির, আর দৃঢ়।

কিন্তু বাবা, সত্যের খাতিরে মাকে আমাব বলাই কি ঠিক নয় যে আমি চাইনে বিয়ে করতে।

সত্যের ঠিক ঐ রকমের দাবির তাগিদ—এখনও এসে পৌছযনি ত তোমার কাছে। তুমি যে কথা আজ জেনেছ, সেটা এখনও আসে নি তোমার ন্যায অধিকারেব ভিতর দিযে।

কিন্তু বাবা, মাতো চাইচেন আমার বিয়ে?

সে তাঁর মুখ্য চাওয়া নয় ; সেটা তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে একটা উপায় মাত্র তোমার সঙ্গে আমার যোগ ছিন্ন হযে গেলে তিনি আশা করছেন, আমার ভুল আমি বুঝতে পারব। এ চাকরি না হয়, অন্য কোন চাকরি স্বীকার করতে

পারি। এত বড় হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে আমার এই ব্যাপারটা যে পৃথিবীর আর সব ভালো-মন্দ—হিতাহিত তাঁর কাছে ছোট হয়ে গেছে।

শাশ্বতীর বুক ভিজে যেতে লাগ্‌ল চোখের জলে।

সে আর্দ্র কণ্ঠে বল্লে: বুঝেছি বাবা, তোমার শান্ত প্রতীক্ষার মানে। এ আত্ম-সমর্পণ নয়। আমার এই বিশ্বাস যে তোমার তৌলের মানদণ্ড এত সোজা যে তার ভুল হবার ভয় নেই।·· তুমি যদি আমাকে বিয়ে ক'রতেও বল কোনদিন, তো আমি একবারও ভেবে দেখব না —চোখ-কান বুজে···

অবিনাশ হাস্‌তে হাস্‌তে শাশ্বতীর মাথায় আদর ক'রে হাত বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন ক'রলেন: আর, যদি বিষ খেতে বলি?

একটা কর্কশ কণ্ঠের ভীষণ চীৎকারে দুইজনেই চম্‌কে উঠলেন।

গিন্নী রণ-চণ্ডী মূর্ত্তিতে দু'হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এসে বল্লেন: মতিচ্ছন্ন না হ'লে মিন্‌সে নিজের মেয়েকে বিষ খাওয়াতে শেখায়· ·

দুজনে হতভম্ব হ'য়ে ব'সে শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রোধোদ্দীপ্ত রণচণ্ডিকা অগ্নি-শিখার মত লেলিহান জিহ্বা আস্ফালন ক'রে বল্লেন: যদি মার মেয়ে হই, আজই দিচ্চি সরকারের কাছে দরখাস্ত ক'রে যে অবিনাশ ঘোষালের মাথা খারাপ—আর, এও দেব লিখিয়ে যে, আত্মীয় স্বজন—আর কেউ নয়,—তার নিজের মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারার ফন্দিতে তার মগজ গজ্‌ গজ্‌ ক'রছে!

নির্বাক অবিনাশ—দূরে স'রে গিয়ে নদীর উপর সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শাশ্বতী নীচে পালিয়ে গেল।

তিন

ভাগলপুরের এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায়—কলকাতায় চলে যাওয়া। শাশ্বতী চুপি-চুপি তার বাবাকে বললে, তাই চল বাবা, দিনকতক অন্তত হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচবে।

শেষ পর্য্যন্ত তাই স্থির হ'লো।

শাশ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ রওনা হ'লেন। আলোকলতা হিমাংশুকে ডেকে বললেন, বলে দে তোর বাবাকে—শাশ্বতীর বিয়ের সব ঠিক ক'রে তবে যেন সে বাড়ী ফেরে। নইলে আমি কিছু বাকী রাখবো না বলে' দিচ্ছি।

হিমাংশু তখন তার কবিতার মিল নিয়ে ব্যস্ত ছিল, মুখ তুলে জানালার বাইরে একবার তাকিয়ে বললে, তারা চলে গেছে।

ওদিকে শাশ্বতী সারা রাস্তা তার বাবাকে বলতে বলতে চললো, কিন্তু দেখো বাবা, তোমার যেমন ভোলা মন, সেখানে গিয়ে মামার কাছে তুমি যেন আমার বিয়ের নামটি পর্য্যন্ত মুখে এনো না!

অথচ এত বড় মেয়ে, বিয়ে না দিলেও ভাল দেখায় না।

অবিনাশ জানেন, কেন সে বিয়ে করতে চায় না। তাই খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ একসময় তার মুখের পানে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন তুই কি ভাবিস, হারে পাগলী, তুই শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে?

শাশ্বতী বললে, নিশ্চয়।

অবিনাশ হেসে বললেন, না রে না। তোর মা—

কথাটা কিন্তু শাশ্বতী তাঁকে আর শেষ করতে দিলে না। বললে, থামো বাবা, মা'র কথা আর বোলো না।

এদিকে কলকাতায় পৌছেই সব গেল গোলমাল হ'য়ে।

শাশ্বতীর মামা নিবারণ অবিনাশকে দেখেই বলে উঠলেন, প্রয়োজন না থাকলে ঘোষালমশাই কোথাও আসেন না, তা আমি জানি। তা এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে? আমার চিঠি বোধহয় পাননি?

শাশ্বতী মামাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই নিবারণ বললেন, আয় মা আয়, অনেকদিন তোকে দেখিনি। কেমন আছিস?

ভাল। ব'লে শাশ্বতী অন্দরমহলে চলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী। শাশ্বতীর কিন্তু সবই এখানকার চেনা। মামার বাড়ীতে থেকেই মামাতো বোনেদের সঙ্গে সে ইস্কুলে পড়েছে।

শাশ্বতী চলে যেতেই নিবারণ বললেন, কন্যাদায় বড় দায়, না কি বলেন ঘোষাল মশাই?

এই বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চিঠি লিখেছিলে ?

নিবারণ বললেন, হ্যা, সে-চিঠি আপনার না পাবারই কথা। পরশু লিখেছি। চলুন, ভেতরে চলুন। রাত জেগে এসেছেন, সকাল সকাল স্নানাহার করে' বিশ্রাম করুন।

তারপর কথা প্রসঙ্গে অবিনাশ জানতে পাবলেন, তাঁবা এখানে পৌছোবার আগেই আলোকলতার চিঠি এসে পৌঁচেছে। নিবারণের প্রতিবেশী বীরেন-ডাক্তারের স্ত্রী নাকি আলোকলতার বান্ধবী। তারই একটি ছেলে এবছর এম-এ পাস করে' ল' পড়ছে। তারই সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে। কথাটা চলছে অবশ্য চিঠি-পত্রে। এইবার আলোকলতার ইচ্ছে—সেইটে পাকাপাকি হয়ে যাক্। কারণ শাশ্বতী বড় হয়েছে, তাকে আর রাখা চলে না।

অথচ নিবারণ বললেন, লতির চিঠি পেয়েই খবর নিলাম। বীরেন ডাক্তার সপরিবারে চেঞ্জে গেছেন মধুপুরে। ফিরতে দেরী হবে।

অবিনাশ কি যে বলবেন বুঝতে পারলেন না।

নিবারণ বললেন, পূজোর ছুটির পর আপনার যদি ছুটি না থাকে আপনি তখন চলে যেতে পারেন। শাশ্বতী এখানে থাকবে। আমি সব ব্যবস্থা করে' আপনাকে জানাব।

বোঝা গেল, অবিনাশের চাকরিতে ইস্তফা দেবাব কথাটা আলোকলতা তাকে জানান নি।

অথচ এখানে কিছুদিন থাকতে হ'লে কথাটা একদিন জানাজানি হবেই। কাজেই সেটা আর তিনি গোপন রাখা প্রয়োজন মনে করলেন না। বললেন, ফিরে যাবার দবকার হবে না নিবারণ। আমবা এখন কিছুদিনেব জন্যে তোমার বাড়ীতে অতিথি হলাম।

ছুটি নিয়েছেন বুঝি ?

অবিনাশ বললেন, পূজোর ছুটির পর থেকে ছুটি নিয়েছি। তা ছাড়া, চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্যেও দরখাস্ত করেছি ভাই। ব'লে হাসতে লাগলেন

তিনি ভেবেছিলেন বুঝি সংবাদটা শুনে বোনের মত ভাইও একটুখানি চমকে

উঠবে, অন্তত এত বড় একটা কুকার্য্যের জন্যে কৈফিয়ৎ তাঁকে একটা-কিছু দিতেই হবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, নিবারণ চম্‌কেও উঠলেন না, কৈফিয়ৎও তলব করলেন না, উল্‌টে বরং তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে' বসলেন ভালই করেছেন। বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত চাকরি করার মত পাপ আর কিছু নেই।

বাবা, এই ঘরে?

শাশ্বতীর কণ্ঠস্বর শুনে বাবা এবং মামা দু'জনেই ফিরে' তাকালেন।

দোতলার দক্ষিণদিকের সব শেষের ছোট ঘরখানি শাশ্বতী তার বাবার জন্যে এরই মধ্যে দখল করে' বসেছে।

ঘরে ঢুকেই দেখা গেল কোমরে কাপড় জড়িয়ে একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে শাশ্বতী তাদের 'হোল্ডল্‌' খুলে পরিপাটিভাবে তার বাবার জিনিসপত্র একটি একটি করে' সাজাচ্ছে।

নিবারণ বললেন, শাশ্বতী দেখছি পাকা গৃহিণী হয়ে পড়েছে। নিজে কেন মা, রাত জেগে এসেছ, চাকর-বাকর দিয়ে—

শাশ্বতী হাসতে হাসতে বললে, আমি না সাজিয়ে দিলে বাবার পছন্দ হবে না, মামা।

এই বলে' সে একবার তার বাবার দিকে একবার মামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এইবার তোমরা এইখানে বসে বসে গল্প কর। আমি চললাম মামীমার কাছে।

বলেই সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলকাতায় এসে এ কি হ'লো শাশ্বতীর?

ভাগলপুরে থাকতে কেমন যেন সে দিন দিন গম্ভীর হয়ে পড়ছিল, কিন্তু কলকাতায় দু'একদিন থাকবার পরেই হঠাৎ যেন আবার তার সেই কিশোরী জীবন ফিরে এলো। বাড়ীতে দাসদাসীর অভাব নেই, তবু সে সারাটা দিন ছুটে ছুটে সংসারের কাজকর্ম্ম করে, বাবাকে খেতে দেয়, মামীর হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে বলে, তুমি বসে থাকো মামীমা, আমি সব ক'রে নিচ্ছি দ্যাখো!

কিন্তু তার এই মামীমাটি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ঠিক তার মায়ের উল্‌টো পিঠ। এত বড় লোকের স্ত্রী, গর্ব্ব নেই, অহঙ্কার নেই, ঘর-সংসারের কাজ আর স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই দিন কাটান।

কি যেন একটা কথা বলবার জন্যে শাশ্বতীকে সেদিন তিনি তাঁর কাছে বসিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। কথাটা বলতে বোধ হয় লজ্জা হচ্ছিল। শাশ্বতী মামীমার অবস্থাটা বুঝতে পারলে। বললে, কি বলবে বল না মামীমা!

মামীমা শেষে কি আর করবেন, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বললেন, তোর মামা, কাল দেখলাম, খেতে বসলো আর উঠলো। কেন বল্ দেখি?

শাশ্বতী ভাবলে বুঝি তারই কোনও অপরাধ হয়েছে। তাই সে হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে উঠলো। বললে, কেন মামীমা? আমিই ত' খেতে দিয়েছিলুম!

মামীমা বললেন, ওঁর খাবার সময় আমি কাছে বসে গল্প না করলে ওঁর খাওয়াই হয় না। অথচ তোর বাবার কাছে বসে কথা বলতে আমার লজ্জা করে। কাল থেকে তোর মামাকে আমি খেতে দেবো এই ঘরে। কেমন?

শাশ্বতী বললে, বেশ ত', তাতে আর কি হয়েছে মামীমা!

কিন্তু মামীমা ভাবলেন শাশ্বতী বুঝি বা দুঃখিত হ'লো। তাই তিনি বারংবার তাকে বলতে লাগলেন, তুই কিছু মনে করিস নি মা। আমাদের চিরকালই এম্‌নি।

শাশ্বতী সেইদিনই বিকেলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলো চিঠি লেখবার জন্যে। অবিনাশ ও নিবারণ চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। শাশ্বতীর মামাতো বোন রেবা পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকলো।

মামাতো বোনেদের মধ্যে রেবার এখনও বিয়ে হয়নি। শাশ্বতীর চেয়ে বছর-দুইএর ছোট।

রেবা নিঃশব্দ পদে তার পিছনে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে শাশ্বতী তা বুঝতে পারে নি। রেবা হঠাৎ খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠতেই শাশ্বতী পিছন ফিরে বললে, ওমা, চমকে উঠেছিলুম!

রেবা জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চিঠি লিখছ দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে?

শাশ্বতী বললে, লুকিয়ে নয় রেবা, অনেকদিন পরে মাকে হঠাৎ মনে পড়লো—তাই মাকে চিঠি লিখছি।

রেবা বললে, আমি ভেবেছিলুম বুঝি বীরেন ডাক্তারের ছেলেকে।

যাঃ! বলে শাশ্বতী চিঠিখানা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

রেবা বললে, চল দিদি একটু ঘুরে আসি। অনেকদিন বাড়ী থেকে বেরোই নি।

কোথায় যাবি ? বায়োস্কোপ ?

চল না যেখানে হোক। গাড়ীখানা রয়েছে, নিয়ে বেরিয়ে যাই চল।

রেবা আর শাশ্বতী বেশ করে সেজেগুজে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। শাশ্বতী ভেবেছিল বায়োস্কোপেই যাবে, কিন্তু রাস্তায় গিয়ে রেবার মত হঠাৎ গেল বদ্‌লে। ড্রাইভারকে বললে, ভবানীপুরে চল—দিদির বাড়ী।

রেবার বড়দিদি সুলতার শ্বশুরবাড়ী ভবানীপুরে। শাশ্বতীও বললে, হ্যাঁ ভাই সেই ভালো। বড়দিকে অনেকদিন দেখিনি।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের আসতে দেখে সুলতার আনন্দের আর সীমা রইলো না। কি করে যে তাদের আদর-অভ্যর্থনা করবে সেই ভেবেই সে অস্থির হয়ে উঠলো।

তাদের সঙ্গে গল্প করে', তার দু'বছরের খোকাকে নিয়ে হাসি-রহস্য করতে করতে সুলতা হঠাৎ শাশ্বতীকে ধরে বসলো, অনেকদিন তোর গান শুনিনি শাশ্বতী।

রেবা বললে, ঠিক বলেছ দিদি।

গান শাশ্বতীকে বাধ্য হয়েই গাইতে হলো।

অনেকদিনের অনভ্যাস সত্ত্বেও গাইলে চমৎকার।

রেবাও গাইলে।

গান শেষ হতেই পাশের ঘরে কার যেন গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সুলতা ডাকলে, ঠাকুরপো, শোনো, এ-ঘরে এসো ত' একবার।

রেবা ও শাশ্বতী দু'জনেই শশব্যস্ত হয়ে নিজেদের একটুখানি সামলে নিলে। রেবা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ঠাকুরপো কবে এলেন দিদি ?

সুলতা বললে, দিন দশেক হ'ল এসেছে বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে।

বলতে বলতেই প্রিয়দর্শন একটি যুবক সাহেবী পোষাক পরে ঘরে এসে ঢুকলো। বললে, আমায় ডাকছিলে বৌদি ?

সুলতা বললে, হ্যাঁ ঠাকুরপো। কই ত্যাখো ত' এই দুজনকে, দুজনেই আমার বোন।

সুকুমার একবার দু'জনেরই মুখের পানে তাকালে।

সুলতা বললে, এইবার বল তোমার কোনটিকে ভাল লাগলো!

সুকুমার বললে, কাউকে না।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। সে নীরবতা ভেঙ্গে দিলে রেবা। হঠাৎ সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

হাসি শুনে সুকুমার তখন দরজার বাইরে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।

সুলতা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছিস্ যে?

রেবা বললে, ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন দিদি?

কি জিজ্ঞাসা করব?

রেবা বললে, ওরকম গোঁফ কামানো মেয়েমুখো ছেলেদের আমার পছন্দ হয় না দিদি।

চার

সুলতা হেসে বল্লে—তুই ত ভারী ফাজিল হ'য়েছিস রেবা!

বাঃ, ওরা আমাদের পছন্দ ক'রে রায় দিতে পারে, আর আমরা দিলেই দোষ!—রেবা একটু রাগের ভান ক'রে বল্লে।

পুরুষ আর মেয়েতে তফাৎ নেই? আমি বাপু সেকেলে মানুষ, তোদের ও হালফ্যাশানের সমান অধিকার-টধিকার বুঝি না—সুলতা জবাব দিলে।

রেবা এবার হেসে উঠল! হেসে বল্লে—বেকায়দায় পড়লেই সেকেলে সেজে পার পাবে, সেটি হচ্ছেনা দিদি! সেকেলে কোন্ নিয়মে বলে যে দুজন যুবতী মেয়ের সামনে একজন অচেনা ছেলেকে ডাকিয়ে এনে পছন্দ করাতে হয়!

তোর সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই বাপু!—সুলতা উঠে পড়ে বল্লে,—দাঁড়া তোদের জলখাবারের যোগাড় দেখি।

হ্যাঁ, ভাল করে লৌকিকতা [illegible] আমরা [illegible]টে যেতে পারি!—রেবা ঠাট্টা ক'রে হেসে উঠল।

সুলতা তার পিঠে একটা আস্তে কিল বসিয়ে বলে গেল—তুই বড় বাড় বেড়েছিস রেবা !

খনিকক্ষণ রেবা ও শাশ্বতী একা পড়ল।

রেবা খানিক ঘরের এধার ওধার ঘুরে এটা ওটা নেড়ে হঠাৎ বল্লে—আমার কিন্তু এখনও গায়ের জ্বালা মেটেনি।

শাশ্বতী প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে বল্লে—কেন !

রেবা ভুরু কুঁচকে বল্লে—কেন ? তুমি বুঝতে পারছো না ! তোমার বুঝি লাগেনি একটু !

শাশ্বতী হেসে বল্লে—ও তুই বড়দির ঠাকুরপোর কথা বলছিস !

—তা ছাড়া কি ? বিলেত থেকে খুব ভদ্রতা শিখে এসেছেন ! হাটে গরু কেনার মত বলে গেলেন—কাউকে পছন্দ নয়। আমরা যেন ওঁর পছন্দর আশায় বসেছিলাম।—রেবার গলায় এবার রীতিমত ঝাঁঝ !

শাশ্বতী হেসে ফেল্লে এবার।—তুই যে সত্যি রেগে গেছিস !

রাগব না ?—রেবা তীক্ষ্মস্বরে বল্লে—কি আস্পর্দ্ধা ভাব দেখি ! বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে নিজেকে কি মনে করেন !

শাশ্বতী এবার রেবাকে শান্ত করার চেষ্টায় বল্লে—কিন্তু বড়দির এভাবে ডেকে জিজ্ঞেস করাটা ভাল হয়েছে কি ?

বড়দির ত কাণ্ডজ্ঞান নেই, স্বীকার করছি, কিন্তু উনি কি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শেখেন নি, না, বিলেত ঘুরে এসে এদেশের মেয়েদের মানুষ বলে গণ্য করেন না !

রেবার গলা এবার রীতিমত চড়া। শাশ্বতী একটু সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে—অত চেঁচাসনি ! শুনতে পাবে যে !

শুনতে আমি পেয়েছি, শুনতে পাওয়াটা দরকার ছিল !

রেবা ও শাশ্বতী দুজনেই চমকে ফিরে তাকালে। দরজার কাছে সুকুমার এসে দাঁড়িয়েছে।

সুকুমার ঘরের ভেতর আর একটু এগিয়ে এসে বল্লে,—আমার অভদ্রতার জন্যে আমি আপনাদের কাছে মার্জ্জনা চাইতেই আসছিলাম। এখন আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সেটা বোধহয় দুর্ল্লভ হবে।

শাশ্বতী ও রেবা দুবার মুখ চাওয়াচায়ি করলে। অবস্থাটা বেশ একটু অস্বস্তিকর, এমনকি রেবার মত সপ্রতিভ মেয়ের পক্ষেও।

তবু সেই প্রথম কথা বল্লে—আপনার এ মার্জ্জনা চাওযাটাও বোধহয় বিলাতী কায়দা!

না, একেবারে খাঁটি স্বদেশী—এর পেছনে কৃতকর্ম্মের জন্যে আন্তরিক অনুশোচনা আছে।

শুনে সুখী হলাম!

কিন্তু মার্জ্জনা করলেন কিনা বোঝা গেল না!

মার্জ্জনাটা কি অত সহজে চাইলেই পাওয়া যায়!—রেবা এবার হেসে ফেল্লে।

সুকুমার হেসে বল্লে—আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখানে একটু বসে তাহলে আমার কৈফিয়ৎটা এবার দিতে পারি। দেখুন, বৌদির ওপর রাগটা প্রকাশ করতে গিয়ে সেটা অসাবধানে আপনাদের গায়ে ছিটকে যেতে পারে আমার খেয়াল হয়নি। বৌদির ওভাবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করা অন্যায় কিনা বলুন?

বৌদির কি অন্যায় হল শুনি? বাঃ, এই যে দিব্যি এর মধ্যে আলাপ জমিয়ে বসা হয়েছে। অথচ আমার সামনে বলা হ'ল কাউকে পছন্দ নয়।—সুলতা দুজনের জলখাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

উনি আমাদের কাছে মার্জ্জনা চাইতে এসেছেন বড়দি!—রেবা হেসে বল্লে।

থালা সাজাতে সাজাতে সুলতা বল্লে—মার্জ্জনাটা কার কাছে—তোর না শাশ্বতীর?

রেবা হেসে উঠে বল্লে—তোমার ভারী পচা সেকেলে মন বড়দি। একটি ছাড়া আর তোমার কোন ভাবনা নেই।

সেইটেইত সবার সেরা ভাবনা—তোরা জেনেও স্বীকার করিস না আর আমরা করি—এই ত তফাৎ! আচ্ছা, এখন খেয়ে নে দেখি। সুলতা থালা দুটি দুজনের দিকে এগিয়ে দিলে।

কিন্তু আমিত এখন খেতে পারব না বড়দি শাশ্বতী কুণ্ঠিতভাবে জানালে।

সুলতা অবাক হয়ে বল্লে—কেন, খাবিনা কেন?

শাশ্বতী একটু চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বল্লে—বাবাকে না খাইয়ে আমি খাইনা।

এমন একটা কিছু বিস্ময়কর উক্তি নয়, তবু ঘরের সবাই খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সুলতা তারপর স্নিগ্ধস্বরে বল্লে—কিন্তু এখন ত তুই সেখানে নেই, পিসেমশাইকে জলখাবার দেবারও লোক আছে—তুই তবে খাবিনা কেন ?

শাশ্বতী তবু মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

সুলতা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, রেবা তাকে বাধা দিয়ে বল্লে—ওকে আর অনুরোধ কোরোনা বড়দি। ও যা বলেছে তার আর নড়চড় হবে না।

সুকুমার এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি, এইবার সে সোজাসুজি শাশ্বতীকেই বল্লে—আপনার বাবাকে আপনি খুব ভক্তি করেন ত।

শাশ্বতী কোন জবাব দিলে না। রেবাই তার বদলে বল্লে—ভক্তি বল্লে কিছুই বলা হয় না। ও যেভাবে তাঁর সেবা করে, এযুগে আমরা ত কল্পনাই করতে পারি না।

রেবা আরো কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, শাশ্বতী এবার বাধা দিয়ে বল্লে, এসব বলে আমায় লজ্জা দিচ্ছ কেন রেবা ! বাপ মার সেবা করার ভেতর বাহাদুরীর কি আছে ? সবাই তা করে থাকে !

কিন্তু তোমার সেবা ত সাধারণ নয়!—রেবা যেন তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ জানালে।

আমার বাবাও ত সাধারণ নন !—শাশ্বতীর গলার স্বরের গাঢ় আন্তরিকতায় সকলে যেন হঠাৎ চমকে উঠল।—তিনি যা করেছেন এবং সে জন্যে যা তিনি সহ্য করেছেন সে কথা মনে করলে আমার সেবা ত তুচ্ছ হয়ে যায় !

আবেগভরে কথাগুলো বলে ফেলে শাশ্বতী যেন একটু লজ্জিত হয়েই চুপ করলে।

রেবাই তার অস্পষ্ট কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে বল্লে,—সত্যি পিসেমশাই যে অমনভাবে এতদিনের চাকরি ছেড়ে আসবেন আমরা ভাবতে পারিনি !

এবার সুকুমার কৌতূহলী হয়ে তিনি কি চাকরি করতেন জিজ্ঞাসা করলে এবং তারপর রেবার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাকরি ছাড়ার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত সে সংগ্রহ করেছে দেখা গেল।

শাশ্বতীকেই তারপর গম্ভীরভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে—এরকমভাবে চাকরি ছেড়ে আসাটা কি সত্যি তাঁর ভাল হয়েছে ?

শাশ্বতী এ কথায় উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। হঠাৎ সমস্ত ঘর সুকুমারের উচ্ছ্বসিত অদম্য উচ্চহাসির শব্দে যেন ফেটে যাচ্ছে—সে যেন অতি কষ্টে এতক্ষণ সে হাসি চেপেছিল, এখন আর রোধ করে রাখতে পারছে না।

সুলতা পর্য্যন্ত এবার একটু অপ্রসন্ন স্বরে বল্লে—মাথা নেই মুণ্ডু নেই, কি পাগলের মত হাসছ বলত ঠাকুরপো—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

সুকুমার হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে, —আমায় মাফ করো বৌদি—বিশ-বাইশ বছর মুন্সেফী করার পর 'সবজজি' না পেয়ে ওপরওয়ালার ওপর অভিমান করে চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা কি অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্ব আমি তাই বোঝবার চেষ্টা করছি।

শাশ্বতীর সমস্ত মুখ এবার রাঙা হয়ে উঠেছে দেখা গেল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বল্লে,— আপনার বিলেতী বুদ্ধি নিয়ে আপনি তা বুঝতে পারবেন না !

দরজার কাজে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সুকুমার বল্লে,—আমার বিলেতী বুদ্ধিতে অন্ততঃ আমি এইটুকু বুঝি যে পিতৃভক্তি যত ভাল জিনিসই হোক, তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে—সে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া শুভও নয় শোভনও নয়। কোন মেয়ের পক্ষে সে রকম অতিরিক্ত ভক্তিতে তন্ময় হওয়া এবং বাপের পক্ষে সেরকম ভক্তি নেওয়া—দুই-ই সমান অন্যায়।

সুকুমার কথাগুলো বল্লেই বেরিয়ে চলে গেল। শাশ্বতী খানিক চুপ করে থেকে আর নিজেকে সামলাতে পারলেনা। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বল্লে, —আমি এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারব না, বাবা !

পাঁচ

সেবার দুর্গা পুজা কার্ত্তিক মাসে পড়েছিল ব'লে ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের ছুটি এবং হাইকোর্টের ছুটি মাত্র দশ বারো দিনের আগু-পিছু শেষ হ'য়ে গেল। অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর হ'তে সাধারণতঃ বিলম্ব হয়, তাই অবিনাশ

সঙ্গে সঙ্গেই অবসরপূর্ব্ব-ছুটির জন্যেও দরখাস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। চাকরির উপর থেকে মনটা এমন প্রবল ভাবে উঠে এসেছিল যে, ইস্তফার আবেদন মঞ্জুর হওয়া পর্য্যন্তও তার মধ্যে অবস্থান করতে প্রবৃত্তি ছিল না।

ছুটি মঞ্জুর হ'য়েছিল পূজার ছুটির পর আদালত খোলার প্রথম দিন থেকে। সুতরাং নূতন মুনসেফকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দেবার জন্য অবিনাশকে একবার ভাগলপুরে যেতে হ'ল। জননীর হস্তে আশঙ্কিত নিগ্রহ হতে পিতাকে যথাসম্ভব রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে শাশ্বতী অবিনাশের সঙ্গে ভাগলপুর যাবার জন্যে বিশেষ পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু মাত্র দিন চার পাঁচের জন্যে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অবিনাশের নিতান্তই অনাবশ্যক মনে হ'ল। বিশেষতঃ এখন থেকে ব্যয়ের কথাটাও উপেক্ষা করলে চলবে না,—শাশ্বতীর যাতায়াতে যে টাকাটা ব্যয় হবে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে দেখলে, সেটা আর উপেক্ষা করার মতো সামান্য নয়।

কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে অবিনাশ বললেন, একা অসহায় ভাবে আমাকে পেলে তোমার মাব মনে আমার প্রতি করুণার মাত্রা একটু বেড়ে যেতে পারে শাশ্বতী। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে যদি তাঁর মতের কতকটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে, তাহলে—তাহলে চাই কি—

কথা শেষ করতে অবিনাশকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শাশ্বতী হেসে ফেলে বললে, তাহলে মাকে এখানে নিয়ে আসবে, তাই বলছ ত বাবা ?

ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে অবিনাশ উত্তর দিলেন; না, ঠিক তাই নয়। তবে তা হলে হয়ত তাঁর সঙ্গে আমাদের যা হয় একটা কোনো রকম সন্ধি-টন্ধি সম্ভব হতে পারে।

এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে শাশ্বতী বললে, আচ্ছা বাবা, তাহলে তুমি একাই যাও, কিন্তু কাজ হবে গেলেই চলে এস, বিলম্ব কোরো না। আর, মা যদি আসতে চান তাহলে সঙ্গে নিয়ে এস।

অবিনাশ এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নিবারণ যথানিয়ম ক্লাবে তাস খেলতে গেছেন। রেবা বাড়ি নেই, তার এক বান্ধবীর জন্মদিনের উৎসবে সেই যে সকালে গিয়েছে, এখনো প্রত্যাগমন করেনি।

শাশ্বতী তার ঘরে বসে নানা প্রকার চিন্তায় মগ্ন ছিল। আজ চার দিন হল অবিনাশ ভাগলপুরে গিয়েছেন। পৌঁছে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি দিয়েছিলেন, তারপর আর কোনো চিঠি পত্র আসে নি। কেমন করে সেখানে তাঁর দিন কাটছে সেই ভাবনায় শাশ্বতীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন তরুবালা—অর্থাৎ শাশ্বতীর মামীমা। শাশ্বতীর পালঙ্কের নিকটে এসে ডাকলেন. শাশ্বতী।

মামীমা ?

সুকুমার তোর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

পালঙ্ক হতে অবতরণ ক'রে তরুবালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, কে সুকুমার ?

সুলতার পিসতুত দেওর। সুলতাদের বাড়ীতে তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ত বললে।

শাশ্বতীর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ছায়াপাত হ'ল; অসরস কণ্ঠে সে বল্‌লে, হ্যাঁ, হয়েছিল, কিন্তু সে এত সামান্য যে, তার জন্যে আমার কাছে তাঁর ত কোনো দরকার থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

তরুবালা বললেন, না, দরকারও হয়ত তেমন কিছু নেই। এসেছিল জামাইয়ের সঙ্গেই দেখা করতে; তিনি ভাগলপুরে গেছেন শুনে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অবিনাশের সঙ্গে-সুকুমার দেখা করতে এসেছিল শুনে শাশ্বতী যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ল। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তার পিতার চাকরি ত্যাগ সম্পর্কে যৎপরোনাস্তি আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করতে পেরেছে, আজ সে সহসা কি কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তা জানবার জন্যে কৌতূহল উদগ্র হ'য়ে উঠল। ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লে. বাবার সঙ্গে কি দরকার, তা কিছু তোমাকে বলেছেন ?

না তা বলে নি

কথাটা শাশ্বতীর জানতে ইচ্ছে হচ্চে বটে, কিন্তু তথাপি কৌতূহলকে সংযত ক'রে নিয়ে সে বল্‌লে, আমার কিন্তু দেখা করতে একটুও ইচ্ছে করছে না মামীমা—যা হয় একটা কিছু বলে কাটিয়ে দিতে পার না ?

সুকুমারের সঙ্গে দেখা করবার বিষয়ে শাশ্বতীর এই আপত্তি অবিবাহিতা বয়স্কা

কন্যার স্বাভাবিক সঙ্কোচের অতিরিক্ত আর কিছু হতে পারে ব'লে তরুবালা সন্দেহ করলেন না। তা ছাড়া, সুকুমারের মত একজন উচ্চ শিক্ষিত সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির মধ্যে শাশ্বতীর একটা খুব বড় রকম সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও থাকতে পারে বিবেচনা ক'রে তিনি সুকুমারের সঙ্গে শাশ্বতীর সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করলেন। বললেন, তুই বাড়ী আছিস বলেছি; বেবা বাড়ি নেই, তাও শুনেছে। এখন কি বলে কাটাই বল ত? কুটুম্বের ছেলে—হয়ত অপমানিত মনে করবে। কাজটা ঠিক ভাল হবে না শাশ্বতী।

একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদুস্বরে শাশ্বতী বল্‌লে, তা হলে যাই—দেখাই করি। কোথায় আছেন তিনি?

দক্ষিণ দিকের বৈঠকখানা ঘরে। তুই গিয়ে একট গল্প-টল্প কর, একট পরে আমি চা আর খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুমিও চলনা মামীমা।

তরুবালা বল্‌লেন, আমি ত' এতক্ষণ ছিলাম, তুই গিয়ে একট বোস। চা জলখাবার নিয়ে না হয় আমিই যাব অখন।

আর কোনো কথা না ব'লে শাশ্বতী বৈঠকখানা ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

শাশ্বতী!

ফিরে দাঁড়িয়ে তরুবালার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শাশ্বতী বল্‌লে, কি বলছ?

শাশ্বতীর আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টিপাত ক'রে তরুবালা বল্‌লেন, চট্ ক'রে কাপড়টা বদলে নে। সেই সিপিবা রঙের শাড়িটা পর্।

প্রস্তাব শুনে শাশ্বতীর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল,—ও মা, কেন!

বাইরে যাচ্ছিস্, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'যে যাওয়াই ত ভাল।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে শাশ্বতী বললে, কিছু দরকার নেই মামীমা। যে শাড়ি প'রে আছি তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, এর দ্বারা তোমার বৈঠকখানা ঘরের একটুও অমর্য্যাদা হবেনা। ব'লে সে এগিয়ে গেল।

ব্যস্ত হয়ে তরুবালা বললেন, ওরে শোন্ শোন্ শাশ্বতী, শুনে যা একবার!

ফিরে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী বললে, আবার কি হোল?

আয়, তোর চুলটা একটু ঠিক করে দিই। ব'লে তরুবালা শাশ্বতীর এলো খোঁপাটা আর একটু ঝুলিয়ে বেঁধে দিলেন, তারপর দু'পাশের শিথিল

অলক গুচ্ছগুলা কানের পাশে ঠিক করে গুঁজে দিয়ে এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টভাবে শাশ্বতীর মুখ নিরীক্ষণ ক'রে প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন, আচ্ছা হযেছে যা।

এবার শাশ্বতী না হেসে থাকতে পারলে না, বললে, কাণ্ড কি তোমার মামীমা? ক'নে দেখাতে পাঠাচ্ছ না-কি আমাকে?

সহাস্য মুখে তরুবালা বললেন, তা কেমন করে বলব বল্‌, পাঠাচ্ছি কি পাঠাচ্ছিনে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা কিছু কি বলা যায়!

তেমনি হাসিমুখে শাশ্বতী বল্‌লে, তা যদি বলা না যায়, তা হ'লে অনর্থক এসব হাঙ্গামা কেন করছ বলত?

আর অধিক বাগ বিস্তার না ক'রে তরুবালা বললেন, আচ্ছা, সার্থক-অনর্থকের তর্ক অন্য সময়ে করা যাবে অখন; এখন শিগগির যা, অনেকক্ষণ একা ব'সে আছে।

শাশ্বতী বৈঠকখানা অভিমুখে প্রস্থান করলে। মুখে সে আর কিছু বললে না, মনে মনে বললে, তর্কের কোনো প্রযোজন নেই মামীমা। অনর্থক,—একেবাবে ষোল আনা অনর্থক! তোমার সুকুমারচন্দ্র নিরেট পাথবের এমন একটি উঁচু পাহাড়ের উপর আসন পেতে বসেছেন যে, এদিকের জল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কোনো আশঙ্কাই নেই!

তরুবালার সঙ্গে কথোপকথনে যে কৌতুক-হাস্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই বিলীয়মান ক্ষীণ আভাটুকু অধরে বহন ক'রে শাশ্বতী বৈঠকখানার দ্বার প্রান্তে উপনীত হ'ল। ঘরের ভিতর পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু ত' অপসৃত হ'যে গেলই, অধিকন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখমণ্ডলে একটা দুর্নিবার কাঠিন্য এসে দেখা দিল।

আজ আর সুকুমারের দেহে বিলাতী পোষাক নেই, আজ সে ধুতি ও পাঞ্জাবিব দ্বারা ষোল আনা বাঙালী সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে এসেছে। শাশ্বতীকে দেখে আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্তকরে সহাস্যমুখে সে বল্‌লে, নমস্কার মিস্‌ ঘোষাল। ভাল আছেন ত?

শাশ্বতীও যুক্তকরে বললে, নমস্কার। আপনি ভাল আছেন?

সুকুমার বললে, এতদিন পরে বাড়ি ফিরে এসে ভাল নেই বল্‌লে আপনারা আমার বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করবেন। সুতরাং ভাল না থাকলেও বলতে হবে ভাল আছি। ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে শাশ্বতী বললে, মামীমা বলছিলেন, আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

সুকুমার বললে, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে এসেছিলাম। পরমুহূর্তেই সংশোধন ক'রে নিয়ে বললে, তাঁর সঙ্গে আমি ঠিক দেখা করতে আসিনি। বাবা আসবেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, আমি এসেছিলাম তার দিন আর সময় ঠিক ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে।

এ কথা শুনে শাশ্বতীর কৌতূহল বর্দ্ধিত হল; বললে, আমার বাবার সঙ্গে আপনার বাবার পরিচয় আছে না-কি?

সাক্ষাৎ পরিচয় বোধহয় নেই। অর্থাৎ, সামনা-সামনি দেখাশুনো কখনো বোধহয় হয়নি।

তবে?

সার্ভিসের দরুণ আমার বাবা আপনার বাবাকে জানেন।

সার্ভিসের দরুণ? কি কাজ তিনি করেন?

তিনি মুনসেফ্ ছিলেন, সম্প্রতি সবজজ হয়েছেন।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম?

সুকুমার বল্‌লে, গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়।

একটা বিজাতীয় ঘৃণায় শাশ্বতীর মুখ মলিন হ'য়ে উঠ্‌ল। কর্কশ কণ্ঠে সে বল্‌লে, তা, বাবার সঙ্গে তাঁর আবার কি দরকার পড়ল?

শান্তকণ্ঠে সুকুমার বল্‌লে, আপনার প্রশ্ন আর প্রশ্ন করবার ধরণ থেকে আমি বুঝতে পারছি, গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় নামটা আপনার জানা আছে; অর্থাৎ আপনার বাবাকে ডিঙিয়ে যাঁকে সবজজ করা হয়েছে তাঁর নাম যে গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, তা আপনি জানেন।

হ্যাঁ, তা জানি।

তেমনি শান্তকণ্ঠে সুকুমার বললে, যদিও এই ব্যাপারে বাবার কোনো দিক থেকে কোনো অপরাধই নেই, তবু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে এর সঙ্গে জড়িত হ'য়েছেন ব'লে নিজেকে অপরাধীর মতই মনে করেন। বাবা আসবেন আপনার বাবার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে।

রোষ এবং শঙ্কা মিশ্রিত মুখে শাশ্বতী বল্‌লে, না না, ও-সব আপনারা করবেন

না! আমার বাবা সাধারণ হিসেবের বাইরের মানুষ—তাঁকে আপনারা বুঝবেন না। অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন!

শাশ্বতীর এই অকরুণ মন্তব্যে সুকুমারের বেদনাহত মুখ মলিন হ'য়ে উঠল। দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বললে, মিস্ ঘোষাল, যতক্ষণ না আমি আমার সেদিনকার আচরণের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারছি, আমি আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি; সুতরাং আপনার কাছ থেকে আমি সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারিনে। কিন্তু আমার বাবা ত' আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেন নি, তাঁর প্রতি অযথা কঠোর হয়ে আপনি তাঁর সম্পর্কে অবিচার করছেন।

সুকুমারের এই অনুযোগে শাশ্বতী একটু লজ্জিত হ'ল। অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বললে, আমি যদি তেমন কিছু অন্যায় কথা বলে থাকি অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার বিপদ হয়েছে এই যে, আমাদের দুঃখ-বেদনার কথা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবে আমি কিছুতেই ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারিনে!

শাশ্বতীর কথা শুনে সুকুমারের মুখে নিঃশব্দে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হ'ল। অনুনয়ের স্বরে সে বললে, মিস্ ঘোষাল, সেদিনকার অপরাধের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যে অনুগ্রহ করে আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন। যতক্ষণ আপনার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি, কোন আশাই আপনার কাছে আমার নাই।

কৈফিয়তের কথা উঠায় কৈফিযৎ শোনাবার জন্যে শাশ্বতীর মনেও খানিকটা আগ্রহ যে হয়নি, তা বলা যায না। গতদিনের সুকুমারের আচরণ এবং কথা-বার্ত্তা এবং বিস্ময়জনক ভাবে কদর্য্য, এবং তার তুলনায আজকের কথা এবং আচরণ এতই ভদ্র এবং সংযত যে, একটা কোনা বিশেষ কারণের অস্তিত্ব ব্যতীত এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ব্যাপারের সমন্বয় করা অসম্ভব।

মিস্ ঘোষাল!

শাশ্বতী নীরবে সুকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

আমার সেদিনকার ব্যবহারের যদি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারি তাহ'লে আমি যে একটি আস্ত পাগল তাই প্রমাণ করা হবে না কি? অতএব কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টাই করি। আমার প্রথম অপরাধের কৈফিয়ৎ সেদিনই কতকটা দিয়েছিলাম, আজ তার একটু স্পষ্ট করে দিতে চাই। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর একটা পদ্ধতি আছে তা নিশ্চয় জানেন। বৌদিদির ওপর

রাগ ক'রে সেই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে গিয়ে আঘাতটা সেদিন আপনাদের উপর অত্যন্ত রূঢ় হয়ে পড়েছিল। আপনাদের দুজনের বিষয়ে হঠাৎ ওরকম প্রশ্ন করা বৌদিদির অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল। আচ্ছা, তখনি তখনি কি উত্তর দেওয়া যায় বলুন ত? সত্যি কথা যদি বলি, তাহলে একজনের মনে কষ্ট দেওয়া হয়—কাজেই একজনকে ভাল লেগেছে, বলতে পারলাম না। দুজনকেই যদি খুশী করতে যাই, তাহলে মিথ্যে কথা বলতে হয়; কাজেই দুজনকেও ভাল লেগেছে তাও বলতে পারলাম না। কাউকে লাগেনি বলাটাও অবশ্য মিথ্যে কথা বলাই হয়েছিল; তবে সে মিথ্যের একটা সুবিধে এই যে, যার বিষয়ে সে কথাটা মিথ্যে, পরে একান্ত সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। মিস ঘোষাল?

শাশ্বতী সুকুমারের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলে।

আমার প্রথম অপরাধ আপনি ক্ষমা করলেন মনে করতে পারি কি?

সুকুমারের প্রশ্ন শুনে শাশ্বতীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল, মৃদুস্বরে সে বললে, ক্ষমা চাওয়া যদি একান্তই আবশ্যক মনে করেন তা হলে রেবার কাছে চাইবেন, কারণ—

শাশ্বতীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুকুমার বললে, কারণ বলবার দরকার নেই, তাঁর কাছেও নিশ্চয় ক্ষমা চাইব! কিন্তু অকারণ আঘাতের জন্যে ক্ষমা চাইবার সুযোগ যে প্রথমেই পেলাম, এ আমার সৌভাগ্য।

একজন ভৃত্য এসে সুকুমারের সম্মুখে একটা ছোট টিপয়ের উপর চা এবং এক প্লেট খাবার রেখে গেল।

খাবারের প্লেটটা সুকুমারের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে শাশ্বতী বললে, একটু খান।

একটা নিমকির খানিকটা অংশ ভেঙে মুখে দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে সুকুমার বললে, এইবার আমার দ্বিতীয় অপরাধের কথা বলি। অজানা সোনা হাতে পড়লে সেকরা যেমন তাকে আগুনে তাতিয়ে ঘা মেরে দেখে কতটা তার খাঁটী আর কতটা মরা, আমিও তেমনি আপনাকে ক্রোধের আগুনে উত্তপ্ত ক'রে আঘাত দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। রাগত অবস্থায় মানুষের স্বরূপ যেমন স্পষ্ট বোঝা যায়, এমন আর কিছুতে নয়!

আপনার মতো পিতৃভক্ত মেয়েকে পিতৃনিন্দার দ্বারা খুব সহজে উত্তপ্ত করা যাবে মনে ক'রেই আপনার পিতৃনিন্দা করেছিলাম। কিন্তু পরে বউদিদির কাছে যে-কথা শুনলাম তা আগে জানা থাকলে পরীক্ষার উপদ্রবটা আর করতাম না।

সকৌতূহলে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, দিদির কাছে কি শুনলেন ?

সুকুমার বল্‌লে, শুনলাম, কোন এক সৌভাগ্যবান ডাক্তার-পুত্রের কাছে আপনি বুক্‌ড্‌ হয়ে আছেন, সুতরাং অপর লোকের পক্ষে আশা আকাঙ্ক্ষার অতীত ; অর্থাৎ একদম untouchable ! ব'লে হাসতে লাগ্‌ল।

কথাটার মধ্যে সত্য এবং মিথ্যা এমন ভাবে জড়িত যে, শাশ্বতী প্রতিবাদের একটা সুবিধা মত পথ খুঁজে পেলে না, নির্ব্বাক আরক্ত মুখে সে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল।

মিস্‌ ঘোষাল !

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টিপাত করলে।

এখন দেখছি আপনাকে না ভাল লাগার দলভুক্ত ক'রে খুব অন্যায় করিনি। কথামালার গল্পের আমি হচ্ছি শৃগাল, আর আপনি আঙুর ফল ; সুতরাং আপনাকে টক বললে আপনি আপত্তি করতে পারেন না ব'লে সুকুমার অপরিমিত উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

লজ্জা এবং সঙ্কোচের উৎকট বিহ্বলতার মধ্যেও শাশ্বতীর ওষ্ঠাধারে মৃদু হাস্য রেখা ফুটে উঠল; বোধ করি সুকুমারের এই উচ্ছ্বসিত হাস্যলীলার সংক্রামকতা বশতঃই।

সুকুমার কিন্তু শাশ্বতীর এই হাসির ভুল অর্থের দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে সাহসিকতার পথে আরও খানিকটা অগ্রসর হল ; বললে, বৌদিদি বলছিলেন, রেবাকে বিয়ে করতে। এক এক সময়ে মনে করি, তা করলেও মন্দ হয় না। তাতে, আর কিছু হোক না হোক, আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা আর একটু নিকটতর হতে পারে ; টক আঙুর থেকে সামান্য একটু মিষ্টি রস পাওয়া হয়ত সম্ভবপর হয়। ব'লে পুনরায় পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কিন্তু শাশ্বতীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই সুকুমার বুঝতে পারলে ঔষধের মাত্রার অতিরিক্ত প্রয়োগ হয়েছে। একেবারে হুড়মুড় ক'রে বিষয়টা পরিবর্ত্তিত

ক'রে নিয়ে সে বল্‌লে, যাতে আমরা আপনার বাবার শান্তি নষ্ট না করি সেজন্যে আপনি আমাকে একটু আগে সচেতন ক'রে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মিস্ ঘোষাল, আমার বাবা আপনার বাবাকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন সেটা আমার মুখে শুনলে, এবং ক্যালক্যাটা হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ আপনার বাবাকে কতটা ভালবাসেন সেটা বাবার মুখে শুনলে, আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের দ্বারা শান্তি নষ্ট হবে, না শান্তির বৃদ্ধি হবে।

এ কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, আপনার বাবা কলকাতায় আছেন?

সুকুমার বললে, এখন তিনি আলিপুরে পোষ্টেড। ছুটিতে সপরিবারে দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন; আজ আদালত খুলবে, তাই কাল কলকাতায় এসে পৌঁছেচেন।

বিস্মিত কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, বিলাত থেকে ফেরবার পর মাত্র কাল আপনার তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ল?

মৃদু হেসে সুকুমার বল্‌লে, না আগেই হয়েছে। আমি আসছি ব'লে দশ বারো দিন আগেই বাবারা নেমে আসছিলেন, আমি চিঠি লিখে নিষেধ করি। একমাস ছুটর মধ্যে দশ বারো দিন সময় নষ্ট করবার মতো সামান্য নয়। কলকাতায় পৌঁছে সেই দিনই আমি দার্জ্জিলিঙ্গ রওনা হ'য়েছিলাম। যেদিন আপনারা দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন, একটা জরুরী ব্যাপারে তার আগের দিনই আমি দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে ফিরে এসেছি।

অতঃপর কি ব'লে কথোপকথন চালাবে ভেবে না পেয়ে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, এখন আপনি কোথায় আছেন? দিদির বাড়ীতে?—না নিজেদের বাড়িতে?

সুকুমার বললে, বাবার আসার পর থেকে আমি নিজেদের বাড়িতেই আছি। মিস ঘোষাল? · ···

কি বলুন?

ভাগলপুর থেকে আপনার বাবা ফিরে এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব ত'?

মুহূর্ত্তের জন্যে সুকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে শাশ্বতী বল্‌লে, করবেন।

শাশ্বতীর উত্তর শুনে সুকুমারের মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল; বল্‌লে, অর্থাৎ আপনার ক্ষমা লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। কেমন, তাই নয় কি?

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না। গাড়িবারান্দায় একটা মোটর এসে দাঁড়াল, এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে রেবা প্রবেশ করলে।

সুকুমারকে দেখে রেবা বল্‌লে, এই যে সুকুমারবাবু—থুড়ি! মিষ্টার মুখার্জ্জি—কখন এলেন?

সহাস্যমুখে সুকুমার বল্‌লে, আপনার প্রশ্নের কোন্ অংশের উত্তর দেব তা বলুন? মিষ্টার মুখার্জ্জির? না, কখন এলাম তার?

রেবা বল্‌লে, মিষ্টার মুখার্জ্জিরই প্রথমে দিন, নইলে তর্ক করবার সুবিধে পাওয়া যাবে না ত।

শাশ্বতী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, রেবা, তুই ভাই একটু সুকুমারবাবুর কাছে বোস্, আমি একবার মামীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে রেবা বল্‌লে, ওমা! তুমি যে মুখার্জ্জি সাহেবকে সুকুমার-বাবু ব'লে ডাকলে শাশ্বতীদি'?

রেবার কথা শুনে শাশ্বতী সত্যই অপ্রতিভ হ'ল। মিষ্টার—বাবু বাদানুবাদের মধ্যে নিতান্ত অসতর্কভাবেই সে সুকুমারকে সুকুমারবাবু ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছে।

শাশ্বতীর বিহ্বলবিমূঢ় মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'বে সুকুমার বল্‌লে; সুকুমারকে সুকুমার ব'লে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না, শাশ্বতী দেবী; মিস্ রেবার প্রশ্নের উত্তর আমার হ'য়ে আপনি নিজে যে দিলেন, সেজন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

প্রগল্‌ভা পরিহাস-পরায়ণা রেবার চক্ষের মধ্যে কৌতুকের কণিকা জ্বলে উঠল; বল্‌লে, সত্যিই তুমি লজ্জিত হয়ো না, শাশ্বতী দিদি। এরই মধ্যে মিষ্টার মুখার্জ্জি যে তাঁর আন্তরিক মালপত্র তোমার দিকে চালান দিতে আরম্ভ করেছেন, এর জন্যে তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

স্মিতমুখে সুকুমার বল্‌লে, চালান না দিলেও, দিতে রাজী আছি, মিস্ রেবা; কিন্তু ওঁর বন্দরে সুকুমারের জাহাজের যে প্রবেশ নিষেধ।

পলায়নপরা শাশ্বতী যেতে যেতে দ্বারের বাইরে থেকে সুকুমারের এই কথাটা শুনে গেল; রেবার উত্তর তার কানে গেল না।

তরুবালার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সে বললে, মামীমা, সুকুমারবাবুর সঙ্গে রেবার বিয়ের চেষ্টা কর।

তরুবালা বললেন, কেন, সুকুমার কিছু বলছিল না-কি ?

বলছিলেন, দিদি বলেছেন।

কে সুলতা ?

হঁ্যা।

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে তরুবালা বল্‌লেন, সুকুমারের মনের ভাব কিছু বুঝতে পারলি ?

শাশ্বতী বললে, তা ঠিক বুঝতে পারিনি—কিন্তু সবাই মিলে চাপাচাপি ক'রে ধরলে বোধহয় হয়ে যায়।

আচ্ছা, সুলতাকে আগে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

আধঘণ্টাটাক পরে রেবা এসে তরুবালাকে বললে, মা, সুকুমারবাবুর সঙ্গে শাশ্বতীদি'র বিয়ের চেষ্টা কর।

রেবার কথা শুনে তরুবালা হেসে ফেললেন ; বললেন, তোদের হ'ল কিরে, রেবা ? তোরা দু'জনেই যে একসঙ্গে জোট ক'রে সুকুমারের পিছনে লাগলি !

সবিস্ময়ে রেবা বললে, কেন !

একটু আগে শাশ্বতীও যে বলছিল, সুকুমারের সঙ্গে তোর বিয়ের চেষ্টা করতে।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে রেবা বললে, ও আমার নাম ক'রে তার নিজের কথাই তোমাকে বলতে এসেছিল।

তরুবালা বললেন, কেন, শাশ্বতীর কথা সুকুমার কিছু বলছিল নাকি ?

স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি, তবে মনে হয় চেপেচুপে ধরলে বিশেষ কিছু আটকাবে না।

একটু চিন্তা ক'রে তরুবালা বললেন, আচ্ছা, সুলতাকে দিয়ে ওর মনের ভাবটা জানবার চেষ্টা করবো।

ছয়

শাশ্বতী যে রকম আশঙ্কা করছিল, সে রকম ঘটল না। অবিনাশ একাই ফিরলেন। যে-সময়ে স্বামীর চাকরি নেই, সে-সময়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ী আসা আলোকলতা লজ্জাকর মনে করেন। হিমাংশুরও আসা সম্ভব নয়। মায়ের কাছে

থাকবে কে ? তারপরে তার কবিতা আছে। কলকাতার ইট-কাঠ-এসফালটামের মধ্যে ও বস্তু গজায় না ব'লেই তার বিশ্বাস।

সুতরাং অবিনাশ একাই এলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ এই অবিনাশ ঘোষাল। শাশ্বতী তাঁকে অসাধারণ ভক্তি করতে পারে, সেবা করতেও পারে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে বাপকে সম্পূর্ণ চিনতে এখনও তার অনেক বাকী আছে। গোবিন্দপদবাবুকে দেখা মাত্র—রাগ দূরে থাক্, হিংসা দূরে থাক্, ঈর্ষা দূরে থাক্—তিনি একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁদের কথা যেন আর ফুরোয় না।

ইংরাজীতে যাকে বলে, এক পালকের পাখী—পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না—দেখা হলেই হ'ল। তারপরে:

হাচিংস সাহেবের যে বদলী হওয়ার কথা ছিল ? কি হ'ল তার ?

আর বলেন কেন ! ও এখন রইল ধামা চাপা।

তা হোক মশাই। দত্ত সাহেব আসত তো ? হাড় জ্বালিয়ে খেত।

এও কসুর করে না মশাই।

তবু আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মনিব সাহেবই ভালো। দুটো গালাগালি দেয় বটে, কিন্তু তারপরে পুষিয়ে দেয় একেবারে সুদশুদ্ধ।

গোবিন্দপদবাবু হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

অবিনাশ তেমন ক'রে কিন্তু হাসতে পারলেন না। অবশ্য মিঃ হাচিংসের বিরুদ্ধে তাঁর বলবার কিছু নেই। কিন্তু সাহেব মনিবের প্রসঙ্গ তুললে তাঁর আপনা থেকেই হগ সাহেবকে মনে পড়ে যায়। তাঁকে ভোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

শাশ্বতী ইতিমধ্যে বার দুই এসে ফিরে গিয়েছে। এই সময়টা অবিনাশের ওভালটিন খাবার সময়। কিন্তু তাঁদের জমাটী আড্ডা দেখে সে আর কথা কইতে সাহস করেনি। প্রকৃতপক্ষে চাকরি ছাড়ার পর থেকে কোন দিন সে তার বাবাকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখেনি। সকল সময় একটা পাতলা বিষণ্ণ ছায়া তাঁর মুখের উপর ভেসে বেড়ায়। সাধারণ দৃষ্টিতে তা বোঝা না গেলেও, শাশ্বতীর দৃষ্টিকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি।

সে জানে, এ বিষণ্ণতা স্বাভাবিক। বাঙালী-জীবনে চাকরির মমতা সহজ নয়

আর একে যদি মুক্তি ব'লেই গ্রহণ করা যায়, তবু দীর্ঘদিনের বাঁধা পথের থেকে সুবিস্তৃত মুক্তিতে অভ্যস্ত হতেও সময় লাগে।

তাই সে অনুযোগ করেনি। শুধু সুগভীর বেদনায় এবং সুকোমল মমতায় বাপের মুখের দিকে চেয়েছে আর অসহায় আকুলতায় বারবার মনে মনে প্রার্থনা করেছে, ভগবান, আমার বাবাকে আবার সেই আগের মতন ক'রে দাও। তাঁর মনে সুখ দাও, শান্তি দাও, আগেকার সেই স্বচ্ছন্দতা দাও।

গোবিন্দপদবাবুর সঙ্গে তাঁকে উৎফুল্লভাবে গল্প করতে দেখে তার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হ'ল, তাঁর সুখ-শান্তির যেটুকু অভাব ঘটেছে তা অর্থ নষ্টের জন্যে নয়, চাকরি নষ্টের জন্যেও নয়, আসলে তা হচ্ছে আবহাওয়ার অভাব। দীর্ঘ বিশ-বাইশ বৎসর যে আবহাওয়ায় তাঁর কেটেছে, এখানে সে আবহাওয়ার নিতান্তই অভাব। তারা কেউ হাচিংস সাহেবকে বুঝবে না। সাবজজ মনতোষ বাবুর সম্বন্ধে হাইকোর্ট সেবার কি মন্তব্য করেছিল, সে-সব কাহিনী শোনবার জন্যেও কেউ বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়। তার মামাও নয়।

গোবিন্দপদবাবুকে পেয়ে অবিনাশ সেই আবহাওয়া ফিরে পেয়েছেন। এবং মুন্সেফ জগতের বিবিধ সংবাদের আদান-প্রদান ও আলোচনায় উভয়েই উৎসাহিত এবং কিছু পরিমাণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। ওভালটিনের দেরি হচ্ছিল সত্য, কিন্তু তবু শাশ্বতী ভিতরে ভিতরে খুশি না হয়ে পারলে না। গোবিন্দপদবাবুর সম্বন্ধে মনে মনে তার যে ক্রোধ ছিল তা গলে জল হ'য়ে গেল। সেই সঙ্গে গোবিন্দপদবাবুর ছেলেব সম্বন্ধেও······

সুকুমারের কথা মনে হ'তেই শাশ্বতীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে আরক্ত হ'যে উঠল।

অবিনাশ তখন একটা জটিল উইলের মামলায় কি রায় দিয়েছিলেন, এবং হগ সাহেব তা উল্টে দিলেও হাইকোর্ট যে তাঁর রায়ই বহাল রেখেছিল, সে কাহিনী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সহযোগে বিবৃত করছিলেন। শাশ্বতী যে তাঁর পিঠের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই তৃতীয় বারের জন্যে দাঁড়িয়েছে, তা খেয়াল করবার মতো অবস্থা তখন তাঁর নয়।

দেখতে পেলেন গোবিন্দপদবাবু। ডান হাত দিয়ে তাকে সস্নেহে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মা?

অস্ফুটস্বরে শাশ্বতী শুধু বললে, ওভালটিন।

ওভালটিন !

গোবিন্দপদবাবুর কথায় অবিনাশ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

ব্যস্তভাবে বললেন, ও হ্যাঁ, আমার ওভালটিন। তা আজকে ও সব থাক না মা। রোজই যে খেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। আজ বরং ইনি এসেছেন, একটু গল্প করি।

খেয়ে নিয়ে গল্প কর বাবা। আমি এখানেই নিয়ে আসছি।

প্রবীণা জননীর মতো গাম্ভীর্য্য নিয়ে তাকে যেতে দেখে গোবিন্দপদবাবু আপনার মনেই হাসলেন।

মা'টি তো বড় কড়া পেয়েছেন, অবিনাশ বাবু।

হ্যাঁ, বড় কড়া মা।—অবিনাশবাবু হাসলেন,—কিন্তু আর বুঝি মা'টিকে রাখতে পারি না।

কেন ?

বড় হচ্ছে। এবারে আর বিয়ে না দিলেই নয়। একটি ভালো ছেলে আছে আপনার জানা ?

ছেলে ?

গোবিন্দপদবাবু হাসলেন। ভালো ছেলেই তাঁব জানা আছে, এবং হাতেই আছে। কিন্তু

শাশ্বতাকে ফিরে আসতে দেখে গোবিন্দপদবাবুর আর উত্তর দেওয়া হ'ল না। শাশ্বতী ফিরে এল, এক হাতে পানের ডিবে, আর এক হাতে ওভালটিন। পানের ডিবে গোবিন্দপদবাবুর কাছে নামিযে রেখে দিলে, আর ওভালটিনের পেয়ালাটা বাবার কাছে এগিয়ে দিলে।

ডিবে থেকে একটি পান মুখে তুলে গোবিন্দপদবাবু বললেন, আপনার মা শুধু নিজের ছেলের সম্বন্ধেই কড়া নয় অবিনাশবাবু, পরের ছেলের সম্বন্ধেও দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ।

কি রকম ?

আমি যে পান একটু বেশী খাই সে অবশ্য সকলেরই নজরে পড়বে, কিন্তু······

ব'লে এবার তিনি শাশ্বতীর দিকে চাইলেন। হেসে বললেন, তোমাকে মা

বলব, না মাসী বলব সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে। কিন্তু বল তো মা, এ পান কি তুমি নিজে তৈরী করেছ ?

শাশ্বতী মহা মুস্কিলে পড়ল। এই বুড়োর উপরে তার পূর্ব্বের সে ক্রোধ আর নেই। কিন্তু তাই ব'লে এত প্রশ্নের জবাব দিতেও তার বিরক্তি লাগে।

কিন্তু মনের বিরক্তি মনেই দমন ক'রে শাশ্বতী নিম্নকণ্ঠে বললে, আমিই তৈরী করেছি।

কিন্তু সুপুরি যেন কম লাগছে।

বড় বড় চোখে চেয়ে শাশ্বতী পরিষ্কার কণ্ঠে বললে, সুপুরি তো আপনি কমই খান মনে হ'ল।

গোবিন্দপদ এবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললেন, শুনলেন অবিনাশবাবু? আমার কৌটো থেকে কখন পান তুলে খেয়েছি, মা আমার তার থেকে টের পেয়েছে যে, পানে আমি সুপুরি কম খাই।

শাশ্বতীকে কাছে টেনে এনে তার মাথায় একখানি হাত রেখে গোবিন্দপদ বললেন, তোমাকে মাসী বলা চলতেই পারে না মা। তাতে তোমার উপর অবিচার করা হয়। তুমি আমারও মা। কিন্তু একটা কথা ভাবছি।

অবিনাশ ওভালটিনের পেয়ালা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা ?

সাবজজিয়তি নিয়ে ইতিমধ্যেই তো লেগে গেছে। মা নিয়ে আবার দুই ভায়ে লাঠালাঠি বাধবে না তো ?

ব'লেই গোবিন্দপদ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশও। অবিনাশের এত জোরে প্রাণখোলা হাসি শাশ্বতী কখন শুনেছে ব'লে স্মরণ করতে পারলে না।

তার কি রকম লজ্জাও করতে লাগল। মনে পড়ল সুকুমারকে। সেই এসে ব'লে যায়, গোবিন্দপদবাবু তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কেন আসবেন কে জানে! সে আর এ ঘরে অপেক্ষা করতে পারল না। বৃদ্ধের স্নেহবন্ধন কোনো রকমে ছাড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি ওভালটিনের খালি পেয়ালাটা নিয়ে চ'লে গেল।

এর পরেও একবার ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল। তার বাবার পানটা দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কি জানি কেন, ও ঘরে যাবার তার আর শক্তি ছিল না।

বাইরে বোঝা না গেলেও মনের ভিতরে ভিতরে সে যেন বেতসপত্রের মতো কাঁপছিল।

যখন সে দ্বারের বাইরে তার বাবার পানের ডিবেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন দেখলে রেবা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

তাড়াতাড়ি মিনতি ক'রে রেবাকে বললে, এই ডিবেটা বাবাকে দিয়ে এস না ভাই। আমাকে মামীমা কি জন্যে ডাকছেন শুনে আসি।

মামীমা ডাকছেন? রেবা অবাক্ হয়ে গেল। পানটা দিয়ে এসে কি মামীমার ডাক শোনা যেত না? শাশ্বতীর হ'ল কি? তার বাপের কোনো কাজে সে প্রাণান্তেও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাত দিতে দেয় না। আর আজ?

শাশ্বতী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। রেবা আস্তে আস্তে পানটা পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখলে, অবিনাশ ও গোবিন্দপদ তখনও কি একটা ব্যাপার নিয়ে খুব হাসছেন। তাঁদের হাসি আর থামতে চায় না।

আপন মনে রেবাও একটু হাসলে।

সেখান থেকে রেবা শাশ্বতীকে খুঁজতে গেল।

রান্নাঘরের দিকে তার মায়ের গলা পাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে দেখলে, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে কি নিয়ে খুব বকাবকি করছেন। শাশ্বতী সেখানে নেই। তাকে পাওয়া গেল অবিনাশের শয়নকক্ষে। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এক চাদর সে বিশবার ঝাড়ছে।

রেবা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, যাবে না শাশ্বতীদি?

কোথায়?

বা, বেশ তো! আজ বিকেলে দিদির ওখানে নেমন্তন্ন আছে না? তোমার দেখছি, সবই ভুল হচ্ছে।

সুলতা আজ সকালেই একটি চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে ওদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে। এত শীঘ্র তা ভুল হবার কথা নয়।

শাশ্বতী লজ্জিত হ'ল।

তাড়াতাড়ি বললে, গাড়ী বার করতে বলেছ?

মাথা দুলিয়ে রেবা বললে, সে কি এখন বলেছি? পোনেরো মিনিট ধ'রে সে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

শাশ্বতী লজ্জিতভাবে বললে, এক মিনিট ভাই। আমি কাপড় ছেড়েই আসছি।

রেবা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, এক মিনিটের বেশী যেন দেরি কোরো না। কে জানে, সুকুমারবাবুর অবস্থা কি প্রকার!

শাশ্বতী চলে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বললে, সুকুমারবাবু! তিনি কি এখনও ওইখানেই থাকেন?

আসতে কতক্ষণ! এত বড় খবরটা কি আর তিনি সংগ্রহ করেননি ভাবছ?

শাশ্বতী এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলে। তারপর ফিক ক'রে হেসে বললে, কিন্তু তাড়া তো সুকুমারবাবুর চেয়ে রেবা দেবীরই বেশী দেখছি। তোমার অবস্থা যে কি প্রকার তাও তো জানি না। চল তো!

রেবাও হেসে বললে, সেই ভালো। গেলেই পরস্পরের অবস্থা বোঝা যাবে। ভাবী শ্বশুরের সামনে বাপের পানটা পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারছিলে না। তার বদলে এখানে কোণে দাঁড়িয়ে এক বিছানা একশো বার ঝাড়ছিলে।

হেসে শাশ্বতীও কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রেবা তাকে ঠেলে দিয়ে বললে, যাও, আর দেরি কোরো না।

শাশ্বতীর সত্যসত্যই এক মিনিটের বেশী দেরি হ'ল না। শুধু শাড়ীটা বদলেছে। রঙিন শাড়ী বদলে পরেছে একখানা সাধারণ শাদা শাড়ী। মাথাটা আঁচড়েছে কি না বোঝা যায় না কিন্তু মুখে স্নোও মাখেনি, পাউডারও দেয়নি।

ওর বেশ দেখে রেবা গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তোমাকে আমার এত ভালো লাগে শাশ্বতীদি'! তোমার একটা চমৎকার sense of dignity আছে।

Dignity'র কি দেখলে?

দেখলাম। তুমি যদি খুব সেজে-গুজে যেতে শাশ্বতীদি', আমি কিছু বলতে পারতাম না, কিন্তু সব সময় ভারি লজ্জিত হয়ে থাকতাম।

কেন? সাজ-পোষাকের মধ্যে লজ্জার কি আছে?

অন্থের নেই। কিন্তু অন্তত আজকের জন্থে তোমার আছে।

কিন্তু তুমি তো বেশ সেজেছ!

আমি তো সাজবই। আজ আমারই তো সাজবার কথা! তোমার আমার দু'জনের সাজ একা আমিই সেজেছি।

শাশ্বতী আদর ক'রে ওর গাল টিপে দিলে।

বললে, তাই নাকি? আমি তো অন্থ ভেবে সাধারণ পোষাক করলাম।

কি ভেবে?

ভাবলাম সাজের আর ভাগাভাগি করব না। সমস্ত কল্যাণদৃষ্টি একজনের উপরই পড়ুক।

এক ঝলক রক্ত রেবার অজ্ঞাতসারেই রেবার মুখ রাঙা ক'রে দিলে। কিন্তু সে দমল না।

বললে, ও তাই নাকি? এত দয়া? বেশ, বেশ, তুমি খুব কথা কইতে শিখেছ শাশ্বতীদি'! এখন চল তো। গিয়ে দিদির পাল্লায় পড়বে, আর সব কথা বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু বাবাকে একবার বলে আসতে হবে যে।

রেবা এবারে সত্যিই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল।

বললে, ব'লে যদি আসতে হয় তো শীগগির ব'লে এস শাশ্বতীদি'। আর দেরি কোরো না।

শাশ্বতী তবু দেরি করতে লাগল।

যাও শাশ্বতীদি'।

যাই।

কিন্তু শাশ্বতী যায় না, যেতে পারে না। কেবল দ্বিধা করে।

যাও শাশ্বতীদি। শাশ্বতী হেসে ফেললে।

রেবার হাতদুটি ধ'রে অনুনয়ের সুরে বললে, লক্ষ্মী বোন, একবারটি গিয়ে ব'লে এস না। কিচ্ছু না, শুধু বাবার কানে কানে চুপি চুপি গিয়ে ব'লে আসবে, আমরা দিদির ওখানে যাচ্ছি।

কেন, তুমি নিজে গিয়ে বলতে পার না?

পারব না আবার কেন? আমি ততক্ষণ মামীমাকে ব'লে আসি, রাত্রে

বাবার জন্মে লুচি না ক'রে যেন রুটি করেন। তোমাদের এখানকার ঘি'টা ওঁর ঠিক···

রেবা দুষ্টুমি ক'রে বললে, সেইটেই বরং আমি ব'লে আসি। তুমি বরং পিসেমশাইকে···

রেবা আর কথা শেষ করতে পারলে না। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীও। তারপরে রেবা গেল অবিনাশের কাছে ছুটি চাইতে, আর শাশ্বতী গেল তার মামীমার কাছে রুটির কথা বলতে।

তারপরে দুই বোনে মোটরে গিয়ে উঠল। রেবার হাসি তখনও শেষ হয়নি। হাসির ধমকে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—মুখ রাঙা।

শাশ্বতী বললে, হাসিটা গাড়ীতেই শেষ ক'রে নাও রেবা। ওখানে গিয়ে আর হেস না যেন!

রেবার উত্তর দেবার শক্তি নেই।

রেবা মিথ্যা অনুমান করেনি। সিঁড়ি থেকেই ওরা দেখতে পেলে, সুকুমার, বোধহয় ওদের পায়ের শব্দ পেয়েই, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ওদের অভ্যর্থনা করবার জন্মে।

বললে, নমস্কার! আসুন, আসুন।

শাশ্বতীর হাতে একটা চাপ দিয়ে রেবা চুপি চুপি বললে, দেখলে শাশ্বতীদি'?

প্রকাশ্যে বললে, নমস্কার! আমি শাশ্বতীদি'কে বলছিলাম, আমাদের বড় দেরি হয়ে গেছে। আপনি হয় তো এসে ব'সে আছেন। আপনি কি অনেকক্ষণ এসেছেন, মিঃ মুখার্জ্জি?

সুকুমার হাসলে। কিন্তু সেটা ওর মিঃ মুখার্জ্জি সম্বোধন শুনে, কিম্বা প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতে ঠিক বোঝা গেল না।

বললে, অনেকক্ষণ ব'লেই মনে হচ্ছে রেবা দেবী। কিন্তু ঘড়িতে দেখি মাত্র দশ মিনিট হ'ল এসেছি। আসুন শাশ্বতী দেবী, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শাশ্বতী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে, দাঁড়িয়ে নয়, সুকুমার বাবু, আপনাদের বাক্‌যুদ্ধের একটা সুযোগ দিচ্ছিলাম।

আপনি এগিয়ে এলেও সে সুযোগ আমরা হারাতাম না শাশ্বতী দেবী। বাংলা দেশে এত বড় সুযোগ কদাচিৎ মেলে। আপনি নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে আসতে পারেন।

সুকুমার আজকে ওদের যে ঘরে নিয়ে এল, আগের দিন ওরা এঘরে আসেনি। এ ঘরটা ইংরাজী ধরণে সাজানো। ওরা দুই বোনে একখানা সোফায় বসল। ওদের পাশে একটা কুশন চেয়ার টেনে বসতে বসতে সুকুমার বললে :

এই ঘরটাই ভালো। আপনার দিদির মাদুরটা আমার এই পোষাকের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তাতে গল্প করারও তেমন আরাম হয় না। কি বলেন ?

রেবা বললে, আমাদের বলার অপেক্ষা তো রাখেননি।

সুকুমার হেসে ফেললে। বললে, রাখিনি সত্যি। কিন্তু আপনাদের আপত্তি হবে না ভেবেই সে অপরাধ করতে সাহস করেছি।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করলে, দিদি কোথায় ?

তিনি আমাদেরই দগ্ধোদরের জন্যে রান্নাঘর আর ভাঁড়ারের মধ্যে ছুটোছুটি করছেন বোধ হয়। তাঁর বদলে আমি যদি আপনাদের কোনো কাজে আসতে পারি, অসঙ্কোচে জানাবেন। আপনাদের দিদি সেইজন্যেই আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন, এ নিশ্চয় আপনারাও বুঝতে পেরেছেন।

কথার ধরণে দু'জনেই হেসে উঠল। রেবা তো বাক্যুদ্ধের জন্যে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বললে, আমাদের, মানে শাশ্বতীদি'র আসার খবর আপনি কখন পেলেন বলুন তো ?

এক মিনিট আগে, আপনাদের পায়ের শব্দে।

তার আগে ?

তারও মিনিট পোনেরো আগে অর্থাৎ এখানে পৌঁছেই বৌদি'র কাছ থেকে এ খবরটা পেয়েছিলাম।

তারও আগে ?

অর্থাৎ সকালে, যখন বৌদি'র চিঠি পেলাম ? না রেবা দেবী, তখন কোনো official খবর পাইনি। অনুমান ক'রেছিলাম মাত্র।

রেবা তথাপি ছাড়ে না।

প্রশ্ন করলে, এরকম অনুমানের কি কারণ ঘটল দয়া ক'রে বলবেন ?

নিশ্চয়। প্রথমতঃ এ অভাজনকে এ বাড়ীতে আনবার জন্যে কখনও নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হয়নি। আমি এমনিতেই আসি,—প্রয়োজনেও আসি, নিষ্প্রয়োজনেও আসি। বড় জোর, এ বাড়ীর লোকেরা আমাকে ডেকে পাঠায় কিন্তু নিমন্ত্রণ কখনও কেউ করে না। এই দেখুন সেই স্মরণীয় পত্র।

সুকুমার বুক-পকেট থেকে সযত্নে ভাঁজ-করা ছোট একটা চিরকুট বের ক'রে রেবার হাতে দিলে।

বললে, ওটা ফেরত দিতে ভুলবেন না যেন। এ বাড়ীর প্রথম নিমন্ত্রণপত্র হিসেবে বাঁধিয়ে রাখব ভেবেছি।

চিঠিখানা ফেরত নিয়ে সযত্নে পুনরায় বুক-পকেটে রাখতে রাখতে বললে, কিন্তু এই মহৎ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপদও আছে।

বিপদটা কি ?

বিপদটা এই যে, এ বাড়ীতে আমি চিরদিন খেয়েছি আর এলোপাতাড়ি রান্নার নিন্দে করেছি। নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এই প্রথম সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার দিদির রান্না তো খুব ভালোই, মিঃ মুখার্জ্জি।

সে আমিও জানি। আপনাকে গোপনে বলছি রেবা দেবী, দোষ তাঁর রান্নার নয়, আমারই স্বভাবের। নিন্দে না ক'রে আমি থাকতে পারি না। সে তো প্রথম দিনেই আপনারা টের পেয়েছেন।

এই স্বভাবটা বদলে ফেলার চেষ্টা করেন না কেন ?

ম্লানমুখে সুকুমার বললে, করি, কিন্তু পারি না।

পারেন না ? এমনই কঠিন কাজ ?

ভয়ানক কঠিন। আপনি বুঝবেন না। মাঝে মাঝে লোকের প্রশংসা করবার চেষ্টা যে না করেছি তা নয়। কিন্তু এমন কষ্ট হয়েছে যে··· কি। হাসছেন যে ?

না হাসিনি, শুধু বোঝবার চেষ্টা করছি। আপনি বলুন, তার পরে কি হ'ল।

তারপরে···

ওমা, তোরা কখন এলি ?—সুলতার কণ্ঠস্বর।

সুকুমার দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় ক'রে বললে, ওঁরা এই কিছুক্ষণ হ'ল এলেন, বৌদি'। খবরটা আমিই তোমার কাছে পৌছুতে দিইনি, নিজের স্বার্থে।

সুলতা হাসলে। বললে, তা এখন গল্প করবে ? না খাবার দোব ?

সুকুমার করুণ কণ্ঠে বললে, দুটোই কি একসঙ্গে চলতে পারে না, বৌদি' ? অর্থাৎ আমাদের একসঙ্গে খেতে দেওয়া কি অসম্ভব ?

তার আবার অসম্ভব কি ? একালে তো···

সুকুমার সোৎসাহে বললে, এই কথা বৌদি' ! তুমি না জান কি ? তুমি সেই ব্যবস্থাই কর। আমবা পরমানন্দে একালেব মহিমা উপলব্ধি করি।

সাত

সুকুমারদের ওখান থেকে শাশ্বতী যখন রেবার সঙ্গে বাসায় ফিরে এলো, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। রেবা গেল তার নিজের ঘরে কাপড ছাড়তে।' শাশ্বতী পায়ের জুতোটা খুলে সটান তার ঘরে এসে বিছানায শুবে পডলো। আজ সমস্ত দিনই তার মনে কিছু ক্লান্তি ছিল। সুকুমারের সঙ্গে তাদের বাক্‌চাতুবী এবং বাক্‌যুদ্ধ যথেষ্টই হয়েছে, কিন্তু সেই সব কথার ছুারখেলার মধ্যে তার মনেব ক্লান্তির সংবাদ না পেয়েছে রেবা, না পেয়েছে সুকুমার। আর সত্যি বলতে কি, সকল কথা আর সমস্ত আল্লাপই যেন ভাসাভাসা, তার মধ্যে না ছিল প্রাণের উত্তাপ, না ছিল প্রাণের স্পর্শ। কত কথাই ব'লে গেল রেবা, কত কথাই শোনা গেল সুকুমারের মুখে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে শাশ্বতীর মনের যোগ ছিল না। সুকুমার বিলেতফেরত, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার আদবকাযদা তার অভ্যস্ত, বিলিতী স্বভাব-চটুলতায় সে পারদর্শী, তার আচার-আচরণে কোথাও ত্রুটি কিম্বা অসঙ্গতি নেই। প্রথম দিনে সে আঘাত করেছিল শাশ্বতীর পিতৃভক্তির খোঁটা দিয়ে, তারপর থেকে সেই অপরাধকে লঘু করার চেষ্টায় নানাবিধ উপাযে মার্জ্জনা চাইবার কী ঘটা! কিন্তু তবু, এই আনাগোনা, এই ড্রয়িংরুমে ব'সে চা খাওয়া, এই কথার পিঠে কথার চাতুরী,—এর মধ্যেই শাশ্বতীর ক্লান্তি নিহিত ছিল। তার পক্ষে অবশ্য

এগুলো পুরনো নয়, কিন্তু প্রিয়ও নয়। রেবা যাতে আমোদ পায়, সে যদি তার মধ্যে বৈচিত্র্যের আস্বাদ না পায় তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। যদিও তার রুচির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তার নিজের জানা নেই, কিন্তু সে-রুচির চেহারা আলাদা। যে-কোনো যুবককে নিয়ে বালিকাসুলভ হুজুগে মেতে ওঠার মতো উৎসাহ তার কম।

কিন্তু রেবা ?

রেবা তার মামাতো বোন হলেও বন্ধু বলা যেতে পারে। সুলতা তাদের চেয়ে বড়, মামা তার বিয়ে দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে। তাদের ভাই নেই, কেবল দুই বোন। রেবা ছোট ব'লেই মামার কাছে তার আদর বেশী, এবং মামা ওকে যত্ন ক'রেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন। রেবা যদি সুকুমারকে বিয়ে করে, তবে উভয়ে উভয়ের অযোগ্য হবে না। রেবার দিক থেকেও রাজী না হওয়ার কোনো কারণ শাশ্বতীর চোখে পড়েনি। সুকুমার সম্পর্কে তার উৎসাহ কম, এমন কথাই বা কে বলবে ?

রেবা কেন যায় ঘন ঘন দিদির বাড়ী বেড়াতে ? শাশ্বতীর সঙ্গে সুকুমারের আলাপ করিয়ে দিতে তারই বা কেন এমন অধ্যবসায় ?

শাশ্বতী বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে মনে মনে হাসলে। চোখেমুখে তার কৌতুক ফুটে উঠল। সুকুমারকে নিয়ে তার প্রত্যক্ষ কোনো উদ্বেগ নেই, একথা অতি স্পষ্ট, —কিন্তু ওই যুবকটির প্রতি তার আকর্ষণের উৎপত্তি হয়েছে কিনা, এই পরীক্ষাই কি রেবা করতে চায় ? কলকাতার মেয়ে রেবা, ফ্যাশনদুরস্ত সমাজে তার আনাগোনা আছে, প্রণয়ব্যাপার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কলা-কুশলতা কলকাতার হালফিল সমাজে সে কম দেখেনি। কিন্তু শাশ্বতীকে এদিক থেকে যদি সে পরীক্ষা করতে চেয়ে থাকে, তবে এটা তার ছেলেমানুষিই বলতে হবে। বিলেতফেরত ছোকরাদের ওপর তরুণীমহলের লিপ্সা কম নয়, কিন্তু গরীব শাশ্বতী সেখান থেকে স'রে থাকুক। শাশ্বতী তার বাবার শিক্ষা আর সংস্কৃতির হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, খাঁটি সোনার স্বভাব-চাকচিক্য দেখলে সহজেই সে চিনতে পারে। তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হাস্যকর।

দরজার কাছে কার পায়ের শব্দ হতেই শাশ্বতী সচকিত হয়ে উঠল।

ছোকরা বিপিন চাকর ঘরে ঢুকে সুইচটা জ্বালিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

বালিসে মুখ ঘষে আড়ামোড়া ভেঙ্গে মুখ তুলে শাশ্বতী বললে, কি রে, বিপিন।

আপনাকে পিসেমশাই একবার ডেকে পাঠালেন।

শাশ্বতী ধড়মড় ক'রে উঠল। বললে, ও—যাচ্ছি রে, তুই বল্‌গে। কী ভুলই হয়েছে—ছি ছি! এরপর আমার মরণই ভালো!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী তার মাথার এলোমেলো খোঁপা আর গায়ের আঁচল আর কোমরের কসি গুছিয়ে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওপরে ঢুকে দেখলে অবিনাশ তাঁর কাশ্মিরী মলিদাখানি গায়ে মাথায় জড়িয়ে বিছানার ওপর ব'সে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাক টানছেন। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, শীতের দিনে ঘরের মধ্যে বেশ আরামদায়ক উত্তাপ জমেছে।

কখন ফিরলে, মা?—অবিনাশ তামাকের নল থেকে মুখ ফেরালেন।

শাশ্বতী একটু থতমত খেয়ে পিতার কাছে এসে বসলো। ফিরেছে সে অনেকক্ষণ, পিতার খবর নেবার যুক্তিযুক্ত অবসরের কালও উত্তীর্ণ, ওভাল্‌টিন দেবার সময়ও কখন পেরিয়ে গেছে,—সুতরাং কৈফিয়ৎ দেবার সব রাস্তাই বন্ধ। কিন্তু অবিনাশ ঘোষালের মেয়ে ব'লে মনে মনে তাব এতই গর্ব্ববোধ ছিল যে, মিথ্যাভাষণ সে করবে না। সে সম্ভব নয়।

বললে, অনেকক্ষণ ফিরেছি বাবা। একটু শুয়ে পড়েছিলুম। তোমার নিশ্চয় ওভাল্‌টিন খাওয়া হয় নি।

অবিনাশ বললেন, একটু আগেই খেয়েছি। শোনো মা, হিমাংশু চিঠি দিয়েছে। একখানা পোষ্টকার্ডে তোমাকে সে জানিয়েছে, আই-এ পরীক্ষার চেষ্টায় সে আর পণ্ডশ্রম করবে না, এবার ভাগলপুর থেকে কলকাতার বাস্তব আবহাওয়ার মধ্যে না এলে তার আর কবিতা লেখা সম্ভব হচ্ছে না···

শাশ্বতী হেসে বললে, দাদার এ অপরাধ একটা নতুন ছুতো বাবা, তার কবিতা কোথাও আর ছাপা হচ্ছে না, তাই আসছে সম্পাদকদের কাছে ধন্না দিতে। আমি জানি।

অবিনাশ একটু থেমে বললেন, কিন্তু শুনেছি 'বাতায়ন'-এ তা'র কবিতা—

হ্যা, 'বাতায়নে' ছাপা হয় বটে। কিন্তু এবার আরো অনেক কাগজ সে আক্রমণ করতে চায়। দাদার ত' আর খেয়ে ব'সে কাজ নেই।

অবিনাশ এবার একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন, কিন্তু এমন যদি হয় মা, তোমার মা তাকে পাঠাচ্ছেন আমাদের কার্য্যকলাপ দেখে যাবার জন্যে?

শাশ্বতী বললে, কার্য্যকলাপ আবার কি, বাবা ?

তুমি তো জানো মা, তোমার সঙ্গে আসবার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে তিনি কি শাসিয়েছিলেন ? আর এবারেও আমি যখন আসি তখনো তো এর একটু ব্যতিক্রম ঘটে নি।

শাশ্বতী চুপ করে রইল। তার মনে পড়ে গেল মায়ের সেই কঠিন চীৎকার—'মেয়ের বিয়ের পাকা ব্যবস্থা না ক'রে তুমি যদি ফিরে আস, তাহলে আর কিছু বাকী রাখবো না ব'লে দিচ্ছি।'

কন্যার পক্ষ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে অবিনাশ নিজেই বললেন, হিমাংশু এসে যদি কবিতা লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাহ'লে অবশ্য কথা নেই, কিন্তু সে যদি তার মাকে এখানকার খবর সব জানিয়ে এই কথা লেখে যে, এতদিনেও আমি তোমার বিয়ের কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি, তবে আবার হয়ত একটা পারিবারিক অশান্তি দেখা দেবে।

শাশ্বতী এবার মুখ তুলে বললে, মা যদি রাগ করেন তবে সেটা অহেতুক। পৃথিবীর এসব সমস্যা সমাধান করার ভার ত তোমার হাতে নেই, বাবা।

অবিনাশ বললেন, আমিও অবশ্য সেদিকে এমন কিছু চেষ্টা চরিত্রও করিনি। এখানে এবারে এসে ক'দিন নানা গোলমালে কাটলো। ওদিকে মন দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ও-বাড়ীর বীরেন ডাক্তাররাও আজও ফেরেন নি মধুপুর থেকে। তাঁরা নাকি আবার হঠাৎ মধুপুর থেকে চ'লে গেছেন এলাহাবাদে। তারপর মাঝখানে গোবিন্দপদবাবুর সঙ্গে আলাপ, তাও সাময়িক,—তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে গেছি মাত্র। অবশ্য তোমার মামা আর মামীমা ইতিমধ্যে বিয়ের কথাটা পেড়েছিলেন, কিন্তু—

সলজ্জ নতমুখে শাশ্বতী বললে থাক্ ওইটে বা। করুন বাবা, এসব আলাপ-আলোচনা এখন থাক।

তবু, যখনই হোক, আলাপটা আরম্ভ করতে হবে ত মা!

সে জানি বাবা, তোমাকে কিছুতেই সংশোধন করা যাবে না—ব'লে শাশ্বতী উঠে দাড়ালো। তারপর বললে, তোমাকে কলকাতায় এনেছিলুম কিছুদিন বিশ্রাম দিয়ে সুস্থ করে তুলতে, কিন্তু তুমি নিজেকে সব সময় কন্যাদায়গ্রস্ত মনে করলে

আমি মাথা খুঁড়ে মরবো তা ব'লে দিচ্ছি। ওসব এখন থাক। যাই, এবাব তোমার খাবার সময় হয়েছে।

কিন্তু দবজা পর্য্যন্ত যাবার আগেই অবিনাশ আবাব তাকে ডাকলেন। শাশ্বতী ফিরে দাঁড়ালো।

অবিনাশ হাসিমুখে বললেন, কিন্তু আর একটা খবর যদি দিই মা, তা'হলে ত আর মাথা খুঁড়বে না ?

কি বাবা ?

অবিনাশ তাঁর বালিশের তলা থেকে আর একখানা চিঠি বার ক'রে বললেন, এই ত্থাখো। চার পাঁচ দিন আগে মুখুজ্যে মশাই মুঙ্গের থেকে এসেছেন কলকাতায়, কিছুই জানতে পাবিনি। তিনি চাকবেব হাতে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন বালিগঞ্জ থেকে।

শাশ্বতী বললে, মুখুজ্যে মশাই ? কে বাবা ?

ওরে পাগলী, আমার বন্ধু হবেন উকীল। তোমার কাকাবাবু।

দেখতে দেখতে শাশ্বতীর চোখমুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, কাকাবাবু ? অজু, কাকীমা—তাঁবাও সবাই এসেছেন ?

অবিনাশ বললেন, হ্যাঁ, সকলেই। তোমাব কাকীমা, শৈলেন, অজু, হরেনবাবু—সবাই এখন রইল। প্র্যাকটিস ক'রে মুখুজ্যে মশাই যথেষ্ট টাকা কবেছেন, এবার বিশ্রাম নিলে কোনো অসুবিধাই হবে না।

আমরা কবে যাবো বাবা ওঁদের ওখানে ? শাশ্বতী অবীর উৎসুক কণ্ঠে জবাব চাইলে।

অবিনাশ বললেন, হিমাংশু আসছে কাল সকালে। তাকে নিযে সকালের দিকেই চলো যাই মা।

শাশ্বতী বললে, তাই চলো, বাবা। নিজের গ্রাম ছেড়ে বাইবে-বাইরে তুমি এতকাল রইলে, আলাপ পরিচবও তোমার কম নয। কিন্তু কাকাবাবুব মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোমার একজনও নেই, বাবা। ওঁরা মুঙ্গের চলে যাবার পর ভাগলপুর যেন আমাদের কাছে খালি হয়ে গিযেছিল। কাকীমা, তাঁর দুই মেযে সুরমা সুষমা, ছেলেরা—সবাই মিলে আমরা চিরকাল একই পরিবার হয়ে ছিলুম। প্রায তিন বছর হোলো ওঁরা ভাগলপুরে নেই। কাকীমা চিঠি দেন নি প্রায়

ছ'মাস হোলো। চলো না, আচ্ছা ক'রে তাঁকে শুনিয়ে দেবো। তোমার চাকরির ব্যাপার কি কাকাবাবুর কানে উঠেছে, বাবা ?

অবিনাশ বললেন, চিঠিতে অবশ্য কিছু লেখেন নি। তবে, কি জানি হয়ত এতদিনে তাঁর কানে উঠে থাকবে।

শাশ্বতী বললে, যদি না উঠে থাকে তবে তুমি সব খুঁটিয়ে ব'লো, বাবা।— সরকারী আপিসের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পাবে না, তবে লোকের মুখে মুখে ওর দুর্নীতির কথাগুলো প্রচার হ'লে কিছু কাজ হয়। কাল সকালে দাদা কিন্তু এলেই, আমরা কাকীমাদের ওখানে যাবো, বাবা। মামার গাড়ীখানা যদি না পাই, ট্যাক্সিতেই চ'লে যাবো।

কন্যার অপরিসীম উৎসাহ দেখে অবিনাশ তামাসা ক'রে বললেন, এখুনি গেলে হয় না, মা ? রাত বেশি হয়নি, মাত্র দশটা বাজে।

পিতার পরিহাস শাশ্বতী বুঝতে পারলে। বললে, তোমাকে ঠাণ্ডায় বার করতে পারব না, নৈলে এখুনিই যেতে পারতুম, বাবা।

এই ব'লে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মামা আর মামীমা উভয়কেই একটু ব্যস্তসমস্ত-ভাবে আসতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নিবারণের পিছনে পিছনে তরুবালা এসে প্রবেশ করলেন। অবিনাশ মুখ ফিরিয়ে বললেন, কি হে, এত হন্তদন্ত কেন ? বৌদিদির চেহারাটাও যেন আলুথালু দেখছি।

নিবারণ বললেন, ওই ত কেবল ব'সে ব'সে দেখছেন। চিরটা কাল ভোলানাথ হয়ে ব'সে রইলেন, সংসারের ছ'কড়া ন'কড়া কিছুই বুঝতে শিখলেন না। এদিকের কাণ্ডটা কিছু শুনেছেন ?

উদ্বিগ্ন হয়ে অবিনাশ বললেন, ব্যাপারটা কি শুনি ?

নিবারণ শাশ্বতীর দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন, তুই একটু বাইরে যা ত মা।

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

নিবারণ একখানা চেয়ারে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললেন, আলোকলতা যে চোরাবালির ওপর ঘর তুলেছিল, একথা পোড়ারমুখি একটুও বুঝতে পারে নি।

সবিস্ময়ে পরিহাস ক'রে অবিনাশ বললেন, সে কি নিবারণ, পাত্র হিসেবে আমি তো নিতান্ত অযোগ্য ছিলুম না ব'লেই মনে হচ্ছে !

পিতার তামাসায় আড়ালে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী হঠাৎ হেসে ফেললে।

নিবারণ বললেন, আপনার সব সময়েই কেবল ঠাট্টা। এদিকে মেয়ে পার হবার পথ যে মাটি, শুনেছেন কিছু ?

কি রকম ?

শুনুন সব আপনার শালাজের মুখে।

খাটের একপাশে ব'সে একটু ঘোমটা তুলে তরুবালা বললেন, আপনি ত জানেন বীরেন ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন মধুপুর থেকে এলাহাবাদে। ঠাকুরঝিকেও আমি তাই লিখেছিলুম। ডাক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে দেবার জন্যে ঠাকুরঝি অনেকদিন থেকেই চিঠি লেখালেখি করছিলেন।

অবিনাশ বললেন, কথাটা শুনেই আসছি। কিন্তু বীরেন ডাক্তার, কিম্বা তাঁর ছেলে, কিম্বা তাঁর স্ত্রী—কাউকেই ত আমি দেখিনি, বৌদিদি। ওঁর স্ত্রী ছোট বৌ'য়ের ছেলেবেলার বন্ধু, এই পর্য্যন্তই কেবল জানাশোনা আছে। শাশ্বতীও কাউকে আজ অবধি চোখে দেখেনি।

নিবারণ বললেন, সে যাই হোক, বীরেন ডাক্তারের একজন অ্যাসিষ্টেণ্ট একটু আগে ও-বাড়ীতে এসে পৌঁচেছে এলাহাবাদ থেকে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ওঁর মারফত আমাদের কাছে অদ্ভুত খবর পাঠিয়েছেন।

কি রকম ?

তরুবালা বললেন, ডাক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির একটি বি-এ পাস করা মেয়ের গত বুধবারে বিয়ে হয়ে গেছে।

অবিনাশ উর্ব্বরের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, তাই নাকি ? তাহ'লে ছোট বৌ ত কিছু আঘাত পাবেন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠাকুরঝির পক্ষে এটা খুবই আঘাত। এখানে বিয়ে দেবার জন্যে তিনি আমাদের বিশেষ ক'রে চেষ্টা করতে বলেছিলেন। ওঁরাও তো ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করবেন ব'লে আমাদের কথা দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই তো আপনাকে আরো এখানে আটকে রেখে দিয়েছি। এখন বেশ মনে হচ্ছে, কাশীতেই ওঁদের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল—আমাদের কেবল হাতে রেখে দিয়েছিলেন। ওঁরা যে আমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করতে পারেন তা কখনও ভাবি নি।

অবিনাশ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। পরে বললেন, আমার মেয়ে

অশেষ গুণবতী, সেই জন্যেই তাকে চিনে মাথায় তুলে নেওয়া যেমন তেমন লোকের শক্তি নেই। শাশ্বতী বি-এ পাস করেনি, তার জন্যে তার মনে ক্ষতিবোধ নেই। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে অনেক বড শিক্ষা তার হয়েছে। এই খবরে তোমরা সবাই ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু হবে না দু'জন—আমি আব আমার মেয়ে।

নিবারণ এবং তরুবালা এতক্ষণ নিস্তব্ধ হযে তাঁর কথা শুনছিলেন, এইবার তাঁরা তেমনি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

অবিনাশ পুনবায় বললেন, জানি দু'একদিনের মধ্যেই ছোট বোয়ের কাছ থেকে মনোক্ষোভে ভরা আর চোখেব জল মাখানো চিঠি এসে পৌছবে। কিন্তু এতে তোমরা কেউ দুঃখ ক'বো না, নিবারণ। হয়ত এ ভালোই হোলো। ভালো কথা, এর পরেও কি কলকাতায় থাকায় আমাদের দরকার আছে?

তরুবালা ফিবে দাঁড়িয়ে বললেন, খুব আছে। এখানে থেকে আরো কিছু চেষ্টা-চরিত্র করা খুবই দরকার। আপনাদের এখন যাওয়া হতেই পাবে না।

নিবারণ এবং তরুবালা চ'লে যাবার পর হাসিমুখে শাশ্বতী এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, তোমাদের কমিটিতে কি প্রস্তাব পাস হোলো, বাবা?

হেসে অবিনাশ বললেন, আমার মাযের সেবা আরো কিছুদিন আমার ভাগ্যে জুটতে পারে, এই স্থির হোলো মা।

শাশ্বতী পরম নিশ্চিন্ত মনে এবং স্বস্তির আনন্দে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললো, মা যেমন একগুঁযে মানুষ, তেমনি শাস্তিও হয়েছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি, বাবা। মাকে তাঁরা যে ঠকিয়েছেন, এতে আমি খুব খুশী। চলো বাবা, তোমার খাবার ব্যবস্থা করিগে। রাত এগারোটা বাজে।

আট

হিমাংশু সকাল বেলায় তার ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে এসে হাজির হোলো। শাশ্বতী হাসিমুখে গিযে দাঁড়ালো তাকে অভ্যর্থনা করতে। বললে, তোমার মতলবের কথা কাল বাবাকে ব'লে দিয়েছি, দাদা।

হিমাংশু বললে, তুই যা ভাবছিস তা মোটেই নয়। মায়ের এজেণ্ট হয়ে আমি আসিনি। আমি এসেছি অন্য কাজে।

চোখ পাকিয়ে শাশ্বতী বললে, সে রাজকার্য্যটা কি শুনি?

গায়ের জামাটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে হিমাংশু বললে, এখন বলব না।

না, তোমাকে বলতেই হবে। শীগগির বলো কিন্তু. নৈলে বাবাকে ব'লে দিয়ে আমি রক্ষে রাখব না, দাদা—সাবধান।

হিমাংশু বললে, বাবাকে ব'লে দিবি? ফুঃ, চাকরিত্যাগী পিতাকে কবি কি কেযার করে?

ওমা!—ব'লে শাশ্বতী গালে হাত দিযে শিউবে উঠল। বললে, দাদা, তোমার সাতজন্ম নরক, এই ব'লে বাথলুম।

নরক!—ফুঃ, সেই নরককে কবিতায় স্বর্গ বানিযে তুলবো। যা, পালা এখন।

তাদেব বিবাদ চলছে, এমন সমযে বেবা এসে আসরে অবতীর্ণ হোলো। তাডাতাডি হিমাংশুর পায়েব ধুলো নিযে বললে, কি ভাগ্য আমাদেব, হিমাংশুদা!

হিমাংশু শাশ্বতীর দিকে চেয়ে হাসিমুখে চোখ টিপলো। বললে, দেখলি, মাত্র কযেকটি কবিতা "বাতাযনে" লিখেছি। এতে বাংলাব তরুণী সমাজ আমাকে কেমন খাতিব কবে, দেখলি ত?

রেবা হেসে বললে, ওমা, বড ভাইযেব পাযেব ধুলো নিলুম, তা'তে এই কথা!

ওরে নে, ওই একই হোলো!—ব'লে হিমাংশু সোজা অবিনাশেব ঘবেব দিকে চ'লে গেল।

বেবা অবাক্ হ'য়ে বললে, দাদাব কি মাথা খারাপ?

শাশ্বতী বললে, এসেই বাবার সম্পর্কে দাদা যে ভাবে কথা কইলে তাতে এ কথায আমি আর আশ্চর্য্য হই নি—সত্যি, দাদাব বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত মাথা খারাপই হবে। তারপর কথার মোড ঘোরাবাব জন্যে শাশ্বতী বললে, আমাদের সঙ্গে তুই বালিগঞ্জে যাবি, বেবা?

রেবা হেসে বললে, কাল রাত্রে তোর কাকাবাবুব গল্প যা তোব মুখে শুনেছি তাতে যেতে যে ইচ্ছে হচ্ছে না তা নয়, তবে কি জানিস, না যাওয়াই আমি কর্ত্তব্য মনে করচি।

শাশ্বতী বললে, হঠাৎ তোর এত বড কর্ত্তব্যজ্ঞান এল কোথা থেকে?

রেবা হেসে বললে, প্রয়োজনের সময় ও জিনিষটা যে কোথা থেকে আসে তা আমি নিজেই টের পাই না। এই ব'লে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে খুব ধীরভাবে বললে, আচ্ছা, ভাই, মুখুজ্যে মশায়ের বড় ছেলে শৈলেনবাবু, যিনি বন্দুক ধরলেই বাঘ শিকার করেন, তাঁর বয়েস কত? তোর চেয়ে নিশ্চয়ই ছোট নন?

শাশ্বতী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না।

বালিগঞ্জের বাড়ীতে এসে তারা যখন পৌঁছল, বেলা তখন দশটা। হরেনবাবু বাসাতেই ছিলেন, তিনি মোটরের হর্ণ শুনে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হিরণ্ময়ী বেরিয়ে এসে শাশ্বতীর হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, কলকাতায় এসে খুব বেড়ানো হচ্ছে বুঝি? আলোকলতা এলেন না কেন?

শাশ্বতী বললে, বাবাকে নিয়ে আমিই আগে চলে এসেছিলম, কাকীমা। তাছাড়া কলকাতায় মা'র তেমন ভালো লাগে না।

অজয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল, শাশ্বতী তাকে তাড়াতাড়ি সস্নেহে কোলে তুলে নিল। কিন্তু এরই মধ্যে একবার মাতা পুত্রের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তারপরেই হিরণ্ময়ী বললেন, অজু কি ভাবছে জানো মা, শাশ্বতী? ভাবছে, আট বছর বয়স হোলো, কোলে ওঠার বয়স নেই।

শাশ্বতী আর হিরণ্ময়ী খুব হেসে উঠলেন। অজয় কোল থেকে নেমে সটান গেটের দিকে পালিয়ে গেল।

শৈলেনের সঙ্গে অনেকদিন পরে হিমাংশুর দেখা। হিমাংশু যখন ভাগলপুরের ঘরের কোণে ব'সে কবিতা লেখায় মত্ত থাকতো, শৈলেন সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় দল গড়া, কিম্বা গঙ্গায় বাচ খেলা, নয়তো মন্দার পাহাড় আক্রমণ করা, অথবা ওপারে গিয়ে চড়াই-ভাতি, কিম্বা জঙ্গলে পাখী শিকার, অথবা বারোয়ারীতলায় থিয়েটার করা, —এমনি যা হোক একটা কিছু হুজুগ নিয়ে ঘোরাফেরা করতো। ভাগলপুরের তরুণ মহলে সে ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। তার চেহারা, স্বাস্থ্য ও আচার আচরণ সবই ছিল ভালো। হিমাংশু তাকে পরিহাস ক'রে বলতো, অত যার পপিউল্যারিটি, তার ভেতর পদার্থ কম। মানুষের মন ভোলানোর কাজ খুব সহজ।

শৈলেন তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো, হিমাংশু, তুই একটা প্রতিভা! যার পদ্য একালের কা'রো ভালো লাগলো না, সেই ত অনাগত যুগের কবি। সমসাময়িককালে প্রতিভার আদর কম, এ ত সবাই জানে।

দু'জনে দু'জনকে এমনি ক'রেই চিম্‌টি কাটতো।

হিরণ্ময়ী তখন শাশ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, শৈলেন আর হিমাংশু গেল বাগানের দিকে। ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে একবার শাশ্বতী আর শৈলেন নিজেদের নমস্কার বিনিময়ের মহাকর্ত্তব্যটা হাসিমুখে সেরে নিল।

অবিনাশের চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে সরকারী কর্ম্মচারী মহলে যে একটা বিশেষ দলাদলি আর কানাকানি চলেছে, এ সংবাদ হরেনবাবুর জানা ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল দেখাশোনা না হওয়ায় সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তটা তাঁর অজানা ছিল, আজ সেটা সবিস্তারে অবিনাশের মুখে তিনি জানতে পারলেন। একথাও অবিনাশ বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে, তাঁর চাকরিতে জবাব দেওয়ার ব্যাপারটার প্রতি এক শাশ্বতী ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো সহানুভূতি নেই এবং এ নিয়ে আলোকপ্রাপ্তার সঙ্গে তাঁর একটা বিশেষ অশান্তিকর বাদানুবাদ চলছে। হিমাংশু অনেকটা তার বাপেরই সমর্থন করে। তবে কিনা হিমাংশু কাব্যসাহিত্য নিয়ে থাকে, সেই হেতু তার মতামতের বিশেষ কোনো দাম নেই, এই যা সান্ত্বনা।

হিরণ্ময়ী কথাটা শুনে হাসি আর চাপতে পারলেন না, মুখে আঁচল চাপা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাসির একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

অবিনাশ মুখ ফিরিয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, এইটিই আমার দুঃখ, বুঝলেন বৌঠান? একটিমাত্র ছেলে, কিন্তু সেও যদি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাব্যসাহিত্য নিয়ে মাতে, তবে বানপ্রস্থ ছাড়া আর গতি নেই।

হিরণ্ময়ী বললেন, আপনার ভয় নেই, ঠাকুরপো। সত্যিকারের দায়িত্ব যেদিন ঘাড়ে পড়বে সেদিন সব শুধরে যাবে। আমার শৈলেনেরও ত ওই একই কথা। এ না হয় শান্ত হয়ে পদ্য লেখে, আর ও যে হরিজন উদ্ধার থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ-ভাল্লুক পর্য্যন্ত শিকার ক'রে বেড়ায়। সমস্যা দুজনেরই এক, তবে চেহারাটা ভিন্ন এই যা। দুজনের যা হোক কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দিয়ে দুটো বিয়ের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাকীমা, আমি কাকাবাবুর জন্যে একটু জলখাবার এনে দিই।—এই ব'লে হঠাৎ আলোচনার মাঝখানেই তাড়াতাড়ি উঠে শাশ্বতী ভিতর দিকে চলে গেল।

বাড়ীর ব্যবস্থাটা চিনে নিতে শাশ্বতীর বিলম্ব হোলো না। কাকীমার গৃহস্থালি চিরদিনই একটু এলোমেলো। সে-বছর অজুর টাইফয়েড অসুখে শাশ্বতী এই পরিবারের অনেকটা দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছিল—শৈলেন তখন কলকাতায়।

নীচের বারান্দায় একটি গুল্‌তি হাতে নিয়ে অজু একটা কাকের দিকে তাগ করছিল। ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শাশ্বতী পা টিপে টিপে পিছন থেকে অজুর চোখ টিপে ধরলো। অজু সন্দেহক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

শাশ্বতী বললে, তখন পালালে কেন?

আপনি ধরলেন না কেন? আপনি ত আর আমার মতন ছুটতে পারেন না।

শাশ্বতী বললে, আর সেই যে ছুটতুম তোমার সঙ্গে বাগানপুরের মাঠে! তুমি ত পারতে না আমার সঙ্গে।

অজু অনেক ভেবে চিন্তে বললে, ওঃ, তখন আমি যে কত ছোট ছিলুম!

আমাকে কি ব'লে ডাকতে, মনে আছে অজু?

হ্যাঁ, ছোড়দি বলে ডাকতুম। আপনি পুরী যাবেন আমাদের সঙ্গে?

নিয়ে গেলে যাবো বৈ কি, ভাই। কে কে যাবে?

অজু বললে, দাদা আমাদের সক্কলকে নিয়ে যাবে।

দাদা তোমার বুঝি আজকাল খুব মাতব্বর? কই, জিগেস ক'রে এসো দেখি, আমাকে উনি নিয়ে যাবেন কি না?—না না, বাইরে নয়, ওরা গেছে ওই কলতলার পাশ দিয়ে বাগানের দিকে।

অজু একটু বিস্মিত হয়ে বললে, আপনি কি ক'রে জানলেন ওদিকে বাগান আছে? এদিক থেকে ত দেখা যায় না।

আমি আরো অনেক জানি, ভাই। ব'লে শাশ্বতী অজুর চিবুকটি নেড়ে দিল। অজু ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল।

আসবার সময় শাশ্বতীরা কাকাবাবুর পছন্দ মতো খুব ভালো খাবার এনেছিল। রেকাবে ক'রে খাবার আর কাচের গেলাসে জল নিয়ে শাশ্বতী আবার এ ঘরে এসে দাঁড়ালো। ওঁদের তিনজনের আলোচনা হঠাৎ শাশ্বতীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে

স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং সেই নাটকীয় নীরবতার মাঝখানে হবেনবাবুই হাসিমুখে ব'লে উঠলেন, তোমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, মা।

রেকাবটি এবং জলেব গেলাস তাঁব কাছে বেখে দিযে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, জানি কাকাবাবু, আমি আপনাদেব গলগ্রহ।

হিরণ্ময়ী হাসিমুখে বললেন, ওরে পাগলি, বিয়ের কথা হচ্ছে না। পুবী যাবাব কথা উঠেছিল, ঠাকুবপোব সঙ্গে তোর যাওয়া সম্ভব কিনা সেই কথাই আমবা বলছিলুম। আলোকলতাব একটা মত নিতে হয় ত।

শাশ্বতী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, বাবা কার মতে কলকাতায এসেছেন, জিজ্ঞেস করুন ত কাকীমা?

অবিনাশ হাসলেন। হেসে বললেন, কথাটা ঠিকই মুখুজ্যে মশাই। বুড়ো বযসে মাযের নির্দ্দেশেই চলাফেবা কবি, কথাটা সত্যি। আমাব পুবী যাওয়া সম্বন্ধে শাশ্বতীর মতামতটাই আসল, শাশ্বতীর মাযেব নয। তাহ'লে বলো মা, আমাব যাওয়া সম্ভব কিনা?

কন্যার কাছে পিতাব এই বিনাসত্তে আত্মসমর্পণ দেখে হবেনবাবু ও তাঁব স্ত্রী অলক্ষ্যে দৃষ্টিবিনিময কবলেন।

শাশ্বতী বললে, পুবীতে আমাব নিজেব যাবাব উৎসাহ এমন কিছু নেই, কিন্তু তোমাকে ত একলা ছেড়ে দিতে পাবিনে, বাবা।

অবিনাশ বললেন, একা ত নয মা, তোমাব কাকা কাকীমা শৈলেন—এঁবা সবাই বয়েছেন।

শাশ্বতী ঈষৎ-উচ্চকণ্ঠে বললে, এতদিন পবে কি তুমি এই বুঝলে, আমি ছাড়া তোমাব কোথাও যাওয়া চলে?

উদ্গত হৃদযাবেগ চেপে সে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল।

তা বটে। এই সহজ সত্য কথাটা এতক্ষণে অবশ্য এঁবা কেউই ভেবে দেখেন নি।

নিশ্বাস ফেলে এক সময অবিনাশ বললেন, তাহ'লে সমস্যাটা শুনুন, বেয়ান। সরকারী কর্ম্মচারী হিসেবে টাকাকড়ি যে নিতান্ত কম বোজগাব করেছি তা নয়। কিছুই যে জমাতে পারিনি, এমন কথাও বলা চলে না। তবে দীর্ঘকাল যাবত সরকারী কর্ম্মচারী থাকাব ফলে আলোকলতা নিজের একটি

পদমর্য্যাদা ভোগ ক'রে আসছেন—সেটি তিনি সহজে পরিত্যাগ করতে রাজী নন। তিনি একথা ঠিক জানেন, সীনিয়রকে ডিঙিয়ে জুনিয়র মুন্সেফ যদি সাবজজ হয়, তবে সেই আহত আত্মমর্য্যাদা আর অপমান সরকারী কাগজপত্রের জঞ্জালে লুকিয়ে থাকে, জনসাধারণ অতটা তলিয়ে দেখে না,—তিনি মনে করেন, এদেশে সরকারী অবিচারে যাদের আত্মসম্মান বিপন্ন হয়, তারা দেশের লোকের কাছে অগৌরবের পাত্র নয়। চাকরি এবং উপার্জ্জনের পন্থাটাই সেখানে প্রধান। কিন্তু সমস্যা হোলো শাশ্বতীকে নিয়ে। শাশ্বতী বলে, বাবা, মনুষ্যত্ব আর ন্যায়-বিচারের আদর্শ যেখানে ক্ষুণ্ণ হোলো, ভদ্র মানুষের আত্মসম্মান যেখানে পদ-দলিত হোলো, সেখান থেকে স'রে আসাই ভালো। অযোগ্যতা আর পক্ষপাতিত্ব এদেশে রাজ্যপাট পায়, তুমি তাকে অস্বীকার ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াও,—তা'তে আর কিছু না হোক, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দেওয়া হবে। আলোকলতার সঙ্গে শাশ্বতীর এখানেই বিরোধ, বৌঠান। এই দুই আদর্শের মাঝখানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

হরেনবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হিরণ্ময়ী প্রশ্ন করলেন, আপনার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার আবেদন কি মঞ্জুর হয়ে এসেছে?

অবিনাশ বললেন, এখনো আসে নি, দেরি করে আসতে পারে; হয়ত কারণ কৈফিয়ৎও ভালো করে চাইতে পারে, এখনো ঠিক নেই। তবে যতই দেরি হবে, ততই বুঝবো আমাকে হয়রান করার অহেতুক প্রয়াস তাদের এখনো রয়েছে।

আপনার ছুটি ক'দিনের?

অবিনাশ হাসিমুখে বললেন, প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিলুম, বৌঠান—কাজেই কামাই বিশেষ করি নি। ছুটি পাওনা রয়েছে এখনো প্রায় এক বছর।

হরেনবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, তাহলে চাকরি সমস্যা আপাততঃ আপনার কম, কেমন ঘোষাল মশাই?

হ্যাঁ, ওটা এক প্রকার চুকিয়েই ফেলেছি। এখন পারিবারিক প্রশ্নটাই বড় হয়েছে, ভায়া। মনে হচ্ছে, এবার মেয়ের পাত্র ঠিক না করে ফিরে গেলে ছোট বউ অপমৃত্যুরই শরণাপন্ন হবেন।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হিরণ্ময়ী হাসিমুখে বলে উঠলেন, হিমাংশু বুঝি সেই নোটিসই জারী করতে এলো ?

একটা কোনে পরামর্শ চলছিল হিমাংশুর সঙ্গে শৈলেনের, শাশ্বতী এসে দাঁড়াতেই তারা থেমে গেল। হাসিমুখে শাশ্বতী বললে, এত সন্দেহ আমাকে, কই আগে ত জানতুম না।

শৈলেন স্মিতমুখে তাকালে। বললে, বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য

কথাটা শিখে রেখেছেন জানি, কিন্তু তার প্রয়োগ এখানে নয়। আমি ভাবছি দাদার কথা, গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই বন্ধুর সঙ্গে গলাগলি। এত ভাব তোমার এতদিনে কোথায় ছিল বলো ত ?

হিমাংশু মুখ ফিরিয়ে বললে, গোত সপ্তাহে আমাদের মধ্যে চারখানা করে চিঠি যাতায়াত করে, তা জানিস ?

কথাটায় শাশ্বতীর কেমন যেন একটু সন্দেহ হোলো। বললে, আচ্ছা, শৈলেন-বাবু, আপনার সঙ্গে কলকাতার কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের পরিচয় আছে ?

শৈলেন বললে, কেন বলুন ত ?

হিমাংশু এবার দপ ক'রে জ্বলে উঠল। বললে, শুনিসনে, শুনিসনে ওর কথা, শৈলেন। ওর ধারণা আমি তোকে ধরে সম্পাদকের কাছে তদ্বির তদারক করবো, যাতে আমার কবিতা ছাপা হয়। সাধে কি মা ওকে বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ। যা পোড়ারমুখী তুই এখান থেকে।

শাশ্বতী হাসিমুখে বললে, এতদিন পরে এসে ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া করলে কি হয় জানো ত ?

শৈলেন বললে, থাক, তোমাদের ঝগড়া আমিই থামিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা ব'লে রাখি। হিমাংশু এর আগে একখানা চিঠিতে আমাকে জানিয়ে রেখেছে, তোমার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ও আর কাব্যচর্চ্চা করবে না—

এত বড় প্রতিজ্ঞার কারণ ?

ওর কবিতা-মানসী নাকি তোমার পায়ের শব্দে দেশ ছেড়ে পালায়। এর পরে

বলি। আমাদের আলোচনাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। আমরা যাবো বিদেশে, ও হবে আমাদের সঙ্গী।

শাশ্বতী বললে, কিন্তু একটা খবর শুনলে কি আর দাদার রুচি থাকবে আপনাদের সঙ্গে যেতে?

হিমাংশু হাসিমুখ তুলে বললে, কি শুনি?

যদি বলি বাবাকে নিয়ে আমিও যাবো কাকাবাবুদের সঙ্গে পুরীতে?

শৈলেন উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, সত্যি বলছো?

শাশ্বতী ঘোষাল কখনো মিছে কথা বলে না। অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয় নি। তবে বাবার শরীরের দিকে চেয়ে হয়ত আমাকে এই ব্যবস্থাই করতে হবে। কলকাতায় তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটলো না।

শৈলেন বললে, কিন্তু আমি যে শুনেছিলুম, জ্যাঠামশাই কলকাতায় এসেছিলেন কি যেন অন্য কাজে?

হ্যাঁ, সেটা সম্পূর্ণ বাজে কাজ। আমার বিয়ের ঘটকালি সেই অপচেষ্টা আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

আলোচনাটার অনধিকার চর্চা আছে ব'লেই শৈলেন কথাটার আর জবাব দিল না। কিন্তু হিমাংশু গম্ভীরমুখে বললে, একথা মায়ের কানে উঠলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে, জানিস শাশ্বতী?

শাশ্বতী বললে, জানি, কিন্তু তুমি যা জানতে পারোনি তাই নিয়ে তর্ক ক'রো না। বুঝতে পারছি, এ কথা তোমার চিঠি থেকেই মার কানে উঠবে। কিন্তু সেই চিঠিতেই লিখে দিয়ো, শাশ্বতীর বয়স অনেককাল আঠারো পেরিয়ে গেছে, নিজের অধিকার আর দায়িত্ববোধ সে চিনেছে। তাকে নাবালিকা ব'লে যেন কেউ না মনে করে।—শৈলেনবাবু, আপনারা দিনস্থির করুন, বাবাকে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি যাবো এক গাড়াতে।

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। তার স্বাস্থ্যময়, সুন্দর ও গর্বিত গতিভঙ্গীটির দিকে শৈলেন বিস্ময়স্মিত মুখে চেয়ে রইল। তিন বছর পরে আজ হঠাৎ যেন শৈলেন শাশ্বতীকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করল। এত যে শ্রী, বাক্যচ্ছটার এমন যে মধুর আবেশ শাশ্বতীর মধ্যে সঞ্চিত ছিল, শৈলেনের আগে তা জানা ছিল না।

এই—বলে হিমাংশু তার হাঁটুতে একটা ঠোকা দিল।

শৈলেন সচকিত হয়ে বললে, কি বল্ না ?

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুই আর আমার দলে নেই।

তার মানে ?

তার মানে শাশ্বতী তোকে ঘুষ খাইয়ে গেল।

শৈলেন বললে, কি যে বলিস।

হিমাংশু বললে, আমার দুর্ভাগ্য, আমাকে সবাই মায়ের গোয়েন্দা মনে করে। তুই-ই বল্ ত, বাবার চাকার ছাড়া এসময়ে কি ভালো হোলো ? শাশ্বতীর বিয়ে করতে না চাওটাও কি ভালো ?

খুব মন্দ।—শৈলেন অন্যমনস্কভাবে বললে, আর কাকাবাবু যদি নিতান্তই চাকরি ছাড়েন, তোর পক্ষে কবিতা লিখে সময় নষ্ট করাও ত ভালো নয়।

বেশ, আজ থেকে আমি কাউকে কিছু বলবো না, মাকেও কিছু জানাবো না। যা ঘটে তা ঘটুক।

শৈলেন বললে, সেই ভালো। বিবাদে কাজ নেই। আপাততঃ সবাই মিলে পুরী যাওয়া যাক।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। হিমাংশু বললে, আমাদের প্ল্যানটা কিন্তু ভেস্তে না যায়, ব'লে রাখলুম।

সে ঠিক আছে।

মুখুজ্যে মশায়ের ওখান থেকে শাশ্বতী তার বাবাকে নিয়ে যখন ফিরে এলো, রাত তখন প্রায় আটটা। হিমাংশু এলো না, শৈলেনের সঙ্গে সে গেল সিনেমায়। ফিরতে রাত হবে। বাড়ী ফেরবার আগেই দুপুরবেলা বালিগঞ্জের বাড়ীতে বসেই শাশ্বতী ভাগলপুরে তার মা'র কাছে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, তারা সবাই দু'তিন দিনের মধ্যে পুরী রওনা হবে। সুতরাং পরের চিঠি না পাওয়া অবধি মা যেন অপেক্ষা করেন। হিমাংশুর নিরাপদে পৌছানোর সংবাদও ওই সঙ্গে শাশ্বতী জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মামীমার এখানে ফিরেই শাশ্বতী একটা হৈ-চৈয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

রেবা দৌড়ে এসে খবর দিল, সুকুমার বিকেলবেলা থেকে এসে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। দেবীর দর্শন দুর্লভ সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা না করে সে ফিরবে না। বিলাত থেকে সে ইংরাজী ডিগ্রি আর ইংরাজী 'টেনাসিটি' দুই-ই সঙ্গে এনেছে।

দেবী করুণাময়, একবার দেখা দাও। থাক্ থাক্, 'যেমন আছো অমনি এসো আর কোরো না সাজ!'

রেবার উৎফুল্ল উৎসাহে শাশ্বতী অতটা তাড়াতাড়ি যোগ দিতে পারল না, বরং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রেবার দিকেই একবার তাকাল। তারপর বললে, তুই যা না ভাই আগে, বাবাকে সুস্থ ক'রে রেখে আমি এখুনি আসছি।

বাবারে, সাধে কি লোকে তোমাকে অতি পিতৃভক্ত ব'লে ঠাট্টা করে! এসো কিন্তু এখুণি, আমি চললুম।

কি একটা কাজে মামীমা এই দিকে আসছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, ছেলেমানুষ উৎসাহ ক'রে সেই কখন থেকে ব'সে আছে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি নাও না মা।

তরুবালার কণ্ঠস্বরটা শাশ্বতীর খুব ভালো লাগল না। কিন্তু মামার বাড়ীতে বরাবরই সে প্রিয়, সুতরাং মুখ তুলে মামীমার কথার জবাব দিতে তার বাধলো। কেবল বললে, কাপড় চোপড় ছেড়ে এখুনি যাচ্ছি, মামীমা।

ওমা, সে কি কথা! ওরা বিলেত-ফেরত ছেলে, ওদের মেজাজ অন্য রকম। আটপৌরে কাপড়ে গেলে ওদের মন ভালো হবে কেন মা? তুমি ওই কাপড় পরেই যাও, শাশ্বতী।

সহসা শাশ্বতীর মন বেঁকে বসলো। তার নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর পৃথিবীতে কেউ চড়াও হয়, এ সে কোন কালেই সহ্য করেনি। সে কেবল মামীমার প্রতি একবার নীরব দৃষ্টি তুলে দেখল, তারপর নিজেকে সংবরণ করে বললে, আচ্ছা, তাই যাবো, মামীমা।—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

মুখখানা কঠিন ক'রে সে অবিনাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। আলোয় তার মুখখানা স্পষ্ট করে দেখা গেল না। অবিনাশ তাঁর গায়ের শালখানা খুলে রেখে ততক্ষণ গড়গড়া টানতে বসেছেন। শাশ্বতী বললে, বাবা?

কি মা?

বেস্পতিবারে পুরী যাবার কথা কাকীমাদের বলে এলুম, কিন্তু আমার ইচ্ছে বুধবারেই যাই।

নল থেকে মুখ সরিয়ে অবিনাশ বললেন, হঠাৎ তোমার মত বদলালো কেন মা?

শাশ্বতী অনুভব করলে আশেপাশে কেউ যেন তার কথা শুনছে। সম্ভবতঃ মামীমা এবং রেবা দু'জনেই। কিন্তু শাশ্বতী অবিনাশের কথার স্পষ্ট জবাব দিল না। কেবল বললে, কাল সকালেই তুমি দাদাকে পাঠিয়ে কাকাবাবুকে খবর দিয়ো, বুধবার সন্ধ্যায় আমরা সবাই রওনা হবো।

আর কিছু নয়, তরুবালার সেদিনকার আচরণ এবং আজকের, এই দুইয়ে মিলে আজ যেন হঠাৎ একটা অকারণ তিক্ততায় তার মন ভরে উঠেছে। সুকুমারের চোখে সে সুরূপা হোক, প্রিয় হোক—মামীমার এই কামনা। কিন্তু তাঁর এই দিককার চেষ্টা-চরিত্রে এমন একটা অপমানজনক অশোভনতা সে লক্ষ্য করেছে, যেটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেমানান। এই বস্তুকে যারা নানা ছলনায়, নানা প্ররোচনায় প্রশ্রয় দেয়, তারা শিক্ষিত অথবা অভিজাত হলেও ইতর। এখানে আর তার থাকার প্রয়োজন নেই।

অবিনাশ বললেন, আচ্ছা মা, খবর আমি কালই পাঠিয়ে দেবো। তোমার সঙ্গে কে যেন একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে, শুনলুম মা।

চক্ষু নত করে শাশ্বতী বললে, হ্যাঁ বাবা, সুলতাদিদির দেওর সুকুমারবাবু এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করব, বাবা, তাঁর সঙ্গে

পশ্চাৎবর্তিনী শ্রোত্রীদের শুনিয়েই পিতাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রশ্নটি করলে। অবিনাশ বললেন, করবে বৈ কি মা, নিশ্চয়ই। গোবিন্দপদবাবু খুবই অমায়িক লোক, তাঁর ছেলেটিও যে বাপের মতন হবে, এতে আর সন্দেহ কি! একটু চা-টা দিয়ো ছেলেটিকে তোমরা।

শাশ্বতী সেখান থেকে চ'লে গেল।

সুকুমারের ঘরে এসে দাঁড়াতেই সুকুমার নিজেই আজ সোৎসাহে বলে উঠল, নমস্কার, শাশ্বতী দেবী।

নমস্কার—ব'লে শাশ্বতী ফরাসপাতা মেঝের একধারে গিয়ে বসলো। কিন্তু সে লক্ষ্যই করল না, পলকের মধ্যে রেবার সঙ্গে সুকুমারের একটা দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

সুকুমার বললে, আজ আপনাদের এখানে আমি ঠিক অতিথি নই, বরং অভ্যাগত। আমি মনে করিয়ে দিতে এলাম, আজ আমাদের সকলের সিনেমা যাবার কথা ছিল। কালকের ব্যবস্থা বুঝি ভুলে গেছেন?

ওঃ—ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ত ! শাশ্বতী অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল, কি রেবা, তোরও কি, ভাই, মনে পড়ে নি ? বাস্তবিক সুকুমারবাবু, কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না।

একটু আগেকার ঘটনায় রেবার মুখে চোখে ঈষৎ বিষণ্ণতা ও ক্ষোভের চিহ্ন তখনও ফুটেছিল। তবু সে আত্মসংবরণ করে বললে, কিন্তু তুমি যে মুখুজ্যে মশায়ের ওখানে গিয়েছিলে, শাশ্বতীদি' ?

শাশ্বতী বললে, গিয়েছিলুম সত্যি, কিন্তু সিনেমার কথা মনে থাকলে কখনই যেতুম না, ভাই।

সুকুমার বললে, অবশ্য এমন হয়েই থাকে। জরুরি কাজটাই আগে দাবি জানায়।

না, সুকুমারবাবু—শাশ্বতী বললে, জরুরি কোনোটাই ছিল না। সিনেমা, কিম্বা কাকাবাবুর বাড়ী যাওয়া কোনোটাই নয়। কিন্তু আপনার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলুম না—এই অপরাধের ক্ষমা নেই। বাবাও এটা কোনো দিন পছন্দ করেন না।

সুকুমার সহাস্য মুখে বললে, যাকগে, এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। এখন বলুন, আজ সারাদিন আপনার কেমন কাটলো।

শাশ্বতীর মুখে এবার হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু তার হয়ে রেবাই উত্তর দিল। বললে, সারাদিনের কথাটা ও বলবে। তবে সকালবেলা হিমাংশুদা এসে পৌছতে না পৌছতেই শাশ্বতীদি'র সঙ্গে তার ঝগড়া আরম্ভ হয়েছিল।

হেতু ?

শাশ্বতী বললে, না, সে কিছু নয়। দাদা কবিতা লেখেন কিনা, তাই আমরা তাঁকে একটু ক্ষ্যাপাই।

কবিতা বুঝি আপনি পছন্দ করেন না ?

করি, তবে দাদার কবিতা আলাদা জিনিস। পড়ে আমরা খুব হাসি।

সুকুমার বললে, হাসির কবিতা লেখেন বুঝি ?

শাশ্বতী বললে, হাসির কবিতা কিম্বা হাস্যকর কবিতা সে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমাদের সময় বেশ কাটে।

উচ্চকণ্ঠে সুকুমার হেসে উঠল।

রেবা বললে, আপনার সিনেমা দেখাবার উৎসাহটা এবার হয়ত স্থগিত রাখতে হোলো, মিষ্টার মুখার্জ্জি।

কেন বলুন ত ?

শাশ্বতীদি' যখন এখনো বলেনি, তখন আমিই ধরিয়ে দিচ্ছি। ওঁরা সবাই পরশু দিন পুরী রওনা হবেন।

সুকুমার বললে, তাই নাকি ? অসম্ভব।

অসম্ভব কেন ?

এত সহজে কি উনি মায়া কাটিয়ে যাবেন ?

শাশ্বতী বললে, মায়া-মমতা সঙ্গেই নিয়ে যাবো, সুকুমারবাবু।

কি রকম ?

আমার কাকীমারা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেই বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি।

সুকুমার বললে, আত্মীয় পরিজনের বাইরে কি আপনার স্নেহের পাত্র আর কেউ নেই, শাশ্বতী দেবী ?

শাশ্বতী বললে, আছে বৈ কি। কাকীমাদের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র কুটুম্বিতা কিম্বা আত্মীয়তা নেই—তবু ওঁরা আমাদের খুবই আপন।

রেবা চোখ টিপে বললে, বিশেষ করে মিষ্টার মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত···

চমকে উঠে শাশ্বতী বললে, ওকি, ছি রেবা !

সচকিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুকুমার তাকালো।

রেবা বললে, জানেন সুকুমারবাবু, এই কথাটা শুনলেই শাশ্বতীদি'র ভীষণ রাগ হয়।

নতমুখে শাশ্বতী বললে, যেটা অস্বস্তিকর, সেটা নিয়ে কি কটাক্ষ করা উচিত ?

রেবা বললে, এমন ত হতে পারে, কোন্‌টা অস্বস্তিকর, আর কোন্‌টা দুঃখদায়ক তোমার জানা নেই! উঁচু গলায় অস্বীকার করলেই কি সব মিথ্যে হয়ে যায়, শাশ্বতীদি' ?

কিন্তু জোর করে বললেও ত সত্যি হয়ে ওঠে না, রেবা।—বসুন সুকুমারবাবু, আপনার জন্যে একটু চা এনে দিই। এই বলে শাশ্বতী ভিতরে চলে গেল।

অজ্ঞাত কোন্‌ এক মিষ্টার মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শুনে সুকুমার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বীরেন ডাক্তারের ছেলের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে,

একথাটা স্থলতার মারফত আজ দুপুরে হঠাৎ তার কানে উঠেছিল। কিন্তু মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র নামক ব্যক্তিটির কথা আজ একেবারে অভিনব। মনে পড়ছে একদিন একথা সে হাসিমুখে বলেছিল, সৌভাগ্যবান ডাক্তারপুত্র! বলেছিল, অতঃপর আঙুরকে সে টক ব'লেই নিজেকে সান্ত্বনা দেবে। বলেছিল, রেবাকে বিয়ে করলেও মন্দ হয় না। তাতে আর কিছু না হোক, অন্তত শাশ্বতীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিছু নিকটতর হতে পারে। কিন্তু সে সমস্তই যেন অতীত যুগের কথা। সেই বীরেন ডাক্তারের পুত্রেব ব্যাপারে শাশ্বতীও যেমন অগ্রসর হয়নি, রেবার সঙ্গে তার বিয়ে নিযে বৌদিদিও তেমন আর বিশেষ কিছু নাড়াচাড়া করেন নি। সুতরাং আজ যদি সুকুমারের মন কোনো বিশেষ উচ্চাভিলাষে একটু কল্পনাশীল হয়ে উঠে থাকে, তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। একথা ঠিক, রেবার সম্পর্কে সে কোনো অবিচার করবে, বালিকাসুলভ চপলতায় তার মধুব স্বভাবটি সুন্দর বলেই পুরুষের মনকে সহজে সে মোহগ্রস্ত করে। বয়সের সম্ভার তার সর্ব্বাঙ্গকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে; প্রাণের স্বচ্ছলতায় তার সান্নিধ্যটা রোমাঞ্চকর। রেবার সম্পর্কে বৌদিদির কাছে স্তুতিবাদ সে শুনেছে, বৌদিদির অনুরোধও সে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখান করেনি, কিন্তু পাকা কথাও কিছু সে বলেনি।

আজ আবার হঠাৎ আর এক মুখার্জ্জি পুত্রের নাম নতুন ক'রে কানে উঠতেই সুকুমারের মনে একটা ধাক্কা লাগলো। শাশ্বতীর গত কয়েক দিনের মধুর আচরণে নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের পথ ধরে তার হৃদয় বহুদূর অবধি অগ্রসর হয়ে এসেছে, এই কথাটাই স্তব্ধ হযে বসে সে ভাবতে লাগলো।

রেবা যে এতক্ষণ তাকে নিঃশব্দেই লক্ষ্য করছিল, সুকুমার তা বুঝতে পারেনি শাশ্বতীর চলে যাবার পথের দিকে চেয়েই সে একটু অন্যমনস্ক হযে পড়েছিল। সহসা রেবা এক সময বললে, এত গাম্ভীর্য্য ত আপনার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। কি ভাবছেন মিষ্টার মুখার্জ্জি?

সুকুমার হেসে উঠল।

রেবা বললে, মানুষ কোন্ মেজাজে কি ভাবে, প্রশ্ন করা অন্যায় জানি। কিন্তু ফোয়ারার ছিদ্র হঠাৎ বন্ধ হলে সকলেরই কৌতূহল হয, কোথায় গণ্ডগোল ঘটল।

সুকুমার বললে, বলুন ত' কি ভাবছিলুম?

নিশ্চয় আপনার পিসিমার তীর্থযাত্রার কথা ভাবছিলেন না।

সুকুমার এই পরিহাসে আবার হেসে উঠল।

বললে, এটা আপনার পক্ষে কল্পনা করাও ত অন্যায়! বেশ ত বলুন না, আমি কি ভাবছিলুম।

রেবা বললে, বিদ্যের দৌড় আমার কম। তবে হয়ত আপনি বেল ফুল-যুঁই ফুলের পার্থক্য বিচার করছিলেন।

বটে—সুকুমার বললে, ও পথই আমি মাড়াইনি। আমি ভাবছিলুম একজন আদর্শভ্রষ্ট বিলেত-ফেরত যুবকের ভবিষ্যৎ!

কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট কেন?

কোনো আদর্শই যার ভালো লাগে না, তাকে নিশ্চয় আদর্শভ্রষ্ট বলা চলে।

রেবা বললে, এটাই আপনার বিলিতী আদর্শের পথে-কুড়োনো বুলি, মিষ্টার মুখার্জ্জি। হয়ত আপনি কোনো আদর্শই জীবনে তলিয়ে বিচার কবেন নি, তাই নিজেকে আপনার জানতে দেরি হচ্ছে।

সুকুমার রেবার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রেবার মুখ থেকে এমন কথা সে কল্পনা করেনি। আজ ওকে যেন বিচিত্র মনে হোলো।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তার মানে?

রেবা বললে, মানে—শাশ্বতীদি' এখানে থাকলে বলতে পারতো। হয়ত এই কথাই বলতো, আপনাদের মতন যারা বিলেত-ফের , তারা না দেখেছে ওদেশ, না দেখেছে এদেশ। তারা কেবল পরীক্ষা পাস করেছে, আব নিজের খেয়ালের দিক থেকে পৃথিবীকে বিচার করেছে।

সুকুমার হেসে বললে, আজ সত্যিই অবাক্ হচ্ছি আপনার কথা শুনে। শাশ্বতী দেবীর সঙ্গে কি আপনাব এইসব আলোচনা হয়?

হয় বৈকি—বলতে বলতে চায়ের পেযালা আর মিষ্টান্ন নিযে শাশ্বতী ঘরে ঢুকল। দু'জনেই তার দিকে চেয়ে হাসলে।

শাশ্বতী বললে, রেবা চালাক কম নয়! আমার খরচে বেশ আসর জমিযে তুলেছে! কিন্তু কি কথা আপনাদের হচ্ছিল শুনি?

সুকুমার বললে, ভারী বিপদে পড়েছি, শাশ্বতী দেবী। আমার শিক্ষাদীক্ষার ওপর রেবা দেবী আজ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছেন।

অকারণে ?

অকারণে নয়, শাশ্বতীদি'—রেবা বললে, উনি নিজেকে হঠাৎ আদর্শভ্রষ্ট ব'লে অভিহিত ক'রে বসলেন। বললেন, ওঁর কোনো আদর্শই ভালো লাগেনা।

সুকুমার বললে, তার উত্তরে উনি বললেন, আমি নাকি পথে-কুড়োনো বুলি চালিযে বেড়াই। আমি নাকি এদেশ-ওদেশ—কোনো দেশকেই চিনিনে।

শাশ্বতী হাসিমুখে বললে, ক'জনই বা চেনে! দেশের স্বভাব জেনে সেই দেশের মানুষকে বিচার করতে হয়, ওকথা কি সবাই বোঝে, সুকুমারবাবু ?

সুকুমার বললে, কিন্তু মানুষের স্বভাব যে বিশ্বজনীন, একি আপনি মানেন না ? মানুষ তার চিন্তাবিচারে নিজের দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম কবে ব'লেই ত আজকে আমরা মানুষের বিশ্ববিজয ঘোষণা করি।

শাশ্বতী বললে, সেটা জ্ঞানবুদ্ধিব দিক থেকে, সুকুমারবাবু। বিশ্বকবির কবিতায় বিশ্বজননীর হৃদয সাড়া দেয় একথা জানি। বড বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, আর বড় দার্শনিকেব তত্ত্ববিচাব, আমাদের সকলের মনে প্রতিধ্বনিত হয—এও স্বীকার করি। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি মাব খেয়েছে স্বভাবের দিক থেকে। বিশেষ দেশের বিশেষ স্বভাবের আবহাওযায় যারা নিঃশ্বাস নিযে মানুষ হযে ওঠে—তাকে জানবার চেষ্টা করা অনেক বড কাজ।

সুকুমার বললে, বুঝতে পারলুম না।

তাহ'লে একটু গবম-গবম চা খেযে নিন।

শাশ্বতীব নাটকীয পরিহাসে সবাই হেসে উঠল।

মিষ্টিমুখে চা খেযে সুকুমার বললে, এদেশে গোরুর গোবর কপালে ছুঁইযে লোকে শুদ্ধ হয।—বলুন, এই দিক থেকে কি এদেশেব স্বভাবকে বিচাব করতে হবে ?

নিশ্চয়ই না। একে ত স্বভাব বলতে পাববো না। এটা লোকাচারের মোহ—এটাকে বদ্ অভ্যাস বলতে পাবি। কিন্তু যদি কেউ বাইরে থেকে এসে এই অভ্যাসকেই ব'লে বসে, মনুষ্যত্বেব মানদণ্ড, তাকে বলৃব মূর্খ। কালো বিড়ালকে নিযে বিলিতী কুসংস্কাব দেখে যদি কেউ বলে, ইংবেজের স্বভাব অতি কদর্য্য,—তাকেও আমরা সুশিক্ষিত বল্‌ব না। আসল কথা ওখানে নয়, সুকুমারবাবু।

সুকুমার কল্পনাও করেনি, এইসব আলোচনা এদের মুখে সে শুনবে। শাশ্বতীর ব্যক্তিত্বকে বরাবরই সে সমীহ ক'রে এসেছে, এবং রেবার মুখ থেকেই শুনেছে,

সংস্কৃত সাহিত্যে ও কাব্য ইত্যাদি অবিনাশ ঘোষালের কাছে তাঁর এই মেয়েটি বেশ ভাল ক'রেই পড়াশুনা করেছে। অথচ এই দিক থেকে তার নিজের আয়োজন সামান্য। শিক্ষাজীবনে যোগ্যতাকেই সে বড় মনে ক'রে এসেছে। পড়াশুনা সে ভালভাবেই করেছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে নয়। দর্শন আর সমাজতত্ত্বের ধার সে ধারে না।

আলাপটা অবশ্য সেদিন সমারোহ করেই জমতে পারতো, কিন্তু রাত প্রায় দশটা বাজে দেখে শাশ্বতীকেই উঠে দাঁড়াতে হোলো। অবিনাশের খাবার সময় হযেছে, এবং সে না উপস্থিত থাকলে যে তাঁর খাওয়াই হবেনা, একথা রেবা পর্য্যন্ত এই কদিনে জানতে পেরেছিল।

সুকুমার উঠে দাঁড়াল।

বললে, যুদ্ধের জন্যে একদিন প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে দেখছি, কি বলেন রেবা দেবী ?

রেবা বললে, বেশ ত—

কিন্তু পুরী কি আপনাদের যেতেই হবে ?

মুখে চোখে সুকুমারের অসীম আগ্রহ ফুটে উঠ্‌ল।

শাশ্বতী বললে, অনেকটা অবশ্য বাবার জন্যেই যাওযা। আমরা পরশু দিন রওনা হবো।

কবে ফিরবেন ?

হাসিমুখে শাশ্বতী বললে, সেটা এখনো নির্দ্দিষ্ট হয়নি।

সুকুমার বললে, আশা করি পুরীর সমুদ্রের তলায় আমাদের স্মৃতি তলিয়ে যাবে না !

রেবা শাশ্বতীর হয়ে উত্তর দিল। বললে, বলা যায না, সঙ্গগুণে তেমন ঘটনা ঘটতেও পারে !

রেবার সুমুখেই হয়ত একটা অকারণ উচ্ছ্বাস সুকুমার প্রকাশ ক'রে ফেলতে পারতো ! কিন্তু সে আত্মসংবরণ করলে।

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, যদি আপনাকে আবার শীঘ্র দেখতে ইচ্ছা যায়, তবে সেই আগ্রহকে কি আপনি উপহাস করবেন, শাশ্বতী দেবী ?

শাশ্বতী আবার হাসলে। বললে, উপহাস না করি, ছেলেমানুষি বলতে

পারি ত!—আচ্ছা আসি। ব'লে একটা নমস্কার জানিয়ে শাশ্বতী ভিতর দিকে চ'লে গেল।

সেদিন কেমন একটা বেদনাবোধ নিয়েই সুকুমার ফিরে এসেছিল। কিন্তু সেই বেদনার কেন্দ্র তার কোন্ খানে, এটা ঠিক সে বুঝতে পারেনি।

বিলেতে থাকতে কেনসিংটনের পল্লীতে সে যে-প্রকার জীবনযাপনের অভ্যস্ত ছিল, আজকে তার সঙ্গে অনেক তফাৎ। সে জীবনটা ছিল বহির্মুখী, সেখানকার সুখ-দুঃখের বোধ ছিল ভালবাসা,—সেদিন দায়িত্ববোধের প্রশ্ন ওঠেনি। গোবিন্দপদ মুখুজ্যের টাকা যেতো নিয়মিত, নিয়মিত লঘুছন্দে তরতর ক'রে বয়ে যেত চটুলভাবে প্রত্যহের প্রবাহ। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আধুনিক জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত। তত্ত্ববিচারের দিক থেকে জীবনকে গুরুগম্ভীর চেহারায় দেখবার প্রয়োজন সে মনে করেনি। হাল্কা পাখায় রঙিন প্রজাপতি উড়ে চলেছিল।

মনে পড়ে পিতৃভক্তির উপর কটাক্ষপাতে শাশ্বতী অশ্রুমুখী হয়ে উঠেছিল। আজ বেদনাবোধের ভেতর দিয়ে শাশ্বতীর সেদিনকার চেহারাটা মনে পড়ছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অতিশয় পিতৃভক্তিবাদের স্থান নেই, এবস্তু নিয়ে সেদেশের সন্তান-সন্ততির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় না। পিতা এদেশে মহাগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। শাশ্বতীর স্বভাব আর তার চরিত্রবত্তা গ'ড়ে উঠেছে পিতার আদর্শে, একটি প্রসন্ন ভাবস্থিতিতে সে যেন কোন্ গভীরের মধ্যে শান্ত হয়ে ব'সে রয়েছে। সেখান থেকে তাকে কেন্দ্রচ্যুত করা অন্ততঃ বিলেত-ফেরত কারুর সাধ্য নেই।

গত কয়েকদিনের বন্ধুতার প্রশ্রয়ে এই যে তার মন একটু কল্পনা-প্রবণ হয়ে উঠেছে, এটা কি এতই অসঙ্গত? সুকুমার অযোগ্য নয়, একথা নিজেও সে জানে বৈকি। উচ্চশিক্ষা বলতে যা বুঝায়, সেবস্তু তার কম নয়। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করার উপাদান সে সংগ্রহ করেছে। পৈতৃক অবস্থা তাদের ভালো, পিতা তার সাব-জজ। বিলিতী বাঙ্গালীদের মধ্যে রূপবান বলে তার খ্যাতি, এই সেদিনও সে বিলেতে শুনে এসেছে। কলকাতার বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সঙ্গে সে সম্পর্কিত। পাত্র হিসেবে যোগ্যতা তার কম, একথা সে নিজে বিনয়সহকারে স্বীকার করলেও পাত্রীপক্ষ তাকে উচ্চ আসনই দেবে। বৌদিদি

করিতকর্ম্মা মেয়ে, রেবাকে তিনি গোড়া থেকেই নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছেন। কিন্তু শাশ্বতী যেন আজ তাকে সমস্ত কিছুর থেকে সরিয়ে দুরাশার দিকে ঠেলে দিলে।

অনিচ্ছুক নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা নাকি নীতিবিগর্হিত, এই কথাই সে জেনে এসেছে! কিন্তু এই ঘটনাই ত ঘটেছে চিরকাল। পুরুষের লিপ্সা ত ছুটেছে দুর্লভের দিকে। যা অজেয়, তাকে জয় ক'রে আনারই ত চিরকালীন সংগ্রাম। শাশ্বতীর সম্পর্কে তার পুরুষধর্ম্ম আজ যদি সত্যই উন্মুখ হয়ে উঠে থাকে, তবে সে কি এতই ধিক্কৃত হবে?

দু'দিন সুকুমার একা একাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। রেবার খবর সে নিলনা, বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করার উৎসাহ প্রকাশ করলেনা। কেবল স্বতঃ উৎসারিত প্রশ্নাবলীর অবিশ্রান্ত উত্তর-প্রত্যুত্তর নিয়ে সে নিজের কল্পনার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

নয়

মুখুজ্যে মশাই আগে থেকেই পুরীর বাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। তাঁদের পৌঁছাবার দিন তিনেক পূর্ব্বে জনদুই চাকর এবং হিন্দুস্থানী বামুন গিয়ে ঘরদোর, রান্নাভাঁড়ার সমস্তই প্রস্তুত রেখেছিল। সুতরাং যেদিন তাঁরা প্রথমে এসে বাসায় উঠলেন, অভিজ্ঞ ভৃত্যদলের ব্যবস্থায় কোথাও অসুবিধা ছিলনা।

অবসর দীর্ঘকালের, এবং অবিনাশও যদি মনে করেন, তবে এখান থেকেই তাঁরও ছুটি দীর্ঘতর ক'রে নেওয়া যায়। অতএব পুরীতে বসবাসের বেশ পাকাপাকি আয়োজনই করা হোল। বাড়ীটা বড়, সমুদ্রের বালুচরেরই কাছাকাছি,—সে-বাড়ীর একটা অংশ মুখুজ্যে মশাই অবিনাশকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু শৈলেন আর হিমাংশু দুজনে মিলে দক্ষিণ বারান্দার কোণে বড় হলটা নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত রাখলো।

শাশ্বতী শৈলেনকে শুনিয়ে বললে, এটা স্বার্থপরতা। সমুদ্রের চেহারাটা বড় দেখায়, হাওয়া আলো বেশী, ওদিকে জ্যোৎস্না উঠে,—ঘোর স্বার্থপরতা!

শৈলেন হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিছক ত নয়! ঘরটা দুজনে মিলেই ত ভাগ ক'রে নিয়েছি।

শাশ্বতী বললে, ওটা কিছু নয়, অন্ধকারে চুরি করার আগে জীববিশেষকে মাংসখণ্ড দিয়ে ঘুষ খাওয়ানো। দাদা বোকা, এসব কি আর বোঝে!

কিন্তু সমাজশাস্ত্রে এই কথা বলে, পুরুষের অধিকার সর্ব্বাগ্রে শুধু নয়, সর্ব্বোচ্চে। ওঁরা বুড়োমানুষ, আর তোমরা মেয়েমানুষ,—আর আমরা দুজন—পুনরায় হেসে শৈলেন বললে, আমরা যৌবনের প্রতীক, আমাদের দাবি সবচেয়ে বড়।

তির্য্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শাশ্বতী বললে, আমরা বুঝি চিরকাল আপনাদের পায়ের তলায় প'ড়ে প'ড়ে মার খাবো?

শৈলেন বললে, আরে, এটা পায়ের তলায় কোথায় হোলো? তোমরা ত মাথার মণি! জড়োয়া জহরত কি লোকে বাইরে ফেলে রাখে? তাই তোমাদের রেখে দিয়েছি অন্দরমহলে, লোহার সিন্দুকে।

দয়া ক'রে আর রাখবেন না, পায়ে পড়ি ছেড়ে দিন। বরং পায়ের তলাতেই রাখুন, সেখান থেকে পালানো সহজ হবে।—এই ব'লে মুখ টিপে হেসে শাশ্বতী চ'লে গেল।

কল্‌কাতা অথবা ভাগলপুর অপেক্ষা পুরীর প্রাত্যহিক জীবনধারাটি সহজ। বিধিনিষেধ মানবার কোনো দায় নেই, সেই কারণে সদর ও অন্দরের যোগাযোগটি অবারিত। অবিনাশ অনেককাল পরে কেমন একটি নিরুদ্বিগ্নতা অনুভব করলেন। বিশ্রাম তার কোনদিন ছিলনা, কর্ত্তব্যবোধে বরাবরই তিনি ছিলেন সক্রিয়। তাঁর স্ত্রী আলোকলতা বড়লোকের মেয়ে, এবং গরাবানা চালেও কোনোদিন থাকেননি। নিতান্ত বিলাসিতা না হোক, ব্যয়বাহুল্যে তিনি অভ্যস্ত। স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে সংঘর্ষ তাঁর সামান্য কিছু ছিল বৈকি।

আলোকলতা যতই অশান্তি বাধিয়ে তুলুন, অবিনাশ মনে মনে জানেন, শাশ্বতীর বিবাহ তাঁর পক্ষে প্রধান সমস্যা নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয় হোলো, তাঁদের স্বামী-স্ত্রী এবং হিমাংশুর ভবিষ্যৎ। তাঁর পারিবারিক জীবনের সঙ্কট এইখানে। অকালে চাকরিতে ইস্তফা দেবার প্রতিক্রিয়া এমন ভাবেই আলোকলতার মনে ঘটেছে যে, সহজে অবিনাশ বাকবিতণ্ডা থেকে মুক্তি পাবেন

ব'লে মনে হয়না। হিমাংশুর বয়স বাড়লো, কিন্তু মানুষ হোলো না। বাঙ্গলা দেশের বহু বয়স্ক নাবালকের মতো সেও অকর্ম্মণ্য হয়ে রইল।

এমনি একদিন শাশ্বতী অবিনাশকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে বসলো। বললে, বাবা, আমি কিন্তু দেখছি তোমাকে একটু নিরিবিলিতে এনে রাখলেই তোমার শরীর-মন ভালো হয়ে ওঠে।

অবিনাশ বললেন, মনের চেহারা ভালো হয়েছে, এমন প্রমাণ আমি কিন্তু এখনো পাইনি মা।

তাই ব'লে তোমাকে আর দুশ্চিন্তার দিকে যেতে দেবোনা, বাবা। আমি জানি, মা'র কথা মনে করলেই তুমি ভয় পাও। মাও জানে তোমাকে ভয় পাওয়াতে পারাটাই তাঁর কার্য্যোদ্ধারের পন্থা। কিন্তু এমন ক'বে তোমাকে আর আমি চলতে দেবোনা।

অবিনাশ বললেন, তুমি ত জানো মা, তোমাব বিয়ে আর আমার চাকরি—এই হোলো ছোটবউয়ের বিবাদের বড কারণ।

শাশ্বতী বললে, অত্যন্ত ছোট কারণ, বাবা। একথা শুনলেও লোকে হাসবে। আমার বিশ্বাস এ নিয়ে কাকীমা-কাকাবাবুরাও হেসেছেন। তুমি বিশ-বাইশ বছর চাকরি করেছ, নাইবা করলে আর দুচাব বছব! আব আমার বিয়ে? যারা পঞ্চাশ টাকার কেরানী, দারিদ্র্যে পাঁজর ভাঙ্গা যাদের—ছযটা ক'রে মেয়ে যাদের অবিবাহিতা, তাদেরই মুখে অন্ন রোচেনা, হতাশায দুর্ভাবনায় তারাই ডুবে থাকে শুনেছি। কিন্তু বাবা, তোমাদের সমস্যা কি তাই? তোমাদের এই সৌখীন দুঃখবিলাস কেন? কেনই বা এই কষ্টকল্পিত সমস্যা? আমাদেব পারিবারিক সংঘর্ষ কি একটা মেয়ের বিযে নিযে? তা ত' নয। তুমিই ত বলেছিলে বাবা, এই মনোমালিন্যের গোড়াকার কথা হোলো আদর্শ-বিরোধ!

অবিনাশ বললেন, কিন্তু মা, তোমার ভবিষ্যৎ?

সমুদ্রের দিগন্তে সূর্য্যাস্ত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বালুবেলার উপর তরঙ্গদল ভেঙ্গে পড়ছে। সেই দিকে চেয়ে শাশ্বতী বললে, তোমার কাছে বসে চিরকাল শিক্ষা পেয়েছি বাবা, আর আমি আমার কথা ভাবতে পারব না? কিন্তু আমাকে নিয়ে যদি তোমরা একটা উড়ো সমস্যা তৈরী করো, তবে অপমানের মধ্যে আমি ডুবে যাবো। নিজের জীবনের ওপর আমার আর কোনো মায়াই থাকবে না!

ছি মা, ওসব কথা বলতে নেই।

শাশ্বতীর চোখে জল এসে পড়েছিল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অবিনাশ বললেন, কিন্তু তোমার মায়ের প্রকৃতি তুমি ত জানো মা। এখান থেকে ফিরেও যেতে হবে, আর গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতেও হবে—তখন কি জবাব দেবো, বলতে পারো?

এমন সময়ে হিমাংশুর সঙ্গে শৈলেন এসে ওঁদের কাছে হাজির হোলো। শাশ্বতী লক্ষ্য করেনি, ওরা এসে একেবারে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

অবিনাশ মুখ তুলে বললেন, এসো বাবা, কতদূর বেড়িয়ে এলে তোমরা?

শৈলেন বললে, বেড়াবার নতুন জায়গা ত নেই জ্যাঠামশাই, এই জলের ধারেই ছিলুম।

হিমাংশু বললে, পুরীর সমুদ্র ভালো লাগে আধ ঘণ্টা, তার বেশি নয়। সেই একই চেহারা, চোখ ব্যথা করে। জলের মতো একঘেয়ে জিনিষ আর কিছু নেই।

অবিনাশ বললেন, তা সত্যি বলেছ হিমাংশু। শুধু জল কেন বাবা, মানুষ আরো বেশি একঘেয়ে—দেখতে না জানলে।

তাঁর কথার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন সরস আঘাত ছিল, সেটা পলকের মধ্যেই শাশ্বতী আর শৈলেন বুঝে নিল। তারা দুজনেই খুব হেসে উঠলো।

হিমাংশু মুখ ফিরিয়ে শৈলেনের কানে কানে প্রশ্ন করলে, বাবা কি আমার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা করলেন?

শৈলেন চুপি চুপি উত্তর দিল, বোকা, বুঝতে পারলিনে? তোর দার্শনিক দিব্য-দৃষ্টির সুখ্যাতি করলেন।

হিমাংশু সংশয়াচ্ছন্ন আনন্দে বালুর উপর ব'সে ব'সে পা নাচাতে লাগল।

অবিনাশ এক সময়ে বললেন, তোমাদের কোনারকে যাবার প্ল্যানটা কতদূর কি হোল শৈলেন?

শৈলেন বললে, ওটা হাতেই আছে, জ্যাঠামশাই। তবে আমরা আর একটা কথা ইতিমধ্যে ভাবছিলুম।

কি বলো ত?

শৈলেন বললে, পুরীমহারাজার একজন কর্ম্মচারী সপরিবারে যাবেন উড়িষ্যার

জঙ্গলে শিকারে, আমাকেও তাঁরা ছাড়বেন না। কর্ম্মচারীটির ধারণা আমি একজন উঁচুদরের শিকারী।

অবিনাশ হাসিমুখে বললেন, ধারণা ত' মিথ্যে নয়, শৈলেন। তোমার ভালো রাইফেলের হাত ভাগলপুরের সবাই ত জানে।

শৈলেন বললে, কিন্তু হিমাংশু আর শাশ্বতী ধ'রে বসেছে ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে।

বেশ ত—

হিমাংশু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বনজঙ্গল আমার খুব ভালো লাগে, বাবা।

অবিনাশ বললেন, খুব স্বাভাবিক!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শাশ্বতী তাড়াতাড়ি উঠে অন্য দিকে চ'লে গেল। প্রবল হাসির ধমক সে আর কিছুতেই চাপতে পারছিল না। হাসির ফেনা ঘুলিয়ে উঠে তার প্রায় দমবন্ধ হবার যোগাড় হোলো।

সন্দেহাকুল মনে হিমাংশু তার কাছে উঠে এলো। বললে, অত হাসচিস কেন রে, শাশ্বতী?

হিমাংশুর হাতখানা ধ'রে শাশ্বতী কাছে টেনে বসালো। হাসতে হাঁসতে পেটে খিল ধরিয়ে বললে, বনজঙ্গল তোমার খুব ভালো লাগে, দাদা?

আলবৎ।

সেখানে তোমার স্বজাতি কেউ আছে?

মানে?—হিমাংশু হাতখানা ছাড়িয়ে স'রে গেল।

শাশ্বতী এবার একটু সংযতকণ্ঠে বললে, মানে কবিতা-টবিতা লেখে এমন কেউ?

ওঃ এই কথা! তাদের স্বজাতি বলে না, বলে সমগোত্রীয়! বাঙ্গলা ভুল বলিস কেন?

তাই নাকি? আচ্ছা দাদা, স্বজাতি আর সমগোত্রীয়র তফাৎ কি ভাই?

থাম্—বিদ্বানী ফলাসনে। ব্যাকং রসাত্মকং কাব্যম্—বুঝিস?—এই ব'লে হিমাংশু আবার শৈলেনের পাশে গিয়ে বসলো।

শাশ্বতীও উঠে এলো, এসে অবিনাশের পাশে তার নিজের জায়গাটিতে বসলো।

অবিনাশ বললেন, তাহ'লে তোমরা কবে যাবার ঠিক করেছ, বাবা?

শৈলেন বললে, ওঁরা বলছেন কাল সকালের গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধে,—কেবল ত শিকার নয়, আর একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরে আসারও ইচ্ছে।

ফিরতে কি দেরি হবে তোমাদের, শৈলেন ?

না জ্যাঠামশাই, এই ধরুন দিন আষ্টেক।

শাশ্বতী বললে, আমার যাওয়া সম্ভব নয়, বাবা।

বিস্মিত হয়ে অবিনাশ বললেন, কেন মা ?

আটদিন আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, বাবা। আমার গিয়ে কাজ নেই।

আনন্দে অবিনাশের চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। শাশ্বতীর মাথায় হাত রেখে হাসিমুখে অবিনাশ বললেন, বুঝলে শৈলেন, ছেলে আর মেয়ে—দুটিই আমার পাগল। শক্তিটা একই, কিন্তু তার একটা অংশ হোলো কবিতা লেখায় মত্ত, আর একটি অংশ রইলো বুড়ো বাপকে আগলে।

শৈলেন নতমুখে একটু হাসলে।

অবিনাশ বললেন, কোনো ভয় নেই মা, আমি আজকাল বেশ ভালোই আছি। আটটা দিন বৈ ত নয়,—আমার কিছুই অসুবিধে হবে না। বৌ'ঠানরা রইলেন, চাকরবা রইলো,—বেশ ভালোই থাকবো। তুমি বরং সঙ্গে গিয়ে ওই পাগলাটাকে একটু সাবধানে সামলে রেখো। মায়ের আঁচল ছেড়ে এসেছে, তোমার আঁচল দিয়ে ওর গলায় এবার একটা বগলস ক'রে দিয়ো।

শৈলেন, হিমাংশু, শাশ্বতী—একযোগে সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

হিমাংশু বললে, বাবা যে কখন কি বলেন !

তা বটে —অবিনাশ হাসিমুখে বললেন, তবে সবগুলো তোমার কানে ওঠে না। বড় বড় কান কিনা !

শাশ্বতী ও শৈলেন আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠল।

শৈলেনই তারপর এক সময়ে আসর ভেঙে দিয়ে বললে, উঠুন জ্যাঠামশাই, ভারী হাওয়া—এরপর আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

যেতে যেতে শাশ্বতী বললে, দাদার জন্তে সন্ধ্যেটা বেশ কাটানো গেল কিন্তু।

অবিনাশ বললেন, টিকিট করলে খুব বিক্রি হোতো !

আবার এক চোট উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠল। ওরা যখন বাসার ফিরলো, সমুদ্রে তখন জ্যোৎস্না উঠেছে।

দশ

পরিচিত মহলে যে সব সঙ্গীরা দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকে, অপরিচিত দেশে তারা সঙ্গে এলে তাদের সান্নিধ্য একান্ত হয়ে ওঠে। চারিদিকের দুর্গম নিঃসঙ্গতার পটভূমির কেন্দ্রস্থলে শাশ্বতী যেন নূতন ক'রে শৈলেনের দিকে তাকালো।

উড়িষ্যার এই অঞ্চলটি ঘন অরণ্যময়।

পাশেই রতনগড়ের পাহাড়। নীচে শালবনের কোল ঘেঁষে পার্ব্বত্য ঝরণা ক্ষুদ্র নদীতে রূপান্তরিত হয়ে এই শীতের দিনেও সঙ্কীর্ণ বালুপথে বয়ে চলেছে। এদিককার জল-হাওয়া ভালো।

পাহাড়ী উপত্যকার কোলে ছবির মতন গ্রাম। গ্রামের নাম ত্রিতাল। গ্রামের চারিদিক অরণ্যঘেরা। এদিকে কোথাও যে কিছু পাওয়া যায় তার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু শৈলেনের সঙ্গী সৎপন্থী সাহেব আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর স্ত্রী নিশা দেবী বাংলা ভাষা ভালো রকম না জানলেও শাশ্বতীর সহযোগে সুবন্দোবস্তের ত্রুটি রাখেননি। ডাক বাংলার এই নতুন অস্থায়ী সংসারে এসে ঢুকে শাশ্বতী প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হলেও ক্রমে ক্রমে একটি বিচিত্র জীবনের আস্বাদ পেয়ে নিজেকে যেন চারিদিকে প্রসারিত ক'রে দিল।

গ্রামের চতুর্দ্দিক ঘিরে জঙ্গল থাকলেও এখান থেকে মাইল তিনেক গিয়ে না ঢুকলে জানোয়ার পাওয়া সম্ভব নয়। সৎপন্থী সাহেব জংলী সদ্দার এবং গাইডকে ডেকে তারই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। গাইড তাঁকে জানালো, এই শীতের দিনেও গত কাল জঙ্গলে খুব বৃষ্টিবাদল হয়ে গেছে, সুতরাং আগামী কালকের দিনটা অপেক্ষা ক'রে পরশু রাত্রির প্রথমা প্রহরে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে।

খবরটা শুনে হিমাংশু আর শৈলেন দুজনেই একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। শাশ্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, বাঁচলুম। বাস্তবিক, নিরপরাধ জানোয়ার মেরে আপনাদের কী আনন্দ হয়, বলুন ত ?

শৈলেন বললে, কিন্তু তুমিও ত' এখানে গীতাপাঠ করতে আসোনি, শাশ্বতী।

তাহ'লে আপনি কি ভেবে রেখেছেন, আপনাদের সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকে কোমর বেঁধে আমি বাঘ মারবো ?

না, বাঙ্গালী মেয়ের কাছে এতখানি য়্যাডভেঞ্চার আশা করিনি।—শৈলেন বললে, অবশ্য এও আশা করিনি, তুমি এখানে অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রচার করতে আসবে।

শাশ্বতী হেসে বললে, পাগল আর কি ! একালের জগাই মাধাই'রা অত সহজে হরিনাম কানে তোলেনা।—তবু আপনার কাছে আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ !

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললে, কৃতজ্ঞ কেন ?

শাশ্বতী একবার এদিক্ ওদিক্ তাকালো ! সেখানে হিমাংশু অথবা সস্ত্রীক সৎপন্থী কেউ ছিলনা। একটু সাহস ক'রে সে বল্লে, কৃতজ্ঞ বৈ কি। সংসারে সবাই চায় আমি বন্দী হই, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এসে অনেকটা যেন মুক্তির চেহারা দেখতে পাচ্ছি।

হাসিমুখে শৈলেন বললে, তুমিও যেমন হরিনাম শোনাতে চাওনা, আমিও তেমনি তত্ত্বকথা শোনাতে সাহস করিনে। কিন্তু একথা সত্যি, মুক্তি জিনিসটে মনে মনে না থাকলে বাইরে সমস্তটাই বন্ধন। তাছাড়া মেয়েরা মুক্তি ত চায় না, তারা চায় স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রখর দৃষ্টিতে শাশ্বতী তার দিকে তাকিয়ে বললে, একথা আপনি জানলেন কি করে ? আপনি ত' মেয়েমহলে কখনো মেশেননি !

একেবারেই মিশিনি একথা বলা কঠিন। কারণ, এই ত তোমাকেও দেখছি এতদিন ধ'রে। তবে হ্যাঁ, তোমাদের সুকুমারবাবুর মতন অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার নেই।

শাশ্বতী সবিস্ময়ে বললে, কোন্ সুকুমারবাবু ?

শৈলেন বললে, গোবিন্দপদ মুখুজ্যের ছেলে। ওর বিলেত যাবার আগে সাহেবগঞ্জে আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের আলাপ,—এখন সম্ভবতঃ আমাকে চিনতে পারবে না সে। অনেক বছর আগের কথা।

শাশ্বতী বললে, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা আছে কিনা, এ ত আমার জানার দরকার নেই।

এটা তোমার অন্যায়, শাশ্বতী। সুকুমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অস্পষ্ট হলেও বেশ ভালো। কিন্তু তার সম্পর্কে তোমার কিছু জানার দরকার নেই, এটা বলা তোমার পক্ষে খুবই অসঙ্গত।

শাশ্বতী স্তব্ধভাবে তার কথা শুনলে। তারপর বললে, আপনার একথার মানে ?

দূরে গ্রামের পথ বেয়ে সকালবেলায় হিমাংশু বেড়িয়ে এইদিকেই ফিরছিল। সেই দিকে চেয়ে শৈলেন বললে, মানে তুমিও জানো, শাশ্বতী। আসবার সময় জ্যাঠামশাই অবশ্য তোমাকে কিছু বলেননি, কিন্তু তোমার মামাতো ভগ্নী সুলতা দেবীর এক চিঠি নিয়ে জ্যাঠামশাই আমার মায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

তারপর ?

চিঠিতে নাকি এই কথাটাই আছে, তোমার মামা আর মামীমা রেবার সঙ্গে সুকুমারের বিয়ে দিতে রাজী নন, কারণ একই পরিবারে দুইজন ভগ্নীকে দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। রেবাও নাকি তাঁর মা-বাবাব মতামতকে সমর্থন করেন। সুতরাং—

বলুন।

শৈলেন একটু থতিয়ে গেল। তারপব অত্যন্ত সঙ্কোচ এবং অতিশয় আড়ষ্টতার সঙ্গে সে বললে, সুলতা দেবী নাকি চিঠিতে জানিয়েছেন, সুকুমার তোমার সম্বন্ধে খুবই উচ্ছ্বসিত। ঘনিষ্ঠভাবেই তোমাকে সে জেনেছে। সুতরাং সুলতা দিদিব ইচ্ছে—

অশ্রুরুদ্ধ কঠিন কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, ঘনিষ্ঠভাবে ! অদ্ভুত কথা বটে ! জানিনে বিলেত-ফেরত ছেলেরা সবাই এমনি ব্ল্যাকমেলিংয়ের কৌশল শিখে আসে কিনা। কিন্তু সুলতাদির চিঠি নিয়ে বাবা আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন না, আমার কাছে তাঁর গোপনীয় কিছু থাকতে পারে, এর চেয়ে আশ্চর্য্য আমার কাছে আর কিছু নেই।

শৈলেন বললে, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার ক্ষুব্ধ হবার কারণ ত কিছু দেখিনে, শাশ্বতী।

হিমাংশু অনেকটা কাছকাছি এসে পড়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে ব্যাকুল

বিকৃত কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, আপনারা সবাই মিলে আমাকে এ কি অদ্ভুত সমস্যায় ফেলে আমার টুঁটি টিপে ধরলেন বলুন ত? আপনাদের কাছে আমি কী অপরাধ করেছি?—চোখের জল চেপে সে ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই একবার ফিরে দাঁড়িয়ে অশ্রুভগ্ন কণ্ঠে আবার বললে, আপনি নিশ্চয় সবই বিশ্বাস করেছেন?

শৈলেন বললে, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ত কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এই হোলো ঘটনা।

তবে দয়া ক'রে এখুনি ব্যবস্থা ক'রে দিন, দাদার সঙ্গে আমি ফিরে যাবো।—এই ব'লে সে আঁচলে মুখের আর্ত্তস্বর চেপে দ্রুতপদে ভিতরে চ'লে গেল।

বিদেশে এসে পৌছবামাত্র প্রথমেই অপ্রত্যাশিতভাবে এমন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যাবে, শৈলেন একথা কল্পনাও করেনি। সরলভাবেই সে সুকুমারের কথা উত্থাপন করেছিল। শাশ্বতী তার স্নেহের পাত্রী, প্রিয়পাত্রী,—কিন্তু তাই ব'লে সুকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী সে নয়। কিছুকাল আগে সে একটা কানাঘুষা শুনেছিল, শাশ্বতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নাকি মধুর, এমন কি একদিন হয়ত দুজনের বিয়েও হতে পারে। ভিতরের কথা যারা জানতো না, তারা শাশ্বতীকে এই ব'লে ক্ষেপিয়েছিল, ভাগলপুরে থাকতে হরেনবাবুর ছেলের সঙ্গে নাকি তার প্রণয় কাণ্ড অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। শৈলেন কথাটা শুনে হেসেই অস্থির। অবাক্ হয়ে বলেছিল, অদ্ভুত বটে!

অবাক্ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়!

শৈলেন ভবঘুরে না হোক, লক্ষ্মীমন্ত নয়। লেখাপড়া সে করেনি, কিন্তু লেখাপড়া না ক'রেও যে বি-এ পাস করা যায়, একথাটা প্রমাণ করতে তাকে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল। তারপর থেকেই নিজের জীবন সম্বন্ধে সে বেপরোয়া। ছেলেদের নিয়ে দলগড়া, বন্দুক নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘোরা, বজরা নৌকা নিয়ে গঙ্গাসাগর পাড়ি দেওয়া, ট্রেনে উঠে টিকেট-চেকারের সঙ্গে হাতাহাতি করা, এবং কলকাতায় গিয়ে এমেচার থিয়েটার পার্টিতে যোগ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া,—এই সব প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের গুরুভারে সে এতই জড়িয়ে থাকতো যে, কোনো

তরুণীর আয়ত আঁখিপল্লবের সীমানায় স্বপনসায়র খুঁজে বা'র করার অবসর তার ছিলনা। হিন্দুস্থানী কুস্তিগীরের আখড়ায় পালোয়ানী শিখে তার এই ধারণাই হয়েছিল, নারীমাত্রই নরকের দ্বার! এবং পাছে তারা নরকের পথে টেনে দিয়ে যায়, এই আশঙ্কায় তাদেরকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখা উচিত। সেই কারণে বরাবরই শৈলেন কোনো তরুণী কিংবা যুবতী মহিলা দেখলেই কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে কথা বলতো। হিরণ্ময়ী তাঁর ছেলের এই মনের ইতিহাস জানতেন, সেইজন্য অমন অনায়াসে শাশ্বতীর সঙ্গে শৈলেনের এখানে আসাটা মেনে নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য শৈলেন ঠিক আসবার আগেই মায়ের মুখে সুলতার চিঠির কথা শুনে এসেছিল, এবং জেনেছিল সুকুমারের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে সম্ভবতঃ আসন্ন। শৈলেন ট্রেনে আসতে আসতে কেবল এই কথাই ভেবেছিল, জ্যাঠামশায়ের শরীর ভালো নয়, হিমাংশুটা মানুষ নয়—সুতরাং শাশ্বতীর বিয়েতে আটচালা বাঁধা থেকে আরম্ভ ক'রে সুষ্ঠু পরিবেশন পর্য্যন্ত, সমস্ত দায়িত্বই তাকে নিতে হবে। তার ছোটবোনের বিয়েতে বহুত খাদ্যসামগ্রী তছ্‌নছ হয়েছিল, এবারের কাজে তেমন ঘটনা সে কিছুতেই ঘটতে দেবেনা।

কিন্তু আজ তার সেই সরল সহজ চিন্তার পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে এমন হঠাৎ হোঁচট খেলে সে কেমন ক'রে? তবে কি পৃথিবীর ফুলেই কীট বাসা বেঁধে থাকে? তবে কি ওই শিশুগাছের ডালে, কূজনক্লান্ত পাখীর কণ্ঠে, আর ওই ভ্রমরের পাখার গুনগুনানিতে আরো অর্থ আছে?

শৈলেন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল চক্ষে চারদিকে তাকালো। শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ছে তাদের ডাকবাংলায় বাগানে। দক্ষিণ দূরান্তরের প্রান্তরে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের হাওয়ায় শীতের তন্দ্রা জড়ানো। সেইদিকে একাগ্র ও একান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আজ যেন তার ভিতর থেকে নিগূঢ় প্রশ্নের দল বেরিয়ে অশরীরী ছায়ার মতো তার চারদিকে ঘুরতে লাগল।

খাবার টেবিলে ব'সে সৎপন্থী সাহেব ইংরাজী ভাষায় তাঁর অতীত শিকারের অভিজ্ঞতা শৈলেনের কাছে বিশদ ভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন। শৈলেন সেগুলো এক মনে শুনছে অথবা শুনছেনা, বক্তার পক্ষে একথা তলিয়ে জানবার অবকাশ ছিল না। তাঁর পাশে বসেছেন নিশা দেবী আর হিমাংশু। নিশা দেবীর বয়স ত্রিশের কাছে এলেও তাঁর সুশ্রী লাবণ্য অল্পবয়সেরই পরিচয় দেয়। কপালে তাঁর দুই ভ্রূর

মধ্যকেন্দ্রে উল্‌কির ফুটকি থাকলেও তিনি উচ্চশিক্ষিতা উড়িয়া মহিলা। হিমাংশু তাঁর পাশে ব'সে 'দিদি দিদি' ব'লে একেবারে অজ্ঞান। তার ব্যর্থ জীবন নাকি ধন্য হয়ে গেছে এমন একজন উৎকৃষ্ট দিদির সঙ্গলাভে; দিদিকে মডেল ক'রে সে অন্ততঃ দশটি কবিতা লিখবে এই প্রতিজ্ঞা। নিশা দেবী মুখ টিপে হাসছিলেন।

হিমাংশুর বাঁ দিকে বসেছে শাশ্বতী। দাদার অবিশ্রান্ত বাতুলতা সে যে উপভোগ করছে, এর চিহ্ন মাঝে মাঝে ফুটে উঠছিল তার মুখে চোখের কৌতুক হাস্যরেখায়। কিন্তু তার সুযোগ্য দাদার এই অতিশয় উচ্ছ্বাস সৎপন্থী সাহেব কিভাবে গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে হিমাংশু আত্মবিস্মৃত হলেও শাশ্বতী মাঝে মাঝে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। যারা কবিতা লেখে তাদেরই মাত্রাবোধ কম—এই কথা প্রমাণ করার জন্য তার দাদা যেন উঠে প'ড়ে লেগেছিল।

শাশ্বতীর পাশে শৈলেন বসলেও দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান। গল্পগুজবের ফাঁকে এক-আধ বার দুজনের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় ঘটলেও, দেখা গেছে দুজনের দৃষ্টিই কেমন যেন নিরর্থক ও শূন্যময়।

কিন্তু শৈলেনের দিক থেকে কোনো উদ্বেগ ছিলনা। তার দিক থেকে সচেতন অপরাধ কিছু ঘটেনি। সে কেবল শাশ্বতী-সুকুমার সংবাদ জুগিয়েছে এই মাত্র। দুর্মুখ এনেছিল বহন ক'রে সীতা দেবী সম্বন্ধে জনশ্রুতি, কিন্তু তার জন্য দুর্মুখ সীতার হাতে শাস্তি পেয়েছিল, এমন উল্লেখ রামায়ণে নেই। শৈলেন আড়চোখে এক-আধ বার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি তাকালেও নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে সৎপন্থী সাহেবের সত্য-মিথ্যা জড়িত আত্মকাহিনী শুনে যাচ্ছিল।

স্বামীর কি একটা ঘটনার কথা শুনে নিশা দেবী সহসা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কই, এ ঘটনা ত আগে তোমার মুখে শুনিনি! আচ্ছা আপনিই বলুন ত মিষ্টার মুখার্জ্জি, একি সম্ভব?

শৈলেন চকিত হয়ে তাকাল। প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ, কি বললেন?— তাই ত একি সম্ভব!

সৎপন্থী বললেন, কোনটা?

শৈলেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাকাল। বাস্তবিকই এতক্ষণ সে অন্যমনস্ক ছিল। কিন্তু তার নিরুপায় অপ্রতিভ দৃষ্টি দেখে সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। এমন কি, নতমুখী শাশ্বতীর অধরেও যেন বিদ্যুৎরেখা দেখা গেল।

হঠাৎ চামচটা রেখে শৈলেন টেবিল চাপড়ে ব'লে উঠল, না, এ অসম্ভব !

নিশা দেবী হাসিমুখে তার দিকে তাকালেন। শৈলেনের এই আকস্মিক সশব্দ উচ্ছ্বাস যে নিজেরই লজ্জাকে ঢাকার জন্যে, একথা শাশ্বতীর বুঝতে দেরি হোল না। মুখ তুলে সে বললে, আপনি কা'র কথা বলছেন ?

কা'র কথা ? বলছি নিজেরই কথা ! আমি যে সৎপন্থী সাহেবের গল্প এতক্ষণ শুনিনি, এ কি কখনো সম্ভব ?

খাবার টেবিলে হাসির রোল উঠল। এবং হিমাংশু সমস্ত ব্যাপারটা না বুঝেই এমন ক'রে হাসলে যে তার হাসি আর থামতেই চায় না।

দাদার এই অহেতুক সফেন হাস্যে শাশ্বতী লজ্জিত হয়ে বললে, পাগলের গো-বধে আনন্দ !

থাম্ হিমাংশু।—শৈলেন একটা ধমক দিল।

হিমাংশু থাম্‌ল। থেমে বললে, বা রে, তোমরা হাসতে পারো, আর আমি পারিনে ? দেখুন ত দিদি !

বটেই ত—ব'লে নিশা দেবী এই বাঙ্গালীর দলটিকে দেখতে লাগলেন। অর্থ বোধগম্য হোল না।

আহারাদির ব্যাপারটার পর সৎপন্থী সাহেব আর নিশা দেবীর সঙ্গে হিমাংশুও উঠে দাঁড়াল। কবি আর যাই হোক নির্বোধ নয়, ভোজ্যসত্তার সম্বন্ধে তার রসবোধ ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হচ্ছিল কি তোদের, শুনি ? এমন খাওয়া খেতে কারো দেরি হয় ?—থাক ব'সে, আমরা চললুম।

বাস্তবিক, আহারের পালায় দুজনেই পিছিয়ে পড়েছে। শৈলেন আর শাশ্বতী দুজনেই লজ্জিত হয়ে দুজনের দিকে তাকাল। শৈলেন বললে, অথচ ক্ষিধে খুবই ছিল, কিন্তু খেতে পারিনি।

শাশ্বতী বললে, পারবেন কোত্থেকে ? মনে মনে অত ঝগড়া করলে কি খাওয়া যায় ?

ঝগড়া ! কা'র সঙ্গে ?

যাকে ডাকবাংলা থেকে সকালবেলা তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ! যার সঙ্গে একবার ক'রে বচসা না করলে আপনার ঘুম হয় না !

শৈলেন হাসলে। হেসে বললে, কিন্তু তুমিই ত রাগ ক'রে চ'লে যেতে চেয়েছিলে, শাশ্বতী !

শাশ্বতী বললে, অকারণ অপবাদ শুনলে মেয়ে-মানুষের রাগ হয়, লোকবিশেষের মুখে সেই অপবাদের কথা শুনলে মেয়েদের আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকেনা তা জানেন ?

শৈলেন বললে, তোমার অপবাদই বা কি, আর লোকবিশেষই বা কে,—আমি ত কিছুই জানিনে !

আমার দাদা না হয় অমানুষ হ'তে পারে, তাই ব'লে আমি বাবার কাছে এমন শিক্ষা পাইনি, যাতে নিজের জীবন, নিজের আদর্শ, আর নিজের সাধুতার সঙ্গে আমি কপটতা করতে পারি !—শাশ্বতী অভিমানব্যথিত কণ্ঠে বললে, আপনি এত দেশবিদেশ ঘুরেছেন, কিন্তু মানুষকে কি একটুও চিনতে শেখেননি ? বিলেতফেরত ইঞ্জিনীয়ার সুকুমারচন্দ্র না হয় হৃদয়-যন্ত্রণায় উচ্ছ্বসিত, সুলতাদি না হয় সবিস্তারে চিঠিই লিখেছে, বাবা না হয় কাকীমার সঙ্গে আলোচনাই করেছেন, আর কাকীমা না হয় আপনাকে আমার মতন রাক্ষসীর আওতায় সতর্ক হয়েই থাকতে উপদেশ দিয়েছেন,--কিন্তু তবু শেষ বিচারটা ত' আমারই হাতে ! আমি নাকচ ক'রে দিলে এরা সব দাঁড়াবে কোথায় !

শৈলেন বললে, এটা সান্ত্বনার কথা !

না, আমার নিজের কথা। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি এতই অবশ যে, সস্তা সান্ত্বনায় আপনাকে বশ করতে লজ্জা হয়।—শাশ্বতী বললে, আপনার ওপর রাগ করেছিলুম, কিন্তু সে আমার ছেলেমানুষি। রাগের যোগ্য নন্ আপনি। মানুষকে নির্বিচারে কথা ব'লে যান্, অথচ বুঝতে পারেন না, তার মধ্যে অসম্মান মাখানো থাকে। বি-এ পাস করতে বোধ হয় এইজন্যেই আপনাকে বেগ পেতে হয়েছিল !—এই ব'লে সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

শৈলেন হেসে উঠল। বললে, করলে কি শাশ্বতী ?—সবাই মিলে আমাকেই ঠাট্টা করলে, কিন্তু কই, তুমিও ত খেতে পারোনি ?

চাইনে খেতে ছাইভস্ম—ব'লে শাশ্বতী ক্ষুব্ধ হয়ে চ'লে গেল।

সৎপন্থী সাহেবের আরণ্য অভিজ্ঞতার কাহিনী নিঃশব্দে শৈলেনকে হজম

করতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁকেও মানতে হোলো শৈলেনের অভিজ্ঞতা নগণ্য নয়। ডাকবাংলায় বসেই দুদিনের মধ্যে সে এখানকার ভূ-তাত্ত্বিক চেহারা আর পরিমাপটি আয়ত্ত ক'রে নিল। এখান থেকে কোন্ রাস্তায় গেলে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে পাহাড়ের একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানো যাবে, সৎপন্থী সাহেবকে অনায়াসে তা বুঝিয়ে দিল!

বৃষ্টি হবার পরে সৎপন্থী সাহেব কিছু হতোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর গাইডের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তিনি যখন জানলেন, জলেকাদায় জঙ্গলের ভেতরে যানবাহন ঢোকবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন তাঁকে কিছু বিমর্ষই দেখা গেল। সুতরাং প্রথম দিন রাত্রে জঙ্গলের ভিতরভাগে কয়েক শত গজ গিয়ে ঢুকলেও অভিযানটি তেমন উৎসাহজনক হ'তে পাবল না। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। শৈলেনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৎপন্থী সাহেব তাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে আনলেন।

শৈলেন জানিয়ে দিল, কিন্তু এ পদ্ধতিতে শিকার হয়না, মিঃ সৎপন্থী—অন্য প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার। শিকারের সখ এক জিনিস, আর প্রকৃত শিকার অন্য কথা।

বারান্দায় উঠে এসে সৎপন্থী বললেন, কিন্তু মাচা বাঁধলেও যদি দু'চাব দিন অপেক্ষা করতে হয়, মিঃ মুখার্জ্জি?

তা'তে আপত্তি কি বলুন?

আপত্তি কিছু নয়। তবে কি জানেন, জঙ্গলে বেশিদিন থাকা·· মানে আমরা ত অনেকটা ধরুন, বেডাতেই ত বেরিয়েছি!

শৈলেন বললে, আপনি উৎকৃষ্ট শিকারী হযে জঙ্গলে এসে শুধু বন্দুক নিযে ফিরে যেতে চান? আপনার অভিজ্ঞতা আর উদ্দীপনা কি এই বলে?

সৎপন্থী হাসলেন। বললেন, আপনাদের বয়স অবশ্য আমার ছিল। ভেবেছিলুম, আপনি সঙ্গে থাকবেন, বেড়াবাব পথে যদি এক আধটা জানোয়ার পাই, মেরে নিয়ে যাবো।

যাই হোক, এইভাবে সেদিনটা কাট্‌ল।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নের আহার সেরে শৈলেন জনতিনেক সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুক্‌ল,—হিমাংশু অথবা শাশ্বতীর মানা শুনলে না। সন্ধ্যার অল্প

আগে সে যখন ফিরলো, তার সঙ্গে বড় একটা শিংওয়ালা রক্তাক্ত হরিণ। হরিণটি নধর, সুন্দর—অরণ্য যেন সব ঐশ্বর্য্য তা'র সর্ব্বাঙ্গে এঁকে দিয়েছে। শাশ্বতী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

শৈলেন বললে, আমরা মাচা বেঁধে এসেছি, মিঃ সৎপন্থী। এটা শুক্লপক্ষ, সুতরাং অসুবিধে নেই। একটা ভাল্লুক মেরে আনতেই হবে। এবার আপনি আর হিমাংশু—দুজনকেই সঙ্গে যেতে হবে।

হিমাংশু বললে আমি ? অসম্ভব !

কেন তুই যাবিনে শুনি ? পুরুষ মানুষ নস তুই ?

রক্ষে করো ভাই। বরং দুটো কবিতা লিখতে পারি, কিন্তু অন্ধকারে জঙ্গলে ঢুকতে পারিনে।

নিশা দেবী হাসিমুখে বললেন, মন্দ কি, মাচায় চ'ড়ে আপনি কবিতা লিখবেন। নতুন অভিজ্ঞতা !

হিমাংশু তার দিদির সহযোগে হেসে কথাটায় সায় দিল।

শাশ্বতী বললে, তার চেয়ে দাদাকে গাছের আগডালে চড়িয়ে দেবেন, যদি কিছু কাজ হয়।—চলুন মিসেস সৎপন্থী, বীর পুরুষদের সঙ্গে আমরাও যাই জঙ্গলে।

কিন্তু আসল কথাটা জানতে শৈলেনের বিলম্ব হোলো না। সৎপন্থী সাহেব নিজের হাতে কোনোদিন শিকার করেননি। তিনি বন্দুক ধরতেও জানেন, ছুঁড়তেও জানেন, জানেননা কেবল লক্ষ্যভেদ করতে। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাই ও-কাজটা ক'রে দেয়, তিনি থাকেন কাছাকাছি,—কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থার গুণে শিকারের গৌরবটা তাঁর নামের সঙ্গেই যুক্ত হ'য়ে জনসাধারণের কাছে সুখ্যাতি পেয়ে থাকে। এই নিয়মটিই বরাবর চ'লে আসছে। আজ হঠাৎ শৈলেনের কথায় নেচে উঠে তিনি যাবেন জঙ্গলে, এমন হঠকারিতা তাঁর নেই। ভাল্লুক ত দূরের কথা, খরগোস খুঁজতেও তিনি রাজী নন্। এ ঘটনা আগে জানলে শৈলেন কিছুতেই আসত না। শিকার সে অনেক করেছে, এবং রাইফেল সহযোগে তার লক্ষ্যভেদের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে বাঘশিকারে হয়ে গেছে। আজ এসব নতুন নয়।

মরা হরিণটা নিয়ে কয়েকটা লোক তখনই অন্যত্র চ'লে গেল, এবং শৈলেন ক্ষুব্ধ হয়ে ভিতরে এসে বললে, এখন একটু চা না খেলে মেজাজ কিন্তু আরো খারাপ হয়ে যাবে। আর এসব ভালো লাগছেনা।

শাশ্বতী মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার দুইদিকে তালবেতাল—দাদা আর সৎপন্থী। মেজাজ আপনার খারাপ হওয়াই ভালো।

কেন ?

যদি তা'তে সৎপন্থীকে ছেড়ে সৎপথে যাবার ইচ্ছে জাগে।

তুমি কি ফিরে যাবার কথা বলছ ?

না, আমি বলছি ভণ্ড আর ভীরুর ছোঁয়াচ থেকে সরে যাওয়া। আপনি ও-লোকটার তাঁবেদারি করতে এসেছিলেন, এধারণা হবার চেয়ে আমার মরণ ভালো।—এই ব'লে শাশ্বতী চা ক'রতে চ'লে গেল।

সৎপন্থী বোধ করি চেষ্টায় ছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি-মতো কোনো প্রকারে আটটা দিন এই বাঙ্গালীর দলটির সঙ্গে কাটিয়ে তিনি সস্ত্রীক অন্যত্র যাবেন,—সুতরাং এ অঞ্চলের জল-হাওয়া আর স্বাস্থ্য উত্তম, এবং ভারী নিরিবিলি—এই অজুহাতে আরণ্য অভিযানের প্রসঙ্গটা প্রায় তিনি এড়িয়েই চলছিলেন। এদিকে হিমাংশুটা আরণ্য সমাজের অযোগ্য, ওদিকে শাশ্বতী উৎসাহহীন,—এমন অবস্থায় শৈলেনের পক্ষে কোনো কিছু নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে উঠল। পুরীতে সে যে কোনো দিন ফিরে যেতে পারে, কিন্তু শৈলেন মুখুজ্যে উড়িষ্যার জঙ্গলে গিয়ে কেবলমাত্র একটা হরিণ মেরে এসেছে,—এর চেয়ে লজ্জা আর কিছু নেই। কেবলমাত্র শিকার নয়, ভ্রমণটাও তার ব্যর্থ হোলো। আট-দশ দিনব্যাপী একটা দীর্ঘভ্রমণের তালিকা সে তৈরী করতে পারতো, কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূতে পরিণত হয়ে রইল। শৈলেনের সমস্ত আক্রোশ এবং ক্ষোভটা গিয়ে পড়লো সৎপন্থীর ওপর—লোকটা হাম্বাগ !

শাশ্বতী একসময় এসে বিদ্রূপ করে ক'রে ব'লে গেল, ফুটো নৌকা নিয়ে খাল পার হওয়া যায় না, আপনি গেছেন সাগর পাড়ি দিতে! ছেলেমানুষ আপনি আগাগোড়া।

শৈলেন হাসিমুখে বললে, হাতি পাঁকে পড়লে বুঝি সবাই তাকে বিদ্রূপই করে ?

হ্যাঁ,—শাশ্বতী বললে, হাতির যখন অত ছোট ছোট চোখ, তখন তার সাবধানে পা ফেলা উচিত। ভুল করেছেন আপনি আগাগোড়া।

ভুল তুমি শুধরে দাওনি কেন ?

আমি শোধরাবো ?—শাশ্বতী তার মুখের দিকে তাকালো। পেট্রোমাক্সের

তীব্র উজ্জ্বল আলোয় তার কানে মুক্তোর দুটো ফুল দপ-দপ ক'রে উঠল। শৈলেন মুখ ফিরিয়ে নিল।

শাশ্বতী আর একটু কাছে স'রে এলো। বললে, ভুল আপনার শোধরাতে পারতুম বটে, কিন্তু আপনার বিশ্বাসের ওপর হাত দিতে যাবো কেন? বিশ্বাসের কাছে যুক্তিতর্ক কিছুই টেঁকে না।

শৈলেন হঠাৎ হেসে বললে, তুমি কি বলতে চাও, সুকুমারের বেলাতেও আমি এই ভুল করেছি?

রুষ্ট কটাক্ষপাত ক'রে শাশ্বতী বললে, ভুল না করলেই খুশী হতুম।—এই ব'লে সে চ'লে গেল।

হিমাংশু বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুন গুন ক'রে রবিঠাকুরের গানের একটি কলি ধরেছিল। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল, ওঘরে নিশা দেবীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে এদিকে আকর্ষণ করা। কিন্তু সৎপন্থী সাহেব হাত বাড়িয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিতেই সে লজ্জিত হয়ে এঘরে এসে ঢুকল। বললে, কি যেন ভুল করেছিস তোরা রে?

শৈলেন তার দিকে চেয়ে বললে, তোকে বোকা মনে করে।

আমি বোকা বটে। কিন্তু তোকে যে সবাই মিলে বোকা বানালে।

ঝড়ের মতো শাশ্বতী এসে ঢুকল। বললে, সবাইটা কে শুনি, দাদা?

হিমাংশু গলা নামিয়ে বললে, একাই একশো।

তাই বলো। কিন্তু তুমিও বোকা নও, দাদা। তোমার সঙ্গীতচর্চাতেই তার প্রমাণ।

মানে?

শাশ্বতী হেসে উঠল। বললে, মানে, ওর মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক আবেদন ছিল। যে কেউ মুগ্ধ হ'তে পারতো!

যাঃ, কী যে বলিস! পরিতৃপ্ত হাসি হেসে হিমাংশু তার আরক্ত লজ্জাকে গোপন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সহোদরার সবল বিদ্রূপ সে বুঝতেই পারলে না।

তার চ'লে যাওয়ার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শাশ্বতী মৃদুকণ্ঠে বললে,

দেখছিলুম আড়াল থেকে। বিয়ে দিন দিন বাড়ছে দাদার। মা আর বাবার যেমন পোড়াকপাল!

শৈলেন কিছুই বুঝতে পারেনি। উদ্বিগ্ন কৌতূহলের সঙ্গে সে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি শাশ্বতী?

ছাই, মাথা আর মুণ্ডু!—ব'লে শাশ্বতী যেমন এসে ঢুকেছিল, তেমনি আবার বেরিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন, এমন সময়ে কয়েকজন গ্রামের লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

সৎপন্থীর সঙ্গে ওরা সরকারী কাজে দেখা করতে এসেছে মনে ক'রে শৈলেন প্রথমটা চুপ ক'রে ছিল, কিন্তু গোলমালটা পাকিয়ে উঠতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘটনাটা অবশ্য সামান্য, এসব অঞ্চলে সচরাচর যা ঘটে থাকে তাই। প্রায় তিন চার মাস ধ'রে এদিকটায় একটা প্রকাণ্ড বাঘের উপদ্রব হয়েছে। আগে গরু, মহিষ ভেড়া ছাগল—এই সব নিয়ে যেতো। কিন্তু মাসখানেক আগে একজন জংলীকে জখম ক'রে আর একজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। সম্প্রতি এক চাষীর ঘরে ঢুকে তার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। এবং গতকাল রাত্রে ওদিকের জঙ্গলে একটা চেঁচামেচি শুনে লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে ঢোকে, খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পায় সদ্যচর্ব্বিত এক নারী দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে সেই মানুষখোর বাঘ কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। পরম্পরায় জানা গেছে, এখান থেকে প্রায় একশো মাইল চক্রের মধ্যে উক্ত নরলোভী শার্দ্দূল প্রবরের উৎপাতের আর অন্ত নেই।

শৈলেন উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললে, তাহলে প্রস্তুত হোন, সৎপন্থী সাহেব।

প্রস্তুত?—সৎপন্থী হেসে বললেন, আমি ত সব সময়েই তৈরী। কোন্ পথ দিয়ে আমরা ঢুকবো বল ত হে?

একজন বললে, প্রভুজী, পশ্চিমের পথ দিয়ে না গেলে বেটাকে পাওয়া যাবে না। 'শড়া চতুরা অচ্ছি!'

হুঁ।—ব'লে সৎপন্থী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর টেবিলের ওপর আঙ্গুল টেনে কি যেন আঁক কাটতে লাগলেন।

ভাবছেন কি, মিঃ সৎপন্থী ?— শৈলেন অধীর ও উৎসুক প্রশ্ন করলে।

সৎপন্থী মুখ তুলে বললেন, ওটা ম্যান-ঈটার কিন্তু মনে রাখবেন, মিঃ মুখার্জ্জি।

আমি ছ'টা ম্যান্-ঈটার মেরেছি, মিঃ সৎপন্থী।

উত্তম !—ওরে মাধব, পশ্চিম পথ দিয়ে গেলে আমাদের মাচা দুটো কি শীগ গির পাবো রে ?

না প্রভু, মাচা অনেক দূরে।

তাহ'লে ত মুশকিল, মিঃ মুখার্জ্জি। বাঘ খুঁজবেন কোথায় এত রাতে ?

শৈলেন বললে, মড়াটার কাছাকাছি থাকবো গাছে উঠে, ওকে আবার আসতেই হবে সেখানে।

উত্তম। – কিন্তু তেমন বড় গাছ কি কাছে পাওয়া যাবে ?—মাধব, গাছ আছে নাকি ওখানে রে ?

না প্রভু।

তবেই ত। মাচা না বেঁধে উপায় কি ? বেশ বড় মাচাই চাই— সাবধান থাকা দরকার।

কিন্তু মাচা ত দরকার নেই মি সৎপন্থী। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বাঘকে চ্যালেঞ্জ ক'রে মারব। সেই আমার অভ্যাস।

ওঃ ফাইন।—ব'লে সৎপন্থী এগিয়ে এসে শৈলেনের হাতখানা টেনে করমর্দ্দন করলেন। তাঁর হাতের তালু ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে, শৈলেন অনুভব করলো।

ছলাকলায় এইটি জানা গেল, অন্ধকার রাত্রে তিনি মানুষমারা বাঘের জঙ্গলে ঢুকতে কিছুতেই রাজী নন। বিশেষ ক'রে কাছাকাছি যখন মাচা বাঁধা নেই, তখন সেখানে অগ্রসর হওয়া মানে স্ত্রীর অদূরবর্ত্তী বৈধব্যকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা। এইটি তিনি স্থির করতে চাইলেন, কাল দিনের বেলায় লোকজন পাঠিয়ে সেখানে মাচা বাঁধা হবে, এবং অতঃপর এখান থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধার পর প্রভু জগন্নাথের নাম স্মরণ ক'রে শার্দ্দুলরাজের উদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়া। সেটাই সমীচীন, যুক্তিসঙ্গত। খামকা লোকজনের কথায় এখনই রক্তগরম ক'রে রাতে ভিতে বাঘ শিকার করতে যাওয়া প্রায় বাতুলতার কাছাকাছি।

শৈলেন বললে, তাহ'লে আমাকে এখনই যেতে হয়, মিঃ সৎপন্থী। ম্যান-ঈটার ব'লেই আমি আর দেরি করতে পারিনে।

সৎপন্থী সাহেব তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, আমার স্ত্রীর সকাল থেকে একটু বমি-বমি ভাব হয়েছে, শরীরটা তাঁর ভালো নয়,—মানে, বুঝলেন না? নৈলে আমিও অবশ্যই যেতে পারতাম আপনার সঙ্গে।

শৈলেন ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

হিমাংশু আজ নিজেই এগিয়ে এসে শৈলেনের উদ্দীপনায় যোগ দিল। সৎপন্থীর ছদ্মবীরত্ব আর কলাকুশল মনোবৃত্তি আজ তার কাছেও উদ্‌ঘাটিত। সেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। শৈলেনের সঙ্গী নেই, সহকারী কে হবে তারও কোনো ঠিক নেই—আজ হঠাৎ হিমাংশু প্রস্তাব করলে, সেও সঙ্গে যাবে, বন্ধুকে সে দুর্গমে একা ছেড়ে দেবেনা।

শৈলেন তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। বললে, পাগল হয়েছিস তুই? বন্দুকধরা অভ্যাস না থাকলে কারো যাওয়া সম্ভব নয়, ভাই। তুই গেলে তোকে সামলাতে গিয়ে আমি আরও হয়ত বিপদে পড়ব।—কই, শাশ্বতী কোথায়?

সে তোর ওপর রাগ ক'রে মিসেস সৎপন্থীর কাছে গিয়ে ব'সে আছে।

রাগ করলে কেন?

বুঝতেই পাচ্ছিস্। একা এই অন্ধকারে তোর যাওয়া—

শৈলেন কালো হাফপ্যাণ্ট আর কালো হাণ্টিং কোট গায়ে চড়িয়ে নিল। রাইফেলটা পরীক্ষা করলে উত্তমরূপে। পাঁচটা গুলী বন্দুকে ভ'রে নিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখলে। তারপর হেসে বললে, আশা করি কাল ফিরে এলে রাগ পড়বে। কিন্তু সাবধানে থাকিস্ তোরা, ঘরের জানলা যেমন খুলে রাখিসনে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, আর নয়, রাত এগারটা বাজে। গাইড আমার সঙ্গে থাকবে,—ভয় নেই, শাশ্বতীকে বলিস। আচ্ছা, গুড্‌নাইট্।

বাইরে এসে বারান্দা পার হয়ে শৈলেন নেমে ডাকলে, মাধব, খাওয়া হয়েছে রে?

দূর থেকে সাড়া এল, যাই প্রভু, এই আর একটু—

শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেছে। আশেপাশের ঘন অরণ্যে রাত্রি যেমনই শীতার্ত্ত, তেমনি প্রাণচেতনাচিহ্নহীন। অজ্ঞাত বৃক্ষকোটরের ভেতর থেকে কীটের করকরানি ছাড়া আর কোথাও কিছু শোনা যায়না। উপরে অরণ্যের আড়াল পেরিয়ে নক্ষত্র-

খচিত আকাশের একটা সামান্ত অংশমাত্র দেখা যায়। শীতের বাতাস এতই তীব্র যে, সৎপত্নী অবধি বেরিয়ে এসে তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে রাজী হননি। অদূরে গ্রামের একটি চালাঘরে টিম টিম ক'রে আলো জ্বলছে। কথা আছে, ওই-খানে মাধব গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। সে নাকি ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন লোককে জঙ্গলে প্রহরা দিতে পাঠিয়েছে।

বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে শৈলেন ডাকবাংলার বাগান পেরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময়ে সন্দেহ হোলো, বড় একটা গাছের আড়ালে অন্ধকারে কি যেন একটা নড়ে উঠল। অরণ্যের সীমানায় ঘাসের ডগাটি অবধি বিশ্বাসযোগ্য নয়, শৈলেনের এই শিক্ষাই হয়েছিল। বিদ্যুৎগতিতে সে রাইফেল বাগিয়ে লক্ষ্যস্থির করলে।

মারুন, বুক পেতে দিচ্ছি—সহসা শাশ্বতীর চাপা কণ্ঠস্বরে শৈলেন চমকে উঠে রাইফেল সরালো।

শাশ্বতী কাছে সরে এসে বললে, নিন্ বাহাদুরি, মারুন।

ছিঃ শাশ্বতী! এক সেকেণ্ড হ'লেই ঘোড়া টিপতুম, তা জানো?—শৈলেনের সত্যিই হাত কাঁপছিল।—এখানে, এত অন্ধকারে কেন তুমি?

আপনাকে যেতে দেবো না আমি।

স্তম্ভিত হয়ে শৈলেন বললে, তার মানে?

অধীর কম্পনে অস্থির হয়ে উঠেছিল শাশ্বতার সর্ব্বাঙ্গ, জড়িত কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, যেতে দেবোনা, মানুষমারা বাঘের কাছে যেতে দেবো না।

উত্তেজিত হয়ে শৈলেন বললে, পথ ছাড়ো, শাশ্বতী।

না, যেতে হ'লে আমাকে মাড়িয়ে যান্, আগে আমাকে মেরে যান্।—এই ব'লে শাশ্বতী সেখানে বসে পড়ল এবং শৈলেনের ত' পা জড়িয়ে ধ'রে বললে, এমন ক'রে তোমাকে আমি বিপদে যেতে দেবো না। একটা কিছু ঘটলে পুরী গিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

শৈলেন বললে, কিন্তু ম্যান-ঈটার কি সাংঘাতিক জানো তুমি? কত মানুষ মারছে বলো ত? শিকারী হয়ে মানুষ-মারা বাঘকে মারব না, এ যে একটা মস্ত সামাজিক অপরাধ, শাশ্বতী!

শৈলেন ব্যাকুলভাবে তার শেষ আবেদন জানালে।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, তা হোক; হোক সামাজিক অপরাধ, মারুক সে যতখুশি মানুষ, তাই ব'লে আমি আমার সর্ব্বনাশ ঘটতে দেবো না। তুমি ফিরে চলো।

স্তব্ধ নিরুপায় হয়ে শৈলেন একবার অন্ধকারে চারদিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। এমন অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা তার জীবনে এই প্রথম। এমন আশ্চর্য্য আবেশের চেতনাও সে কখনো অনুভব করেনি। কিন্তু মাধব এই পথে এখনই আসতে পারে, এই মনে ক'রে শৈলেন তাড়াতাড়ি রাইফেলটা বন্ধ ক'রে গাছের গায়ে ঠেকো দিয়ে রাখলে, তারপর হেঁট হযে শাশ্বতীর হাত ধ'রে তুলে বললে, এ তুমি কি করলে, শাশ্বতী?

অন্ধকারে শাশ্বতীর অশ্রুসিক্ত মুখ দেখা গেল না।

শাশ্বতী বললে, বলো তুমি যাবে না? স্বীকার করো, আগাগোড়া তুমি আমার ওপর অবিচার করছে?

শৈলেন বললে, হ্যাঁ, এখন তাই মনে হচ্ছে।

শাশ্বতীর এলোখোঁপায় আজ বিকালেপরা একটি অশোকের থোলো ছিল, সেটি খোঁপা থেকে খুলে সে শৈলেনের বুকপকেটে গুঁজে দিয়ে তার বুকে মাথা রেখে মৃদুকণ্ঠে বললে, অশোকের ছোঁয়ায় দস্যু রত্নাকর কি কবি বাল্মীকি হয়ে উঠবেনা?

সাদরে তার মাথার এলোচুলে হাত বুলিয়ে শৈলেন বললে, হবে কিনা, তার উত্তর দেবো সমুদ্রের ধারে গিয়ে। আপাততঃ এই নাও রাইফেল, এখন থেকে তোমার হুকুমে ওর ব্যবহার হবে। এসো, ফিরে যাই।

রাইফেলটা শাশ্বতী এক হাতে কোলে ক'রে নিল, তারপর অন্য হাতে নিজের সুন্দর শ্রান্ত দেহের ভার শৈলেনের কাঁধে তুলে দিয়ে তারা দুজনে ডাকবাংলায় এসে উঠল।

বারান্দায় উঠে রাইফেলটা দ্রুত শৈলেনের হাতে দিয়ে শাশ্বতী চুপি চুপি হাসিমুখে বললে, আমি গিয়ে ঘুমিযে থাকবো, তুমি দাদাকে ডেকে ঘরে ঢুকো।—এই ব'লে সাদরে তার পিঠের উপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিঃশব্দে শাশ্বতী নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

হিমাংশুর চোখে তন্দ্রা এসেছিল, সহসা দরজা ঠেলার শব্দে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল। বললে, কে?

আমি রে, দরজা খোল্।

দরজা খুলে হিমাংশু বললে, একি, ফিরে এলি যে ?

বন্দুকটা ধর্--বলছি।—ব'লে শৈলেন ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসল। হিমাংশু রাইফেলটা নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল।

শৈলেন বললে, কেমন ক'রে জানিনে, হঠাৎ পাঁজরে একটা ফিক-ব্যথা ধরল—ডান হাতটা অবশ মনে হচ্ছে।

ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে হিমাংশু বললে, সে কি, এখানে ডাক্তার ত কোথাও নেই। খুব কষ্ট হচ্ছে ?

সবে মাত্র ব্যথা আরম্ভ, হয়ত পরে অনেক কষ্ট দেবে।

হিমাংশু গলা বাড়িয়ে মাঝের দরজা দিয়ে শাশ্বতীকে ডাকলে। তারপর বললে, তাই ত, ওরকম ব্যথা ত ভালো নয়। যে গোঁয়ার তুই !—ওকি, বুকপকেটে ফুলের গোছা পেলি কোথায় রে ?

কষ্টে মুখ বিকৃত করেও শৈলেন হাসলে। ফুলের গোছাটা গোপন করা তার আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মনোহর মিথ্যাভাষণের কৌতুকে তখন তার মন ভরে উঠেছে। বললে, অন্ধকারে হঠাৎ বনদেবীর কাছে উপহার পেলুম।

হিমাংশু বললে, কবিত্ব রাখ্, পেলি কোথায় বল্।

এমন সময়ে ঘুম চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি মেখে শাশ্বতী উঠে এসে দাঁড়াল। -বললে, দিব্যি ঘুম আসছিল, ডাকলে কেন শুনি ?—ওকি, আপনি ফিরে এলেন যে ?

হিমাংশু বললে, ফিরে এলো পাঁজরের ব্যথা নিয়ে। ওকে, এক পেয়ালা চা ক'রে দে, শাশ্বতী।—আর ওই ছাখ্, ওর বুকে এক গোছা অশোক ফুল।

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে শাশ্বতী বললে, তাইত ব্যাপারটা ত ভারী ঘোরালো মনে হচ্ছে ! বুকে ব্যথা, বুকপকেটে ফুলের গোছা,—আপনি তবে রাইফেল নিয়ে কোন্ শিকারে গিয়েছিলেন ?

বলবো সময়মতো। আপাততঃ চা খেয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি। তোমরা যে ফুলের সঙ্গে ব্যথার যোগ ক'রে দেবে তা আমি কল্পনাও করিনি। এই ব'লে শৈলেন মুখখানা ফিরিয়ে রইল।

হিমাংশুর কবিত্ব সহসা স্ফুরিত হয়ে উঠল। বললে, কুঁড়ির ব্যথাতেই ত ফুল ফোটে রে !

শাশ্বতীর মুখখানা দেখা গেল না। বললে, জানিনে আপনাদের কাণ্ড,—বড় বড সব শিকারী বীরপুরুষকে বোঝাও যায় না।—এই ব'লে সে চা করতে চ'লে গেল।

দুই চতুরের খেলার মাঝখানে সে-রাত্রে হিমাংশু বোকা বনেই রয়ে গেল। শাশ্বতী তিন পেয়ালাই চা আনলে, এবং চা খাওয়ার পর যখন জানা গেল, শৈলেনের ফিকব্যথা অনেকটাই কমে গেছে, তখন শাশ্বতী অহেতুক আনন্দে বসে থেকে দীর্ঘরাত্রি ধরে গল্প-গুজবে মেতে রইল। হিমাংশু আজ অবারিত প্রশ্রয় পেয়ে তার গোটাকয়েক কবিতাই ওদের শুনিয়ে দিলে।

শীতের সকালে যে অনেক বেলা বেড়ে গিয়েছে, ওকথা ওরা বুঝতে পারে নি। এক সময়ে সৎপন্থীর হাতে দরজা ঠেলাঠেলির শব্দে ওদের ঘুম ভাঙলো। বেলা তখন সাড়ে আটটা। অনেক রাত জাগার পরে ঘুম, ওদের আর হুঁস ছিল না।

শাশ্বতী দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সৎপন্থী সাহেব তার হাতে একখানা টেলিগ্রামের লেফাফা দিয়ে বললেন, এটা অবশ্য কাল এসেছে—কিন্তু সন্ধ্যার পরে গ্রামের ডাকঘর থেকে ডেলিভারি দিতে পারে নি। টেলিগ্রাম মিঃ মুখার্জ্জির নামে। তিনি কি শিকার থেকে ফিরেছেন?

শাশ্বতী বললে, মুখার্জ্জি যেতে পারেন নি শিকারে। একটা কলিক পেন ধরেছিল, তাই ফিরে এসেছিলেন। এখন ভালো আছেন।

ও, আই সী! আচ্ছা, এটা দেবেন তাঁকে।

ঘরে এসে শাশ্বতী শৈলেনের অনুমতি নিয়ে টেলিগ্রামটা খুলে ফেললে। তার করেছেন পুরী থেকে অবিনাশ। জানিয়েছেন, আলোকলতা ভাগলপুর থেকে সোজা পুরীতে এসে হাজির হয়েছেন; তুমি অবিলম্বে হিমাংশু আর শাশ্বতীকে পাঠিয়ে দাও।

খবরটা শুনে হিমাংশু লাফিয়ে উঠল। বললে, শেষ পর্য্যন্ত মা এসেছেন পুরীতে! সপ্লেন্‌ডিড্‌! চল্‌ শৈলেন, আমরা আজই রওনা হই।

বেশ ত—শৈলেন বললে।

আলোকলতার আবির্ভাব শুনে অজ্ঞাত আশঙ্কায় শাশ্বতীর মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। অরণ্যের এই অপূর্ব্ব নিঃসঙ্গবাসের ফলে তার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। যেন তার অতীত জীবন সমস্তটাই বাহিরের ওই পটভূমির মায়ামন্ত্রে মুছে

গেছে। হঠাৎ এই সংবাদের ধাক্কায় নাড়া খেয়ে শূন্যলোক থেকে সে যেন আবার প্রত্যহের বাস্তব সংঘর্ষের মাঝখানে আছাড় খেয়ে পড়ল।

হিমাংশু মুখ ধুয়ে চা খেয়ে মহাসমারোহে তার দিদির কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেল।

শাশ্বতী কাছে এসে বললে, কিন্তু মাকে আমার বড় ভয় করে তা জানো? না জানি এতক্ষণ বাবার কী গঞ্জনাই হচ্ছে!

শৈলেন নতমুখে বসে কতক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, কিন্তু বেলা বারোটায় গাড়ী, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, শাশ্বতী।

পুরীর পথে ট্রেনে আসতে আসতে হিমাংশুর কেমন যেন একটু সন্দেহ হোলো। নিশা দেবীকে ছেড়ে এসে তার মনটা কিছু বিমর্ষ ছিল, এবং এই প্রকার চুক্তি করে এসেছিল, সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে দুখানা পত্র বিনিময় হবে, এবং হিমাংশু পাঠাবে একটি ক'রে গীতিকবিতা। আকুল প্রার্থনা সে জানিয়ে এসেছে, দিদি যেন তাকে একেবারে ভুলে না যায়।

গাড়ীর এক কোণে বসে হিমাংশু সেই কথাই ভাবছিল, হঠাৎ শাশ্বতী আর শৈলেনের টুকরো দু'একটি আলাপ তার কানে গেল। চার পাঁচ বছরের মধ্যে এমন কথা সে কল্পনা করেনি, শৈলেনের সঙ্গে তার সহোদরার সাধারণ স্নেহ-সম্পর্ক ভিন্ন আর কোনো বুঝাপড়া ঘটতে পারে! তার সন্দিগ্ধ দুই কান সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

শৈলেন তার প্রিয় বন্ধু,—বন্ধুত্বের বন্ধন দুর্ব্বল নয়। ভাগলপুরের বন্ধুসমাজে হিমাংশু যথেষ্ট সমাদৃত ছিল না—কোকিলের ছানা যেমন কাকদলের কাছে ঠোকর খেতে থাকে—তেমন লাঞ্ছনাও তার কপালে জুটত। শৈলেন এসে দাঁড়াত তার পাশে। দীর্ঘকাল মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা, সেই ঘনিষ্ঠতা এমন এক আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল যে, তাকে অতিক্রম ক'রে উদ্বাহ সম্পর্কের কল্পনাও তার মনে ওঠেনি। কিন্তু আজ চলন্ত গাড়ীর মধ্যে বসে শাশ্বতীর আচরণে এমন একটি অভিনবত্ব পাওয়া গেল যে, নূতন আবিষ্কারের বিস্ময়ে হিমাংশু কিছুক্ষণ কেমন যেন অভিভূত হয়ে রইল। শাশ্বতীর চোখে মুখে যেন জ্যোতির্ম্ময়

প্রসন্নতা, সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটি নতিস্বীকারের ভাব, আলাপে-আচরণে একটি গভীর ভাবস্থিতির সঙ্কেত জানায়—সে যেন অনেকখানি দূরে সরে গেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আজ হিমাংশু যেন একটু লজ্জাই বোধ করলে। সে বড় ভাই, কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গে বিবাদ করে এসেছে চিরকাল। মায়ের কথা শুনে কতদিন সে সহোদরাকে যথেচ্ছ ভাষায় গালি দিয়েছে, খুনসুড়ি করেছে, এবং সমস্ত ব্যাপারে বিরূপতাই করে এসেছে। আজ হঠাৎ ভগ্নীর সম্পর্কে তার কেবল সম্ভ্রমবোধ নয়, একটু সমীহও যেন হোলো। শৈলেনকে যদি সে মনে মনে নির্ব্বাচন করে থাকে তবে ভুল করেছে বলে মনে হয় না। যদি দুজনার মধ্যে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় কোনো গীতি-কবিতার জন্ম হয়ে থাকে, তবে অযোগ্য হয়নি। শাশ্বতী আর শৈলেন যেন আজ তার চোখে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাদের এই অপরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে হিমাংশু বিস্ময়-আনন্দে স্তব্ধ হয়ে জানলার বাইরে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইল।

টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার এবং ফ্লাস্কে করে চা এনেছিল শাশ্বতী। এক সময় প্লেটে করে খাবার এবং পেয়ালায় চা ঢেলে সে তার দাদাকে ডাকল। হিমাংশু চকিত হয়ে মুখ ফেরালে। কিন্তু তুষ্ট শাশ্বতী নিশা দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে তার দাদাকে তামাসা করে বললে, "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী, তাহারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

হাসিমুখে খুশী হয়ে হিমাংশু তার দিকে তাকালে। তারপর বললে, দূর পাগলী! আয়, আজ একই প্লেটে আমরা তিনজনে খাবো। এই বলে সে শাশ্বতীর একখানি হাত ধরে সামনে বসালে। পুনরায় বললে, আয় রে শৈলেন

পুরী ষ্টেশনে গাড়ী এসে যখন থামল তখন প্রায় সন্ধ্যা। লটবহর অল্পস্বল্প। ষ্টেশনের বাইরে এসে মোটর পাওয়া গেল।

শঙ্কা এবং অস্বস্তিতে শাশ্বতীর চোখে মুখে উদ্বেগ ছিল। মাত্র কয়েকটি দিনের ব্যবধান, কিন্তু এরই মধ্যে তার যে ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে যে ঐশ্বর্য্যের ছায়া নেমেছে—মায়ের কাছে এই দৃশ্য সে লুকোবে কেমন করে? কেমন করে সে পালাবে সকলের চোখ এড়িয়ে?

কিন্তু তিনজকে নিয়ে মোটর এসে দাঁড়াল তাদের বাসার দরজায়। সমুদ্রের ধারের বাড়ীগুলিতে তখন আলোকের মালা জ্বলে উঠেছে।

গাড়ী থেকে নেমে দ্রুতপদে হিমাংশু ভিতরে চ'লে গেল। পিছনে পিছনে

গেল শাশ্বতী। চাকর এসে নামিয়ে নিয়ে গেল জিনিসপত্র। শৈলেন ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

মুখুজ্যে মশাই অঞ্জু আর হিরণ্ময়ীকে নিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে গেছেন। আলোকলতাও গেছেন তাঁদের সঙ্গে আরতি দেখতে। অবিনাশ একা বসেছিলেন তাঁর ঘরে। শাশ্বতী যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে অবিনাশের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, বাবা, আপনার শরীর ভালো আছে ত ?

আছে মা—এসো। গাড়ীতে কষ্ট হয়নি ত ? বেশ ভালো ছিলে ?

হ্যা বাবা—

অবিনাশ বললেন, তোমরা গিয়েছ আজ পাঁচ দিন। মনে হচ্ছিল যেন অনেককাল। কাল হঠাৎ তোমার মা এসে হাজির। হিমাংশু চিঠি দেয়নি, এখানকার খবরও স্পষ্ট তিনি জানেন নি—তাই প্রবল উত্তেজনা নিয়ে তিনি পুরী আক্রমণ করেছেন।

শাশ্বতী বললে, বুঝতে পাচ্ছি বাবা, আপনার সঙ্গে বকাবকি হয়েছে—

তা একটু—যাই হোক, শোনো।—অবিনাশ বলতে লাগলেন, তোমার শিকারে যাওয়া তিনি একেবারে পছন্দ করেন নি। কেন করেন নি, এ যুক্তি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা মিথ্যে। তবে—

তবে কি, বাবা ?

ছোট বৌ তোমার বিয়ের যোগাড় করে এসেছেন আমাদের সকলকে এখান থেকে নিয়ে যেতে।

শাশ্বতী অবিনাশের মুখের দিকে তাকালে।

অবিনাশ বললেন, ঘটনার গতি বিচিত্র বৈ কি ! তুমি নিশ্চয় রাগ করবে মা, সুলতা আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল সুকুমার সম্পর্কে—কিন্তু সে চিঠি তোমার যাবার মুখে তোমাকে দেখিয়ে তোমার ভাবান্তর ঘটাতে চাইনি। কিন্তু সুলতাকে নিয়ে সুকুমার গিয়েছিল ভাগলপুরে তোমার মায়ের কাছে। চারশো টাকা মাইনের একটা কাজ পেয়েছে সুকুমার,—পাত্র হিসেবে সে অদ্বিতীয়, এই তোমার মায়ের ধারণা। কেবল তাই নয়, গোবিন্দপদবাবু নাকি এমন এক ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আমাকে চাকরি ছাড়তে না হয়। ঘটনার অদ্ভুত চক্রান্ত বৈ কি ! তোমার মা সুকুমারের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির ক'রে তবে আমাদের নিতে এসেছেন।

শাশ্বতী স্তব্ধ পাষাণবৎ হয়ে রইল।

এমন সময়ে হিমাংশু এসে ঘরে ঢুকল। সম্ভবতঃ আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ভিতরের কথাবার্ত্তা শুনছিল। বললে, কিন্তু এ ত' হ'তে পারেনা, বাবা।

অবিনাশ মুখ তুলে তাকালেন। স্মিত মুখে বললেন, তুই আবার কি বলিস?

হিমাংশু বললে, এ বিয়ে হ'তে পারেনা, বাবা।

কেন?

শাশ্বতীর মনের চেহারা আমার চেয়ে মা বেশী জানেনা। সুকুমারের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে অসম্ভব। আমি যে অন্য ব্যবস্থা করেছি, বাবা।

অবিনাশ বললেন, সে কি? তোর ত টিকে ধরাতেও জানিন লাগে। তোর আবার কি ব্যবস্থা!

হিমাংশু বললে, আমাকে আপনারা যতই তামাসা করুন, কিন্তু শৈলেনের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, বাবা।

শৈলেনের সঙ্গে!—অবিনাশ সবিস্ময়ে শাশ্বতীর নতমুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, শৈলেনের সঙ্গে ওর বিয়ে। কেবল আমি স্থির ক'রিনি, ওদের ভিতরের কথা যতদূর জানতে পেরেছি, ওরাও দুজনে এ বিয়ে স্থির করেছে। ডাকুন আপনি শৈলেনকে।

থাম্ লক্ষ্মীছাড়া—দূর হয়ে যা এখান থেকে—ব'লে পিছন থেকে প্রবল উত্তেজনা সহকারে আলোকলতা নাটকীয়ভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন।

সকলে স্তব্ধ। আলোকলতা বিকৃতমুখে বললেন, ডাকাডাকি, সাক্ষী! একদিকে ভীমরতি, অন্যদিকে ছেলেখেলা···এই বুঝি তোমার পুরীর হাওয়া বদল? এই যে বিবিসাহেব—মরি, মরি, লজ্জায় জড়োসড়ো! বলি, মাথা গুঁজে ব'সে থাকা আবার কেন? বয়সের ছেলে সঙ্গে নিয়ে যেখানে খুশি বেড়াতে যাওয়া। ফিরতে বুঝি আর ইচ্ছে ছিলনা? মরণ আর কি, লজ্জাও করেনা তোর?- মুখপোড়া, তুই সঙ্গে গিয়েছিলি বুঝি দালালি করতে?

হিমাংশুর এতকালের মাতৃভক্তিতে আজ যেন চির খেয়ে গেল। ফস্ ক'রে বললে, মা, বাবার সামনে কিন্তু আমার মান রেখে কথা বোলো, ব'লে দিচ্ছি। তোমাদের ব'লে রাখলুম, শৈলেনের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে দিয়ে তবে আমি ছাড়বো।

ওরে আঁটকুড়ো, তুই ঘর থেকে দূর হ'বি কিনা বল্—ব'লে আলোকলতা

ছেলেকে তেড়ে গেলেন। কিন্তু শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বাধা দিয়ে বললে, লোকে শুনতে পাবে বাইরে থেকে, কি করো যে তোমরা,—ব'লে সে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হিমাংশু কঠিন হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েই রইল। আলোকলতা এগিয়ে গিয়ে ভিতরকার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর খাটের একপাশে এসে বললেন, লক্ষ্মীছাড়া, তুই বুঝিস কতটুকু? তুমিই বা কোন্ সাহসে হিরণের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েকে জঙ্গলে পাঠিয়েছিলে শুনি?

অবিনাশ বললেন, আমার মেয়ে কোনো দিন কোনো অন্যায় করবেনা, এই জেনেই পাঠিয়েছি, ছোটবৌ। এও জানি, সে-বিশ্বাস শাশ্বতী ভাঙে নি।

আলোকলতা বিষাক্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো শৈলেনের? বদ ছেলের সঙ্গে মিশে চিরকাল যাত্রা থিয়েটার নিয়ে মাতামাতি করলো, এদেশ-ওদেশ বেড়িয়ে ভেতরে ভেতরে এতকাল বদমাইসি ক'রে বেড়ালো। না আছে চাকরি, না আছে সুবুদ্ধি,—একটা ডাকসাইটে লক্ষ্মীছাড়া। মেয়েটাকে আমি ধ'রে বেঁধে জলে ফেলে দেবো তুমি বলতে চাও?

অবিনাশ নিরুত্তর।

আলোকলতা পুনরায় বললেন, অমন সুন্দর ছেলে সুকুমার। চারশো টাকা মাইনের চাকরি। বিলেত-ফেরত সোনারচাঁদ। ওর বাপ তোমার উন্নতির জন্যে সর্বস্ব পণ করবে বলেছে, তা জানো? তোমাকে ব'লে রাখলুম এই কথা, সুকুমারের সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে না দিলে আমি ভাগলপুরের গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরবো।

এগার

অকস্মাৎ মায়ের মুখের এই অতি অপ্রত্যাশিত অশিষ্ট ইঙ্গিতে একান্ত পীড়িত হয়ে শাশ্বতী সেখান থেকে প্রায় ছুটে চলে এল একেবারে নিজের ঘরে। তার সমস্ত দেহমন যেন একটা অশুচিতার স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে উঠে ভিতর থেকে ঘৃণায় ছি ছি করছিল।

মা রেগে উঠলে অত্যন্ত কঠিন কথা বলেন শাশ্বতী তা জানে, কিন্তু এমন নোংরা কথাও যে তিনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন, বিশেষ করে, তার বাবার আর দাদার সামনে, এটা শাশ্বতীর কাছে একেবারেই নূতন।

একা শাশ্বতীর কাছে যদি মা তার বিরুদ্ধে এরকম কুৎসিত অভিযোগ করতেন, শাশ্বতীর মনে হয়ত এতটা আঘাত লাগত না। কিন্তু দুঃখ তার সবচেয়ে বেশী এই জন্যে যে তার উদারমনা সরল ও স্নেহময় বৃদ্ধ পিতাকে অকারণে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হ'তে হ'ল। সে ত' নিজেই ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। বাবার কি দোষ? আর তারই বা নিজের এমন কি অপরাধ হয়েছে এতে যে মা ওই রকম বিশ্রী অপমান করলেন?

শাশ্বতীর সমস্ত মন মায়ের এই কদর্য্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল ছি ছি ছি! মার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! নইলে, কোনও ভদ্রমহিলার মুখ দিয়ে যে এরকম জঘন্য কটূক্তি বেরুতে পারে, এ তার কল্পনার অতীত। রাগলে মানুষের জ্ঞান থাকে না, একথা ঠিক; কিন্তু তা বলে কি

মানুষ এতটা নীচুতেও নামতে পারে—এত নিষ্ঠুরও হতে পারে। ক্ষুব্ধ অভিমানের অশ্রুজলে শাশ্বতীর দুটি চোখ ভরে উঠল। কী অন্যায় করেছে, কোথায় তার অপরাধ, শাশ্বতী ভেবে পায় না। রতনগড়ে শৈলেনদা'র সঙ্গে শিকারে তো সে একা যায় নি। সঙ্গে ছিল তার দাদা—নিজের সহোদর বড় ভাই; আর ছিল সস্ত্রীক সৎপন্থী সাহেব। তা ছাড়া শৈলেনদা তো একজন অপরিচিত বাইরের ছেলে নয়। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব তো আত্মীয়তার মর্য্যাদা পেয়ে আসছে বহুদিন থেকে। বাবা যখন ভাগলপুরে বদলি হন তখন তো দাদা, শৈলেনদা, আমি—আমরা ক'জনা নেহাত ছেলেমানুষ! দীর্ঘকাল একসঙ্গে কত খেলা-ধূলা করেছি। কত হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি করেছি। একসঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা হ'ত, এবাড়ী ওবাড়ী ঘন ঘন যাওয়া আসা চলত,—কতদিন একপাতে বসে একসঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেতুম আমরা—কই সেদিন ত আমাদের মেলামেশায় কারুর কোনও আপত্তি হয় নি। আজ বড় হয়েছি বলে কি আমরা পরস্পরের পর হয়ে গেছি! বয়স হয়েছে বলে কি আমাদের মধ্যে মেলামেশা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে!

শাশ্বতীর মন এতে সায় দিতে চায় না। একদা যাদের আপন বলে মনের মধ্যে

সে অকপটে গ্রহণ করেছিল, জীবনের সেই প্রথম ঊষালোকে যাদের কলরবের সঙ্গে একত্রে মিশেছিল তার অন্তরের আনন্দঘন কূজন কাকলি, যাদের প্রতি তার হৃদয়ের একটা সহজাত অনুরাগ স্বতঃই বিচ্ছুরিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে—আজ সে উৎসের কণ্ঠরোধ করবে সে কোন্ যুক্তি দিয়ে—কোন্ বিচার বুদ্ধি দিয়ে ?

হঠাৎ শাশ্বতীর মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে শোনা তার বাবার মুখের কথাগুলো—সুলতাকে নিয়ে সুকুমার গিয়েছিল ভাগলপুরে তোমার মায়ের কাছে। চারশো টাকা মাইনের একটা কাজ পেয়েছে সুকুমার, পাত্র হিসেবে সে অদ্বিতীয়, এই তোমার মায়ের ধারণা। কেবল তাই নয়, গোবিন্দপদবাবু নাকি এমন এক ব্যবস্থা করেছেন যাতে আমাকে চাকরি ছাড়তে না হয়—

পিতার এই শেষের দিকের কথাটাই শাশ্বতীর মনকে বেশ একটু উতলা করে তুললো। তার কানের মধ্যে যেন কেবলই প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে 'কেবল তাই নয় শাশ্বতী, গোবিন্দপদবাবু নাকি এমন এক ব্যবস্থা করেছেন যাতে আমাকে চাকরি ছাড়তে না হয়।' সংসারের এই অশান্তির মূলেই হ'ল বাবার চাকরি ছাড়া।

বাবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া পর্য্যন্ত দেখছি মায়ের এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি! মা যে আমাকে বিদেয় করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন, তার মূলেও রয়েছে বাবার এই চাকরি ছাড়া। বাবার উপর মার যত না রাগ এসে পড়েছে, তার চার গুণ বেশী রেগেছেন উনি আমার উপর। কারণ, বাবার চাকরি ছাড়াটা একমাত্র আমিই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছি।

আমি কাছে না থাকলে দিবারাত্র মার এই বিষম গঞ্জনা আর রাগারাগির হাত থেকে বাবাকে আড়াল করে রাখবে কে ? না, বিবাহ সে এখন কিছুতেই করতে পারেনা। তবে—হ্যাঁ, গোবিন্দপদবাবু যদি সত্যিই এমন কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে যোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদার সঙ্গে বাবা আবার মুন্সেফি করতে পারেন, তাহলে মা যে অনেকখানি নরম হবেন তাতে কোনও ভুল নেই।.. কিন্তু এর জন্যে যে মূল্য তিনি দাবি করেছেন তা দেবার সাধ্য কই আমার!

শাশ্বতীর সমস্ত হৃদয় একটা অব্যক্ত বেদনায় টনটন্ করে ওঠে। আর কেউ জানুক বা না জানুক, শাশ্বতী ত, এটা বেশ ভালরকমই জানে যে নিতান্ত আত্মসম্মানে আঘাত লাগাতেই নিদারুণ অভিমানে পিতা তার এতদিনের চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। চাকরির উপর যে তাঁর মায়া কত গভীর, এ কথা

শাশ্বতীর কাছে অবিদিত নয়। তাই তিনি যখন চাকরি ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলেন তখন এর মধ্যে যে তাঁর কত বড় একটা ত্যাগ-স্বীকার, কতখানি দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন তিনি—এ জেনে ও বুঝেই পিতার প্রতি শাশ্বতীর শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে আত্মপীড়নকে তিনি অনায়াসে আবাহন করে নিতে পেরেছিলেন, তারই মধ্যে সন্ধান পেয়েছিল শাশ্বতী তার মহান পিতার অভ্রভেদী মহত্ত্বের। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় শাশ্বতীর মনটি ভরে উঠেছিল। তাই অসঙ্কোচ নির্ভয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছিল তার বাবার পাশে, আর অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছিল তাঁর এই কর্তব্য পালনের দৃঢ়তাকে।

পিতার জীবনের সেই বহুদিনের অভ্যস্ত আশ্রয় ও অবলম্বন. যার সঙ্গে জড়িত তাঁর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও উৎসাহ, সেটা তিনি অনায়াসে আজ আবার ফিরে পেতে পারেন—যদি শাশ্বতী তার নিজের যা কিছু ব্যক্তিগত সুখ স্বার্থ, ভাবী জীবনের সমস্ত রঙিন স্বপ্ন ও কল্পনাকে জন্মের মতো বিদায় দিয়ে সুকুমারের প্রস্তাবে সম্মত হয়!

কিন্তু এ করা এখন আর তার পক্ষে কোনরকমেই সম্ভব নয়। পুরী যাবার আগে—এমনকি রতনগড়ে শিকারে যাবার ক্ষণপূর্ব্বেও যদি এ প্রস্তাব তাঁর কাছে আসতো, তাহ'লে হয়ত শাশ্বতীর পক্ষে মায়ের নির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করা এতটা কঠিন মনে হ'ত না। শাশ্বতীর নিজেকে অত্যন্ত নিরুপায় ও নিঃসহায় মনে হতে লাগল। ত্রিতালের বাঙলোর বাইরে জঙ্গলের পথে সেদিন রাত্রের ঘটনা তার মানস-পটে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একে একে স্মৃতিপথে ভেসে উঠতে লাগল শৈলেনের সঙ্গে তার প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের যত কিছু আলাপ আলোচনা, হাস্য-পরিহাস, মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব ও আঘাত। শাশ্বতীর সারাদেহ একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অসীম লজ্জার অনুভূতি তাকে যেন অভিভূত করে ফেললে! ছি ছি, সে কি কাণ্ড করে বসেছে! অমন নির্লজ্জভাবে শৈলেনের কাছে আত্মনিবেদন করে দিলে সে কেমন করে? এ যে স্বয়ম্বরা হওয়ারও বাড়া! নিশীথ রাত্রে আঁধার অরণ্যপথে সে যেন তার প্রথম মিলন অভিসার!

শৈলেন তাকে অন্ধকারের মধ্যে কোনও বন্যজন্তু মনে করে বন্দুক তুলে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল। শৈলেনের লক্ষ্য অব্যর্থ! হায়, সেদিন নির্ব্বোধের মতো

যদি ধরা না দিত তাহলে বেশ হ'ত। শৈলেনের বন্দুকের একটি গুলিতে জীবনের সকল ভাবনা সকল সমস্যার হাত থেকে জন্মের মতো সে মুক্তি পেত!

শাশ্বতীর সমস্ত রাগ গিযে পড়ে বেচারা সুকুমারের উপর। বিস্মিত হয়ে ভাবে সে—ক'দিন কতটুকু সময়ের জন্যই বা সে আমায় জানে! কোনও উৎসাহ, কোন আশাই তো সে পায়নি আমার দিক থেকে! বরং তার সঙ্গে প্রতিবারই আমি অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করেছি, এমন কি, কখনও বা সুস্পষ্ট রূঢ়ও হয়ে উঠেছি, তবু কেন আমার জন্য তার এই নির্লজ্জ কাঙালপনা! কি পেয়েছে সে আমার কাছে, কী দেখেছে সে আমার মধ্যে—যার জন্য এমন করে সে আমাকে চাইছে! বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার, মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছে. বাপ একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী—ইচ্ছা করলে সে ত' আমার চেয়েও ঢের ভালো ও সুযোগ্যা উচ্চ-শিক্ষিতা পাত্রী পেতে পারে! তবে কেন সে এমন অকস্মাৎ রাহুর মতো এসে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে!

আশ্চর্য্য ওই ছেলেটির উৎসাহ আর জিদ। সুলতা-দিদিকে নিয়ে সে ভাগলপুরে দৌড়েছে মার কাছে পর্য্যন্ত! বিলেত থেকে আর কিছু শিখে আসুক আর না আসুক, তৎপরতাটা খুব শিখে এসেছে বটে! কিন্তু নির্বোধ—নিতান্ত নির্ব্বোধ! এ বিষয়ে যার মতামত এবং ইচ্ছাই সকলের চেয়ে বড়ো, সর্ব্বাগ্রে সেখান থেকে সম্মতি আদায়ের চেষ্টা না করে ও এমন উল্টো পথে চলছে কেন? নিশ্চয় এসব সুলতাদির পরামর্শে করছে। মা'কে রাজী করাতে পারলেই যে বাবার দিক থেকেও কোনও বাধা আসবে না, এটা তার মাথায় ওরাই ঢুকিয়েছে! হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো শাশ্বতীর কাছে একটা কথা অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। সুকুমার যে কেন ভাগলপুরে দৌড়েছিল শাশ্বতী বুঝতে পারলে।

বাবাকে চাকরিতে বহাল রাখতে পারাটাই যে মাকে জয় করার প্রধান উপায় এটা ওরাই হয়তো বলে দিয়ে থাকবে—নইলে সে কেমন করে জানবে? কিন্তু বাবা যদি এ বিবাহে সম্মত হবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, আমি যে তাহলে আর 'না' বলতে পারবো না, এটা তো আমার সঙ্গে সেই প্রথম দিনের আলোচনাতেই সে বুঝতে পেরেছিল। চতুর বটে!

শাশ্বতীর সমস্ত মনটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল! পিতা যদি সত্যই তাকে অনুরোধ করে বসেন তাহলে সে কি করবে? শাশ্বতীর নিজেকে যেন অত্যন্ত

অসহায় বলে বোধ হ'ল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই বলে উঠলো—না, তা সে কিছুতেই পারবে না। পিতার ইচ্ছার অসম্মান করা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হবে না। এর জন্য যদি তাকে সারাজীবন দুঃখই বরণ করে নিতে হয়—সে তা নেবে। নিজের দিকটাই বড় করে দেখা, সে তো নিছক স্বার্থপরতা! সুকুমারের সঙ্গে তুলনায় ওঁদের কাছে শৈলেনদার প্রধান অযোগ্যতা—তিনি কিছু উপার্জ্জন করেন না। বাপ্ মা'য়ে সাধারণতঃ উপার্জ্জনশীল পাত্রেই খোঁজেন। এটা তাঁদের পক্ষে খুবই স্বভাবিক। সুতরাং বাবা যদি শৈলেনদার চেয়ে সুকুমারকেই সৎপাত্র এবং যোগ্যতর মনে করেন, আমাব কিছু বলবার নেই।

ক্ষণকাল চুপ করে শুয়ে থাকার পর অকস্মাৎ শাশ্বতী একটি ছোট মেয়ের মতোই বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁকিয়ে কাঁদতে লাগল আর মনে মনে বাব বার রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগল—নির্ব্বোধ! নির্ব্বোধ! সে শুধু আমার এই খোলোসটাই চায়? আমার বাইরেটা কি তাকে এমন ক'রে প্রলুব্ধ করলে যে তার কাছে অন্তরের আকর্ষণ হয়ে গেল একেবারেই তুচ্ছ ও মূল্যহীন!

নিজের উপর এবং সকলের উপর নিদারুণ অভিমানে শাশ্বতী স্থির করে ফেললে—বেশ, তাই হবে। যদি মা সুখী হন, বাবা নিশ্চিন্ত হন, আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। এক জন্মেই ত মানুষের শেষ নয়।

হঠাৎ হিমাংশু হন্ত-দন্ত হয়ে শাশ্বতীর ঘরে এসে ঢুকলো। উত্তেজিত ভাবে বললে—শতি, শীগ্গির চ' বাবা তোকে ডাকছেন। মা'র জিদ আমি ভাঙবই! হিমাংশুর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন এইমাত্র একটা যুদ্ধ জয় করে আসছে!

শাশ্বতী ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল। তাড়াতাড়ি জলে-ভেজা চোখদুটো আঁচলে মুছে নিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে—সেখানে কি মা আছেন?

হিমাংশু অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সুরে বলে—থাকলেই বা! বাবাকে আমি রীতিমতো যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, মা যেখানে তোর বিয়ে দিতে চাইচেন সেখানে তোর বিয়ে হতেই পারে না। শৈলেনের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে।

শাশ্বতী চমকে উঠল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হিমাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু তার আগেই হিমাংশু বললে—মার মুখের উপর বলে দিয়েছি যে, সম্বন্ধ খুঁজে নিজেদের পছন্দমত ছেলের সঙ্গেই যদি তোমাদের মেয়ের

বিবাহ দেবার ইচ্ছে ছিল, তবে ন' বছর বয়সে ওকে গৌরীদান করনি কেন? লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে বড় করে তুলে এখন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলে, তোমাদের শুধু অন্যায় হবে না, অমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে। স্বামী নির্ব্বাচনে ওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত তোমাদের।

বাবা শুনে বললেন—ছোট বউ, ছেলে তোমার পাগলই বলো আর বোকাই বলো—এ কথাটার মধ্যে ওর যথেষ্ট যুক্তি আছে। শাশ্বতী নিতান্ত বালিকা নয়—বয়োপ্রাপ্ত মেয়ে এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। শৈলেন সম্বন্ধে হিমাংশু যা বলছে তা যদি সত্য হয় তবে তোমার উচিত, এ বিষয়ে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য সেটা একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখা।

শাশ্বতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—মা কি বললেন?

হিমাংশু অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—হ্যাঃ, মা আবার কি বলবে? মার সেই এক কথা সুকুমার লাখোগুণে ভাল পাত্র, শাশ্বতীর অপছন্দ হবার মতো ছেলে সে নয়। তা ছাড়া ওর বাপ তোমার কাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করবে বলেছে, এটা তো তোমার মেয়ের ভেবে দেখা উচিত! আমি তোমাদের কোনও কথা শুনব না—সুকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবই।

আমি তখন মাকে ভয় দেখিয়ে বললুম, আর এ বিয়ে যদি তুমি জোর করে দাও তাহলে জেনো, শাশ্বতী নিশ্চয় বিষ খেয়ে কিম্বা গলায় দড়ি দিয়ে মরবে।

বাবা কথাটা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—তাকে এখনি আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে আয় হিমাংশু, আমি গোবিন্দপদবাবুকে আজই লিখে দিতে চাই যে, তিনি যেন আমার কাজের উন্নতির কোনও চেষ্টা না করেন। যে চাকরিতে আমি একান্ত ঘৃণায় ইস্তফা দিয়েছি সে উচ্ছিষ্ট আমি আর কুড়িয়ে নিতে চাইনা—

শাশ্বতী আর অপেক্ষা করতে পারলে না। তৎক্ষণাৎ পিতার ঘরের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

হিমাংশুর চোখেমুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। সে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে ধীর পদক্ষেপে শাশ্বতীর অনুসরণ করলে।

শাশ্বতী ঘরে এসে ঢুকতেই অবিনাশ সস্নেহে বললেন, এস মা এস, তোমাকেই খুঁজছিলুম। হিমাংশুর মুখে যা শুনেছি তাতে গোবিন্দপদবাবুকে এখনি একখানি পত্র লিখে সমস্ত কথা জানিয়ে দাও আমার ও তোমার সম্বন্ধে—

দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে শাশ্বতী বললে—ওঁকে এখন কিছু লিখনা বাবা।

অবিনাশ একান্ত দৃষ্টি নিয়ে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আলোকলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন—মেয়ের যা বুদ্ধি আছে, তোমার তা নেই। মুন্সেফিতে কি আর সাধে তোমার উন্নতি হয় নি! তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন—এই ক'দিনের মধ্যেই তোমার বাবার কী চেহারা হয়ে গেছে দেখছ ত! খাওয়া গেছে, ঘুম গেছে, আমোদ-আহ্লাদ গেছে—পড়াশোনা পর্য্যন্ত বন্ধ করেছেন, চাকরি ছাড়লে কি আর এ মানুষ বাঁচবে?

কে কোথাকার গোবিন্দপদবাবু আমরা তাঁকে কোনও দিন চিনতুমও না, জানতুমও না। তিনি নিজে উপযাচক হয়ে এসে যা করতে চাইচেন এর মধ্যে আমি ভগবানের হাত দেখতে পাচ্ছি। সুকুমার ছেলেটিও রূপেগুণে সবদিক্ দিয়েই জামাই করবার মতো উপযুক্ত পাত্র। তোকে আমি মিনতি করে বলছি শাশ্বতী, এ বিয়েতে তুই অমত করিসনি। আমি বলি শোন্, ভাল করে বুঝে দেখ্—প্রথমটা কেমন একটু উল্টোপাল্টা হযত মনে হবে—কিন্তু, পরে দেখিস, দু'দিন ঘর করতে করতে শুধুই যে তোমাদের মধ্যে বনিবনাও হয়ে যাবে তাই নয়, বরং ক্রমশঃ দু'জনের পরস্পরকে খুব ভালই লাগবে।

তাছাড়া, সব চেয়ে বড কথা হচ্ছে—তোমার বুড়ো বাপের অবস্থা, তোমার নিজের ভবিষ্যৎ, তোমার পিতৃকুলের কল্যাণ—এগুলোও তো তোমার ভেবে দেখা দরকার। মেয়েমানুষের কি কেবল আত্মসুখা হয়ে চলা ভালো। তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে—এটিও বোঝা উচিত যে কোনও বেকার ছেলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে জীবনে দুঃখ অনিবার্য্য। অভাব অনটনের সংসারে আশৈশবের প্রীতির বন্ধনও শেষপর্য্যন্ত গলার ফাঁস বলে মনে হবে। নিজের দুঃখ কষ্ট হযত অনেক সইতে পারো, কিন্তু সন্তান-সন্ততি কষ্ট পাচ্ছে দেখলে জীবন একেবারে শুষ্ক মরুভূমি হয়ে উঠবে।

শাশ্বতীর মনের ভিতরটা একথা শুনে আচম্বিতে যেন শিউরে উঠল। এ কি তার মায়ের অভিশাপ!—অশ্রুরুদ্ধ ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, চুপ করো মা, আমাকে তোমরা দয়া করে দুদিন একটু ভাববার অবসর দাও।

অবিনাশ ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—দু'দিন কেন মা, যতদিন না তুমি মনস্থির করতে পারবে, আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবো। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিবাহ কখনই হ'তে দেব না।

এই সময় হিমাংশুকে ঘরে ঢুকতে দেখে শাশ্বতী ব্যাকুলভাবে বললে—দাদা, তুমি আজ রাত্রেই এখান থেকে আমার ভাগলপুর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো—তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—

বলতে বলতে উদ্গত অশ্রুজল অতি কষ্টে নিরোধ করে শাশ্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমুদ্রের ধারে দক্ষিণের সেই বড় ঘরখানায় একেবারে জানালার কাছটিতে একখানা ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে শৈলেন ভাবছিল আজ অনেক কথা। সম্মুখের ঐ অনন্ত বিস্তৃত অকূল পারাবারের মতো শৈলেনেরও ভাবনার যেন কোনও কূলকিনারা ছিল না! সেও যেন ক্ষণে ক্ষণে অমনিই অশান্ত উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠে কূলে কূলে আছড়ে ভেঙে পড়ছিল! তার বুকের ভিতরে অপরিমেয় বেদনার যে মর্ম্মন্তুদ্ আর্ত্তনাদ হাহাকার করে উঠছিল, সমুদ্র গর্জ্জনের মতো বাইরে থেকে তা শোনা না গেলেও অন্তর্লোকে তার সকাতর প্রতিধ্বনির অহরহ যেন বিরাম ছিল না!

শাশ্বতী আজ দু'দিন হ'ল হিমাংশুর সঙ্গে হঠাৎ ভাগলপুরে চলে গেছে। যাবার আগে শৈলেনের সঙ্গে সে একবার দেখা পর্য্যন্ত করে যাওয়া দরকার মনে করলে না। যাত্রার মুখে একটা কোন কথাও তো তাকে বলে গেল না!

শিকার থেকে ফিরে আসার পর ভাগলপুর চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত যতক্ষণ বাড়ীতে ছিল, শৈলেনকে যেন সে এড়িয়েই চলেছে। শাশ্বতীর সঙ্গে তার ক্ষণিকের চোখের দেখা পর্য্যন্ত ঘটে নি! অথচ এই পুরীতে এসে পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে কতবার কত ছলেই না সে তার কাছে আসতো! হয়ত কখনো কিছু বলতো—হয়ত বা কখনো নিঃশব্দেই ঘুরে যেত। মুখের কথার চেয়ে তার চোখের ভাষা ছিল ঢের বেশী চটুল। বাক্যের সলজ্জ অস্পষ্টতা যেন দৃষ্টির নির্ম্মল স্বচ্ছতায় ব্যক্ত হ'য়ে ধরা দিত!

ভবঘুরে শৈলেন পুরীর সমুদ্রতীরে সহসা যেন কুড়িয়ে পেয়েছিল জীবনের কোন দুর্লভ পরশমণি! ছন্দ জেগে উঠেছিল তার প্রাণের স্পন্দনে! সুর বেজে উঠেছিল তার বেসুরো মনে।

কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন—কোথায় তাল কেটে গেল ফস করে। সেতারের

টানে বাঁধা সুরের তার গমগমে আলাপের মাঝখানে আচম্বিতে ছিঁড়ে গেলে যেমন চড়াৎ করে সুর কেটে দিয়ে গুটিয়ে যায়—শৈলেনের মনটাও তেমনি শাশ্বতীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অকস্মাৎ যেন চিড় খেয়ে গুটিয়ে গেল এক বেসুরো জগতের অন্ধকারে।

শৈলেনের মনে পড়ে গেল—কুস্তির আখড়ায় তার হিন্দুস্থানী ওস্তাদ প্রায়ই সাগরেদ পালোয়ানদের বলতো:—নারী মাত্রই নরকের দ্বার। তাদের পাল্লায় যারাই পড়েছে তারাই নরকের পথে এগিয়ে গেছে।

যৌবনসন্ধিক্ষণের এই সতর্কতা তাকে মেয়েদের সান্নিধ্য থেকে এতদিন দূরে অপসৃত ক'রে দেশের কাজে ও দশের উপকারে ব্যাপৃত রেখেছিল। একদা ভাগলপুরে শাশ্বতীর সঙ্গে তার নাম জড়িত হ'য়ে একটা ভাবী দাম্পত্য জীবনের কল্পিত গুজব কানাঘুষায় প্রচার হ'তে সুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু সে অনেকদিনের কথা; তখন তারা দুটি নব কিশোর কিশোরী—পরস্পরে ছিল শুধু খেলার সঙ্গী মাত্র! জীবনপথেও উভয়ে যে কোনও দিন পরস্পরের সহযাত্রী হবে, এ কল্পনা—এ ভাবনার ইঙ্গিত মাত্রও তাদের মনে আসেনি।

শিকারে যাবার সময় শাশ্বতীকে সঙ্গে নিতে শৈলেন কখনই সম্মত হ'ত না যদিনা সে তার মার কাছে শুনতো যে, সুকুমারের সঙ্গে শাশ্বতীর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। মেয়েদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কখনো না করলেও শৈলেনের এটা জানা ছিল "বিশ্বাস নৈব কর্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"। রতন-গড়ে সেদিন ত্রিপালের বাংলার বাইরে জঙ্গলের পথে যে অভাবিত ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা যেন তার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হ'ল। হয়ত নারী-সুলভ অভিনয় ছাড়া সেটা আর কিছুই নয়! নেহাত নভেলিয়ানা! নিশ্চয় কোনও সিনেমার ছবিতে সে নায়িকাকে দেখেছিল ওই ভাবে প্রেমাস্পদ সকাশে অকস্মাৎ আত্মনিবেদন ক'রে দিতে! নইলে, শাশ্বতীর পক্ষে এতখানি নির্লজ্জতা কখনই সম্ভবপর হ'ত না। সেটা ওর ক্ষণিক উন্মাদনাও হ'তে পারে। পরক্ষণেই আবার শৈলেনের মনে হয়, না, তা কখনই অভিনয় হ'তে পারে না। সেই অকপট আত্মনিবেদনের মধ্যে তো কোথাও কৃত্রিমতার লেশ মাত্র ছিল না! সরলমনের যে অনবগুণ্ঠিত অকুণ্ঠিত আবেগ তার সেই দুটি কাতর চোখের সকরুণ দৃষ্টিতে স্বতঃই উৎসারিত হ'তে দেখেছিল সে, তা যদি মিথ্যা হয় তাহ'লে জগৎ সংসারে সবই মিথ্যা।

শৈলেনের সমস্ত মন পৃথিবীর উপর, মানুষের উপর, সবকিছুর উপরই কেমন যেন একটা ঔদাস্যপূর্ণ বিরক্তিতে ভরে উঠল। পুরী আর তার ভাল লাগছে না। সমুদ্র গর্জ্জন যেন নিয়ত তাকেই তিরস্কার ক'রে বলছে—ছিঃ, শেষে তুমিও নারীর মোহে আপন পৌরুষটুকু জলাঞ্জলি দিলে! শৈলেন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সমস্ত শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে মনটাকেও একটু নেড়ে-চেড়ে নিতে চাইলে। স্থির করলে মনে মনে সে, আর না! এ দুর্ব্বলতাটুকুকে সে আর প্রশ্রয় দেবে না। তার প্রভাত যৌবনের স্নিগ্ধ অরুণচ্ছটায় হেসে ওঠা মনের কুসুমমত আঙিনায় যে মেয়েটি আপন আঁধার নিশার মতো নিবিড় কালো এলো চুল মাথার উপর চূড়া করে বেঁধে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল প্রেমের সুবর্ণ সাজিটি হাতে নিয়ে, শৈলেন সাগ্রহে এগিয়েছিল ভরে দিতে তার পুষ্পপাত্র আপন হৃদয়ের অনাঘ্রাত সুগন্ধি ফুলের অজস্র অঞ্জলিতে। কিন্তু কোথায় অদৃশ্য হ'ল সহসা সে অনাহুতা? মিলিয়ে গেল যেন মরীচিকার মতোই অবহেলার অনাদৃত দিগন্তে। সে যেন আলেয়ার আলো দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল দুরাজয়শ্চক্রছায়ে। শৈলেন স্থির করলে, আজই সে চলে যাবে এখান থেকে সিংভূমগড়েরই জঙ্গলে শিকার করতে। অলস দিন-যাপন দিবা-স্বপ্ন সৃষ্টি করে' মানুষকে দুর্ব্বল করে তোলে!

এইটা কি হরেনবাবুর বাড়ী?—ভাগলপুরের মুন্সেফ মিঃ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল কি এই বাড়ীতেই থাকেন?

কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলে জানলার বাইরে বীচরোড থেকে একটি সুদর্শন যুবা, পরিধানে পরিচ্ছন্ন বিলিতী পোষাক।

শৈলেন চমকে উঠল, কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত লাগল। জানালার ধারে গিয়ে বললে—হ্যা, এই বাড়ীতেই থাকেন। আপনি ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন। বাড়ীর দরজা ওপাশে—

ছেলেটির মুখখানিও যেন খুব চেনা-চেনা বোধহল শৈলেনের কাছে। কোথায় যেন সে দেখেছিল ওকে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলে না।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই হাতের মুঠোর মধ্যে পিষ্ট সেই অশোক-গুচ্ছটি সযত্নে পকেটে পুরে সে বাইরে চললো ছেলেটিকে অভ্যর্থনা করতে।

বারো

একখানা চিঠি হাতে নিয়ে সেদিন সকালবেলাই রেবা এসে হাজির হ'ল সুলতাদের বাড়ী।

রেবা উপরে উঠে আসতে সুলতা তার দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেল। বিলাসিনী রেবা নিতান্ত সাদাসিধা সাজে সকালবেলা এসে উপস্থিত হয়েছে দেখে সুলতা জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি তোর? হঠাৎ এমন অসময়ে এলি যে! কাপড়-চোপড়ও বদলাবার সময় পাসনি দেখছি! চা-খাওয়া হয়নি নিশ্চয়। বোস, চা নিয়ে আসি—

সুলতার একখানা হাত ধরে ফেলে রেবা বললে—চা আমি খেয়ে এসেছি দিদি, তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ—

—কার চিঠি?

—পড়ে দেখনা—

—কী লিখেছে?

—পড়লেই বুঝতে পারবে। ব'লে রেবা তার হাতের চিঠিখানা সুলতার দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সুকুমার-দা কোথা?

সুলতা একমুখ হেসে বললে—চিত্তজয় করতে বেরিয়েছে।

—মানে? বিস্মিত রেবা প্রশ্ন করলে।

—মানে, শাশ্বতকাল ধরে পুরুষ যে কাজ করে এসেছে এবং করবেও, সুকুমার সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করছে। সে শাশ্বতীর সন্ধানে পুরী রওনা হয়েছে।

কথাটা শুনে রেবা একটু চমকে উঠলো। ক্ষণকাল চুপ করে কি যেন ভেবে ধীরে ধীরে সে বললে—শাশ্বতী ত পুরীতে নেই!

এবার সুলতার চমকে ওঠার পালা। বললে—সে কিরে? বেচারা যে বড় আশা করে দৌড়েছে অবিনাশ বাবুর প্রমোশনের খবরটা নিজের মুখে তাকে দেবার জন্য। তার সংবাদ যে ভুল নয়, তার প্রমাণস্বরূপ ঠাকুরপো এ সপ্তাহের গেজেটও একখানা কিনে নিয়ে গেছে।

কি রকম করে প্রমোশন সম্ভব হ'ল! আমিত শুনেছিলুম পিসেমশাই 'রিটায়ার' করবার জন্ম দরখাস্ত করেছেন। সংশয় মিশ্রিত কণ্ঠে রেবা প্রশ্ন করলে।

সুলতা হেসে বললে—গোবিন্দপদবাবু সে দরখাস্ত চেপে দিয়েছেন। যথাস্থানে তা পৌঁছায়নি। সুকুমারের মুখে শুনেছি।

নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে রেবা বললে—সবই ওঁর পণ্ডশ্রম! চিঠিখানা পড়ে দেখ।

সুলতা চিঠিখানা নিয়ে প্রথমেই উল্টেপাল্টে দেখলে—চিঠি কে লিখেছে এবং কোথা থেকে এ চিঠি আসছে। হাতের লেখা দেখে কিছু ধরতে পারা গেল না। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ রয়েছে 'ভাগলপুর'। তবে কি শাশ্বতীর মা এ চিঠি লিখেছে?

খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বার করে' দেখে সুলতা অবাক্ হয়ে গেল! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যারে! এ যে শাশ্বতীর চিঠি দেখছি! ওরা ভাগলপুরে ফিরলো কবে? পুরীতে হরেনবাবুর বাড়ীতে রয়েছে শুনেছিলুম?

রেবা বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—চিরজীবনটাই তোমার একরকম গেল। হাতে চিঠি রয়েছে পড়ে দেখবে না—লোকের মুখে শুনে কাজ সেরে নিতে চাও। সব কিছুই কি ফাঁকি দিয়ে সারা যায়?

সুলতা লজ্জিত হয়ে চিঠিখানা পড়তে সুরু করলে, কিন্তু তার আগে একটু মৃদু হেসে রেবাকে অবশ্য বলে নিলে—ইস্! আজকাল তোর মেজাজটা যে বড় রুক্ষ হয়ে উঠেছে দেখছি!

রেবা বললে—তোমার পাল্লায় পড়লে মরা মানুষেরও মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠবে।

সুলতা এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে চিঠি পড়তে মনোনিবেশ করলে।

ভাগলপুর

স্বচ্ছসলিলা-রেবা,

অকস্মাৎ ভাগলপুর থেকে আমার চিঠি পেয়ে হয়ত খুব বিস্মিত হবে। আমি আজ দিন দুই হ'ল পুরী থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি পালিয়ে

এলে কি হবে—আমার দেহ মন ত' আমার সঙ্গ ছাড়েনি, কাজেই দুর্ভাবনার বোঝাও সঙ্গে এনেছি।

কথাগুলো বোধহয় তোমার কাছে হেঁয়ালী ঠেকছে, কিন্তু, উপায় কি? স্পষ্ট করে তোমায় সব জানাবো বলে আজ দু'দিন ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু পেরে উঠছি না।

লজ্জা নারীর ভূষণ যাঁরা বলেছেন, তাঁরা হয়ত এটা জানতেন না যে ঐ ভূষণই অনেক সময় হয়ে ওঠে তার গলার ফাঁসি।

জীবনটা আমাদের শুধু প্রহেলিকাই নয়, বোন, এর মধ্যে ঝটিকাও বহে যায় বহু। এইরকম এক ঝড়েই উড়ে এসেছি এখানে ছিন্ন পত্রের মতো। আমি বড় বিপন্ন।

তোমার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উদ্ধারের কোনও আশা নেই। তোমাদের সেই বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার সাহেবটি এমন প্যাঁচে এবার আমাকে ফেলেছেন যে উদ্ধার হবার মতো কোনও ফাঁকই রাখেন নি। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় এখন আত্মসমর্পণ! ওঁর এই বিলিতী ফন্দির প্রশংসা করছি, কিন্তু এ মরুভূমি জয় করে লাভ কি হবে ওঁর!

একটা কোনও 'ইণ্ডিয়ান কিউরিয়ো' সংগ্রহ করে বাড়ীতে এনে রাখাও যা, আমাকে নিয়ে আসাও তাই—এমন কি, তার চেয়েও অসার্থক।

লক্ষ্মীটি ভাই, তুমি ঐ ভদ্রলোকটিকে বুঝিয়ে বোলো যে, উপকার মানুষ চিরদিন স্মরণ করে রাখে, উপকৃতের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞও হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা মানে ত' প্রেম নয়। ওঁর জীবনের হিসাব-নিকাশের খাতায় আমার স্থান হবে লোকসানের ঘরে। প্রেমের সম্পর্কশূন্য স্ত্রী কখনও জীবনের লাভ হিসেবে গণ্য হ'তে পারে না।

তবে সাধ করে এ 'ট্রাজেডি' ঘটিয়ে লাভ কি? 'মোহ' মানুষের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ ওটা স্থায়ী নয়। ক্ষণবসন্তের শেষ হলেই জীবনের অপ্রাকৃত কুঞ্জবনে আসে নেমে প্রখর নিদাঘের দাবদাহ! সে কি উনি সইতে পারবেন? আমার মতে কারুরই সওয়া উচিত নয়। একপক্ষ সইতে পারলেও অপরপক্ষ তা সইতে নাও পারে!

তোমাদের ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে জিজ্ঞাসা কোরো যে তিনি এই যে সেতু

বন্ধনের অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন, এতে তিনি হয়ত সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পৌঁছতে পারবেন, কিন্তু সীতা উদ্ধার করতে পারবেন কি ?

হরধনু ভঙ্গ করবার জন্য তিনি জনক রাজসভায় উপস্থিত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু তথাকথিত স্বয়ম্বরা সীতার মতো আমার যে কোনও ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই এবং তিনি যে আমার রামচন্দ্র নন, এটা তাঁর বোঝা উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁর ভাবা দরকার যে রাবণ দণ্ডকারণ্য থেকে জানকীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েও আপন অন্তঃপুরে বরণ করে নিতে পারেননি।

তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ রেবা—ঈস ! মেয়েটার কি স্পর্দ্ধা—কী ধৃষ্টতা ! কিন্তু সত্যি বলছি বোন্, আমি নিজেকে খুব একটা অদ্ভুত কিছু বলে মনে না করলেও, ঐ বারংবার অগ্নি-পরিশুদ্ধা ও তথাপি পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী মৈথিলীর সঙ্গে নিজের স্থান-পরিবর্ত্তন করতে রাজী নই। তাঁর বনগমনের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু ঐ অগ্নিপরীক্ষার অন্যায় অপমান বরণ করে নিযে তিনি ভারতের সমস্ত নারী সমাজের সর্ব্বনাশ করে গেছেন।

প্রেম যেখানে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুচিতার প্রমাণ সেখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক ! এ যেন কষ্টিপাথরে যাচাই করে সোনা কেনার মতো ! যাক্, অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। যা বলতে চাই শোনো। আমাকে তুমি রক্ষা করো, আমি উভয় সঙ্কটে পড়েছি ! এদিকে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরমারাধ্য পিতার শেষ জীবনের সমস্ত সুখশান্তি, স্বাস্থ্য ও সন্তোষের প্রশ্ন, অন্য দিকে আমার জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ সঙ্কটাপন্ন। নিজেকে নিঃশেষ করে আমি পিতার সন্তোষ সাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ; কিন্তু পিতার প্রীতির জন্য যেখানে আমাকে নারীত্বের অমর্য্যাদা, মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং আত্মপ্রতারণা স্বীকার করতে হবে, সেখানে মন আমার কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। আমি যে নিশ্চয় করে জানি, বাবা এতে একটুও সুখী হ'তে পারবেন না। এক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি আমাকে তুমি বলে দাও। আমি এর ভালমন্দ কিছুই স্থির করতে পারছি না।

একটা গোপন কথা তোমাকে আমি কানে কানে বলি শোনো—সুকুমারবাবু আজ আমার পিতা আর প্রিয়তমের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সহসা এক অপ্রত্যাশিত অনর্থপাতের মতো। তিনি যে দাক্ষিণ্যের মূল্যে আমাকে কিনতে চান—বুঝতেই পারছো, বাবার মুখ চেয়ে তা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কত

কঠিন। অথচ গ্রহণ করার দিক থেকেও যে বাধা তা আমার পক্ষে দুস্তর। আমি আজ দুরাত্রি ঘুমুতে পারিনি। অনেক ভেবেছি, নিজের একার শক্তিতে কোনও নিরাপদ কূলে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব বুঝে তোমার সাহায্য প্রার্থিনী হয়ে এসেছি।

তুমি যে সুকুমারবাবুকে ভালবেসে ফেলেছ, একথাটা আমার কাছে গোপন নেই, আর সুকুমারবাবুরও যে তোমাকে ভালই লাগে, একথা তিনি একাধিকবার নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। আমি যদি ওখানে উপস্থিত না থাকতুম, তাহলে সুকুমারবাবুর সমস্ত মনোযোগটাই তোমার উপর অর্পিত হ'য়ে তোমাদের যুগল হৃদয়কে লক্ষ্যপথে এতদিন অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত।

আমি ত এখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে এসেছি, এইবার তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি এই সুযোগে তোমার প্রেমাস্পদের চিত্তটি জয় করে, ওর সমস্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তোমার অন্তরাভিমুখী করে নাও। লক্ষ্মীটি বোন, তোমার দুটি হাতে ধরে মিনতি করছি, এ না করলে জেনো, শুধু যে তুমিই অসুখী হবে তাই নয়, আমারও ভবিষ্যৎ জীবন চিরঅন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

আমার বিশ্বাস তুমি এ কাজ অতি সহজেই পারবে, তোমার মধ্যে প্রেমের সে বিজয়িনী রূপ আমি দেখেছি। একটু সচেষ্ট হলে অনায়াসে তুমি সুকুমারবাবুকে আমার দিক থেকে ফেরাতে পারবে।

তাঁকে আমি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারতুম, যদিনা আমার বাবা তাঁর পিতার কাছে ঋণী হয়ে পড়তেন। এইখানেই বেধেছে গোল। তাই, আমি চাই, এই অবাঞ্ছিত ভদ্রলোকটিকে কোনও রকমে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে আমার জীবনপথ থেকে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে অপসারিত করা। এই কাজটির ভার তোমায় নিতেই হবে ভাই। তোমার সহযোগিতা পেলে আমার বিশ্বাস ওঁকে সরাতে পারবো। সুকুমারবাবুর সুবুদ্ধির উদয় হতে তখন আর বিলম্ব হবে না।

কিন্তু, খুব সাবধান! মা যেন আমাদের এ ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরে না কিছু জানতে পারেন, তাহলে কিন্তু তিনি আমার আর বাবার জীবন দুঃসহ করে তুলবেন।

তোমার চিঠির আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। যত শীঘ্র পার মন স্থির করে উত্তর দিও।

মামাবাবু মামীমা কেমন আছেন? তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছি। সুলতাদির খবর আশা করি ভাল—তাঁকেও বোলো আমার নাম করে যে শাশ্বতী বলেছে, দোহাই দিদি তোমার কুর্ত্তা বোলাও লেও!

প্রীতি নাও। ইতি—সা-সতী (শাশ্বতী)

সুলতা চিঠি শেষ করে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। রেবাকে বললে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য! আয়, ঘরের ভেতর এসে বোস্ কথা আছে। আমার মনোগত ইচ্ছে ছিল কিন্তু গোড়া থেকেই যে সুকুমার যদি তোকে বিয়ে করে ত খুব ভাল হয়।

কেন হয়?

সুলতার পিছু পিছু ঘরের ভিতর যেতে যেতে রেবা একটু দুষ্টমীর সুরেই কথাটা জিজ্ঞাসা করলে।

সুলতা বললে—তোদের দুটিকে বড্ড মানাবে। একরকম স্বভাব, একরকম প্রকৃতি, দুজনেই বেশ খোলা মন, স্পষ্টবাদী সদানন্দময়—একেবারে মাণিকজোড হবে—

রেবা বললে—তাহলে কি কোমর বেঁধে লাগবো নাকি সীতাউদ্ধার করতে?

সুলতা বললে, লাগো, কিন্তু লঙ্কা পুড়িওনা যেন!

সেকাজটি তো তোমার গুণধর দেবরটিই সুরু করে দিয়েছেন। ল্যাজে আগুন বেঁধে তিনি ভাগলপুর থেকে পুরী পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করছেন। বলেই রেবা হেসে ফেললে।

সুলতাও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বললে—হনুমানটিকে নিরস্ত করো।

তথাস্তু। বলে রেবা উঠে পড়লো। বললে, যাই দিদি, শাশ্বতীর চিঠির জবাব দিইগে, নইলে আরও দু'রাত্রি হয়ত সে ঘুমুতে পারবে না।

সুলতা বললে, কিন্তু, কথা ছিল যে—

রেবা তখন উঠে পড়েছে, বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, থাক, সে আর একদিন হবে।

রেবা চলে গেল। সুলতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে বললে, আমার বিলেত-ফেরত দেওরের যোগ্য পাত্রী যদি কেউ হয়ত'—রেবাই। শাশ্বতী? রামঃ!

তেরো

ভাগলপুরের বাড়ীতে মহা সোরগোল পড়ে গেছে। দীর্ঘকাল পরে অবিনাশ মুন্সেফ থেকে একেবারে অতিরিক্ত সাবজজ হয়ে ফিরে এসেছেন।

আলোকলতা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। পুরী থেকে আসবার সময় তিনি সকলকেই সঙ্গে করে ভাগলপুরে নিয়ে এসেছেন। স্থকুমারকে কিছুতেই তিনি কলকাতায় ফিরতে দেন নি। এতবড় শুভ সংবাদ বহন করে এনেছে যে নবীন দেবদূত আর এই সংঘটন ঘটেওচে যার পিতার চেষ্টায় ও পুত্রের কল্যাণে, তাকে কি তিনি একটু বড়রকম সম্বর্দ্ধনা না করে ছেড়ে দিতে পারেন? জামাই তাঁর পয়মন্ত হবে জেনে তিনি মনে মনে ভারী খুশী।

পূর্ণমনোরথ অলোকলতার ফুল্ল চিত্ত আজ প্রসন্ন-দাক্ষিণ্যে ভরে উঠেছে। পুরী থেকে মুঙ্গেরে ফেরবার পথে হরেনবাবুদেরও সপরিবারকে টেনে এনেছেন তিনি ভাগলপুরে। তাঁদের পুরীর গৃহে এতদিন আতিথ্য গ্রহণের ফলে সঞ্চিত শিষ্টাচারের ঋণ পরিশোধার্থে নয়, শাশ্বতীর বিয়ে দেবেন তিনি এই ফাল্গুনের প্রথম লগ্নেই। তাই আগে থেকেই আপনা-আপনি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই একে একে আনাচ্ছেন তিনি ভাগলপুরে। নিবারণবাবুদের বাড়ীতেও খবর এসেছে—ভাগলপুরে হাজির হবার জন্য, কিন্তু কি একটা বিশেষ কাজে ওঁদের যাওয়া এখনও ঘটে ওঠেনি।

স্থকুমার ভাগলপুরে এসে তার পিতা গোবিন্দপদবাবুর বাসাতেই উঠেছে। আলোকলতার একান্ত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও শাশ্বতীদের বাড়ী অতিথি হ'তে কিছুতেই সে রাজী হয়নি। তা কেমন করে হয়? আমাদের বাসা একটা রয়েছে যখন এখানে, আমি বরং প্রত্যহ দু বেলা আপনাদের এখানে খেয়ে যাব ইত্যাদি বলে সে আলোকলতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যকে এড়িয়েছে। আলোকলতা কিন্তু এটা অনুমোদন 'করতে পারেন নি! তাই অবিনাশবাবুর কাছে সেদিন তিনি অভিযোগ করছিলেন—জামাই হবে বাড়ীর ছেলের মতো নেটিপেটি, তা-না, এ যেন কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট কাটখোট্টা ভাব! কেমন যেন দূর-দূর, পর-পর, বিলেত থেকে ছেলেগুলো যেন কী একরকমের হয়ে আসে। 'কাকীমা'

'মাসিমা' এসব ডাক কেমন শোনায় ভালো। তা-না, ও ছেলে কিনা আমাকে বলে—'মিসেস্ ঘোষাল!' বড় বিশ্রী লাগে বাপু! এই ত মুখুজ্যে মশায়ের ছেলেরা শৈল, অজু, ওরা 'কাকিমা' বলে এসে দাঁড়ায়—কতো মিষ্টি লাগে!...

শৈলেন ছেলেটা ভাল। দেখতে শুনতে মন্দ নয়, স্বাস্থ্যও বেশ, লেখাপড়াও শিখেছে, কিন্তু বড় গোঁয়ার! কিছুতে এল না! বলে, শিকারে যাব—কাকীমা। আচ্ছা, বন্দুক ঘাড়ে করে শিকার করে বেড়ানো কি বামুনের ছেলের কাজ? বাপ নতুন বড়লোক হয়েছে—চাকরি-বাকরি যদি না করতে চাস একটা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যি কর। তা নয়, শুধু ছেলের দল নিয়ে 'স্বদেশী'র নামে হৈ হৈ করে বেড়ানো। ছোটলোকদের ভিতর কে মলো কে বাঁচলো, তোর সে খোঁজে কাজ কি বাপু? যতসব বস্তির কামার-কুমোর, ইতর-কামিন্ নিয়ে ওর কারবার। দেশ উদ্ধার করবে না গুষ্টির মাথা করবে। হরেন উকিলের তো ভাগলপুরের আদালতে রোজ সকালসন্ধ্যে হত্যে দিয়ে এক্কা ভাড়াও উঠতো না। মুঙ্গেরে গিয়ে যে ওর এমন বরাত খুলে গেছলো তা জানিনি। তুমি বলতে বটে মাঝে যে হরেনের মুঙ্গেরে খুব পসার হয়েছে। আমি মনে করতুম—বন্ধুর কদর বাড়াচ্ছো। কিন্তু এবার পুরী গিয়ে যা দেখে এলুম তাতে সত্যিই অবাক্ হয়েছি। বলে—মিলের মোটা শাড়ী পরে যে জন্ম কাটালে—সেই হিরণ্ময়ীকে দেখলুম এখন আটপৌরে কাপড় সিমলে ফরাশডাঙ্গা ছাড়া পরে না। গায়ে কী ভারী ভারী গয়না। চৌদ্দ ভরির চুড়ি, ষোল ভরির তাগা, বিশ ভরির হার। নাকে কানে বারোমাস হীরের নাকছাবি, হীরের টপ। অবস্থা একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে! খাওয়া-দাওয়াও খুব ভাল দেখলুম, দুধ ঘি মাছ মিষ্টান্নে ভাঁড়ার উথলে উঠছে। মা লক্ষ্মীর দয়া হ'লে এমনিই হয়। মুঙ্গেরে যথেষ্ট সম্পত্তি করেছে, কথায় কথায় সব বলে ফেললে। কলকাতায় বাড়ী, পুরীতে বাড়ী, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ—লোহার সিন্দুকে ধরে না। যা' করেছে—দুটো ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে। সুরমা-সুষমা—দুই মেয়েরও বলতে নেই ভালইত' বিয়ে দিয়েছে। আর আমার মেয়ে আছেন আজও থুবড়ি হয়ে বসে। ওরা তো দুজনেই আমার শাশ্বতীর চেয়ে বয়সে ছোট। বড় মেয়ের শুনলুম ছেলেপিলে হবে শীগগির। নাতির জন্য এখন থেকে রূপোর বাসন গড়াচ্ছে। সেকালের লোকেরা ছোট বেলায় মেয়ের বিয়ে কি আর সাধে দিত!

মেয়ে বড় হয়ে উঠলে নানান হাঙ্গামা! আমাদের মতো বিপদে পড়তে হবে না বলেই তাঁরা নিয়ম করেছিলেন 'শুভস্য শীঘ্রম্'!

অবিনাশবাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না—হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—তাই বুঝি তুমি মেয়ের বিয়ের আগেই—লোক খাওয়ানোর পালাটা সেরে রাখছো।

আলোকলতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—মেয়ের বিয়ের আগে কি রকম?—মেয়ের বিয়ে ত ওরা ফাল্গুন স্থির করে ফেলেছি। "আজ দুর্গার অধিবাস—কাল দুর্গার বিয়ে।" আমার ঐ এক মেয়ে। একটু সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নেব না?

—তা তুমি প্রাণভরে মিটিয়ে নাও, কিন্তু গোবিন্দপদবাবু যে লিখেছেন বিবাহটা যাতে কলকাতায় হয় এই তাঁর বিনীত অনুরোধ!

—না-না, সে হবে না। আমি সবাইকে ডেকে এনে ভাগলপুরে জড়ো করলুম আর উনি এখন ওখান থেকে কলকাতায় ছাদনাতলা বাঁধবার আব্দার করে পাঠিয়েছেন! তোমার হবু বেয়াইটি তো বড় ভয়ানক লোক।

অবিনাশ বললেন—যা-ই বলো ছোট বউ, সে ছেলের বাপ, আর আমরা হলুম কন্যাপক্ষ। তার এই বিনীত অনুরোধকে আমাদের কিন্তু অবশ্যপালনীয় আদেশরূপেই গ্রাহ্য করতে হবে।

আলোকলতা মুখটা একটু ভার করেই বললেন—মেয়ে দিচ্ছি বলে কি চোরদায়ে ধরা পড়ে গেছি নাকি? কলকাতায় গিয়ে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না। এমন কি দায় প'ড়েছে আমার।

অবিনাশ এবার যেন বেশ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—দায় একটা এর মধ্যে আছে বৈকি ছোট বউ। তবে, সেটা আমার দিক থেকে ঠিক 'কন্যাদায়' না হলেও কন্যার দিক থেকে তুমি একে 'পিতৃদায়' বলতে পারো। কারণ সবজজিয়তির দাম দিতে হ'চ্ছে আমাকে নয় আমার মেয়েকে—

আলোকলতা ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এরকম কথা বলছো কেন? হ্যাগা? সুকুমারকে কি তবে পাত্র হিসেবে তোমার মেয়ের অযোগ্য বলে মনে করো?

—আমি কিছুই মনে করিনি ছোট বউ। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ মানুষের হাতের বাইরে। ও যোগাযোগ যজ্ঞেশ্বরই ঘটান।

তাছাড়া, পাত্র যোগ্য কি অযোগ্য, সে বিচার বিবেচনার অবকাশ ত' তুমি দাওনি আমাকে, আর তার সময়ও এখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন যদি শাশ্বতী এসে কেঁদে পড়েও বলে যে—এ বিবাহে আমার মত নেই বাবা, আমি বলবো উপায় নেই মা, নিজের অমতেই তোমাকে এ বিয়ে করতে হবে।

আলোকলতা একথায় রাগে অভিমানে ফুলে উঠে বললেন—মেয়ে বুঝি একলা তোমারই? আমি তাকে পেটে ধরিনি, মানুষ করিনি? তার ভালমন্দ—তার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ সম্বন্ধে আমি বুঝি উদাসীন? তোমরা পুরুষ মানুষ, মেয়েদের কিসে ভালমন্দ হয় তার খবর তোমরা কি জান? বিশেষ করে তোমার মত স্নেহান্ধ বাপেরাই সব অন্যায় আদর দিয়ে মেয়েদের ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে করে দেয়। কিসে তার ভালমন্দ তোমার মেয়ে নিজেই তা বোঝে? বয়স হলে কি হবে, সাংসারিক বুদ্ধি ওর কতটুক। লেখাপড়া শিখলেই বুদ্ধিমান হওয়া যায় না।

—ঠিক বলেছো দিদি, লেখাপড়া শিখলেই বুদ্ধিমান হওয়া যায় না! আপনার এই দেওরটিকে বাজারে নিয়ে গিয়ে আমি আজ হাড়ে হাড়ে তা বুঝেছি। বলতে বলতে হিরণ্ময়ী এসে ঘরে ঢুকলেন। পিছু পিছু হরেনবাবুও স্ত্রীর কথার উত্তর দিতে দিতে এলেন—বুদ্ধিটাকে যাঁরা তাঁদের নিজেদেরই কেবল একচেটে সম্পত্তি বলে মনে করেন, আমি অবশ্য তাঁদের দলের নই এবং বিশ্বাস করি যে "বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন" শীর্ষক ঐ শ্রেণীর গ্রন্থাদিপাঠে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও উন্নত হলেও হতে পারে। যেমন ধরো ওঁর ছেলের বুদ্ধি—সেটা আগের চেয়ে একটু উন্নত হয়েছে বলতেই হবে। কারণ পার্লেকামেদীর রাজার সঙ্গে শুধু শিকার করে ঘুরে বেড়ায় নি—পাঁচশ টাকা মাইনেয় রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ নিয়েছে।

অবিনাশ হেসে বললেন শৈলেন বাবাজী তাহলে এতদিনে কাজে লাগলেন? ভাল কাজই নিয়েছে! একে বলে, সবুরে মেওয়া ফলা।—তারপর? কোথায় যাওয়া হয়েছিল যুগলে গাটছড়া বেঁধে? ভাগলপুরের সব পুরোনো বন্ধুমহল ঘুরে আসা হল না কি?

হরেনবাবু বললেন—পাগল হয়েছেন দাদা? প্রায় বারো আনা বেহার ঘুরে আসা হ'ল—ভালো জুয়েলার আর শাড়ীওয়ালার সন্ধানে। একটাকেও খুঁজে বার করতে পারা গেল না, হরেন তোমার হয়রান হয়ে ফিরে এল, কাজেই

তোমার বৌঠানের একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তি! বলে—শাশ্বতীর বিয়ের দিন যে এসে পড়লো, যাও কলকাতা গিয়ে ওর জন্যে একখানি বেশ ভাল ক্রেপ বা জর্জ্জেট শাড়ী আর একটা কিছু জড়োয়া গহনা নিয়ে এসো। শাশ্বতীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি নিবি মা? বেটী বললে আপনারা আশীর্ব্বাদ করে যা দেবেন কাকা-বাবু, তাই মাথা পেতে নেব।

শাশ্বতী এসে বললে—আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে—আসুন কাকাবাবু। কাকিমা, তোমাদেরও পাশের ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে। বসে পড়োগে, নইলে বড় রাত হয়ে যায়। বাবা, তুমি যেন কালকের মতো শুধু পুলওভার গায়ে দিয়ে খেতে যেওনা। আলোয়ানখানি গায়ে দিয়ে যেও। অজু ঘুমোলো কিনা দেখে আমি যাচ্ছি। মা, তুমি এঁদের নিয়ে যাও!

শাশ্বতী ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের মতই চলে গেল। হিরণ্ময়ী বললেন—ধন্য মেয়ে পেটে ধরেছিলে বোন্, একা এই সমস্ত ব্যাপার ওই মেয়ে কী সুন্দর সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চালাচ্ছে! আমরা কেউ টেরও পাচ্ছিনা যে ঘরবাড়ী ছেড়ে বিদেশে এসেছি বা বিয়ে বাড়ীর নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করছি।

—রক্ষে করো দিদি, ওঁর সামনে আর মেয়ের গুণপনার কথা বোলনা! এখন তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে চার হাতে এক হলে বাঁচি। চলো ভাই সব খাবে চলো।

আলোকলতা সকলকে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে চললেন।

চৌদ্দ

কিয়োঞ্জোরের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড বাঘ মেরে এসে কয়েকদিন হ'ল শৈলেন কটকে পার্লেকামেদীর মহারাজার অতিথি হয়ে রয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে নানা পোষ্টঅফিসের অসংখ্য ছাপ নিয়ে একখানা চিঠি সেদিন তার হাতে এসে পড়ল।

চিঠিখানা ভাগলপুর থেকে আসছে। পুরী, রতনগড, কিয়োঞ্জোর ঘুরে পত্রখানি এতদিনে কটকে এসে তাকে ধরেছে। চিঠিখানি খুলতে গিয়ে শৈলেনের হাত কেঁপে উঠলো। যেহাত কোনওদিন জঙ্গলের ভিতর বাঘের

সামনে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপে না—সামান্য একখানা চিঠির খাম খুলতে সে এমন থর থর করে কাঁপে কেন ?

ভাগলপুরের পোষ্টমার্ক দেখে শৈলেনের মনে হল, এ নিশ্চয়ই শাশ্বতীর চিঠি। সেদিন রাত্রের ঘটনা ভুলে যাবার জন্য সম্ভবতঃ মামুলি অনুরোধ এসেছে, ক্ষমা চাওয়ার কাঁদুনীও হয়ত আছে।

শৈলেনের অনুমান মিথ্যা নয়। চিঠি শাশ্বতীই তাকে লিখেছে, কিন্তু শৈলেন যা আশা করেছিল—চিঠির মধ্যে কোথাও তার উল্লেখ মাত্র নেই। আছে তাদের পারিবারিক আবর্ত্তের মধ্যে অকস্মাৎ সুকুমারের আবির্ভাবের সম্পূর্ণ ইতিহাস। তার ফলে শাশ্বতীর জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার অকপট স্বীকারোক্তি।

পিতার শেষ জীবনেব আকাঙ্ক্ষিত সার্থকতা, পারিবারিক সুখ শান্তি, নিজের আবাল্যের স্বপ্ন ও কামনা, প্রেমাস্পদের জীবনের পরম প্রীতি ও আনন্দ এবং আপন হৃদয়ের প্রিয়-মিলন-ব্যাকুলতা যুগপৎ তার বুকের ভিতর যে প্রলয়ের ঝড় তুলেছে, তাতে সে নিষ্পেষিত হয়ে পড়েছে। কোথায় আশ্রয় নেবে—কোন্‌দিকে পা বাড়াবে, কোন্‌টা ভাল কোনটা মন্দ, সে কিছুই স্থির করতে পারছে না। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চিত্তের সেই মর্মন্তুদ কাতরতা শৈলেনকে যেন অভিভূত করে ফেললে ! শাশ্বতীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় তার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠল।

শৈলেন উঠে গিয়ে তার শিকারে যাবার কোটের বুকপকেট থেকে শাশ্বতীর দেওয়া সেই অশোকগুচ্ছটি বার করে আনলে। নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ সেগুলির দিকে চেয়ে রইল। ফুলগুলি শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু তার রক্তরাগ তখনও পর্য্যন্ত ম্লান হয়নি। শৈলেনর সমস্ত মন যেন সেই অশোকের রক্তিম বর্ণে অরুণাভ হয়ে উঠল ! দুই চোখে তার ভাবাত্মক দৃষ্টি।

শাশ্বতীকে তার জীবনের এই জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্য শৈলেন আজ সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। চায়না সে তার নিজের জীবনের সুখ স্বার্থ ভালবাসা। সে চিরকুমার থাকবে। প্রসন্ন মনে সে শাশ্বতীকে পত্রের উত্তর দিতে বসল ঃ

সতী, নিজের মনের অবস্থা ভালকরে গুছিয়ে প্রকাশ করবার মতো সুললিত ভাষা যে আমার আয়ত্তের বাইরে, এ ত' তুমি ছেলেবেলা থেকেই জানো। তোমার

কাছে আমার যাকিছু অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা কিছুই গোপন নেই। তোমাকে যে আমি কতটা স্নেহ করি ও ভালবাসি একথা তুমি আমার চেয়েও বেশী জানো। তুমি আজ আমার পাশে থাকলে আমি নিজেকে যে পৃথিবীর লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুখী ও ভাগ্যবান বলে মনে করবো এতে আর কোনও ভুল নেই। কিন্তু, আমার জন্য তোমাকে যদি তোমার স্নেহময় পিতার মনে আঘাত দিতে হয় তাহলে কিন্তু, আমার দুঃখের আর লজ্জার অন্ত থাকবে না। তোমার পক্ষেও যে সেটা কতখানি বেদনাব ও মনস্তাপের কারণ হবে এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। সুতরাং আমি যেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছি আমাকে তেমনিই থাকতে দাও।

কাকাবাবুর সবজজিয়তির খবব নিজেই সে তোমাদের জানাবে বলে সুকুমার মধ্যে পুরী এসেছিল। আমি তার সঙ্গে এই সুযোগে সেই সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনের পুরোনো আলাপটা আবার নূতন করে ঝালিয়ে নিলুম। ছেলেটি বেশ নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা, আমার তো খুব ভাল লাগলো তাকে। আমার মনে হয় সুকুমাব তোমার অযোগ্য স্বামী হবে না। ঘনিষ্ঠভাবে তাকে চেনবার সুযোগ পেলে আমার বিশ্বাস তোমারও তাঁকে খুব ভাল লাগবে। সদ্য য়ুরোপ প্রত্যাগত বলে যে বিলিতী ঝাঁঝটুকু আছে এখনও, পরে তা থাকবে না। তাই বলছিলুম—মনকে দৃঢ় করো, যেটা অবশ্যম্ভাবী তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হও। সে তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। এইজন্যই বিশেষ করে তাকে আমার এত বেশী ভাল লেগেছে। তাছাড়া এটা তুমি নিশ্চয়ই মানবে বোধহয় যে, কৃতজ্ঞতার ঋণ মানুষের জীবনের খুব একটা বড় রকমের দায়িত্বপূর্ণ দেনা। তোমার পিতামাতা সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্য যদি তোমাকে সুকুমারের হাতেই তুলে দিতে চান, প্রতিবাদ কোরো না, ক্ষুণ্ণ হয়ো না। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য যদি নিজের জীবন বলি দিতে হয় তাতে তোমার মতো পিতৃভক্ত মেয়ের দ্বিধা করা উচিত নয়। আমার মুখচেয়ে এটা তুমি করতে প্রস্তুত নও, এ জেনেও এতবড় অন্যায় আমি তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না। আমার জন্য তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। সম্প্রতি পার্লেকামেদীর রাজা আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত করেছেন। রাজা বাহাদুর আমাকে উপস্থিত মাসে পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক এবং থাকা থাওয়া সমস্ত ষ্টেট থেকে ফ্রী দিচ্ছেন। সুন্দর কোয়ার্টারস্ পেয়েছি। সমস্তই সুবন্দোবস্ত, তবু মন বসছিল না কাজে। কিন্তু, তোমার এই

চিঠি পেয়ে আমি মনস্থির করে ফেললুম। আর ইতস্ততঃ করব না। উড়িষ্যার এই জঙ্গলেই আজন্ম থেকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন বরণ করে নিলুম। জীবিত অবস্থায় আর আমি বাংলাদেশে ফিরব না। সুতরাং আমাকে তুমি আজ থেকে মৃত বলেই মনে করতে পারো। ইতি—

চিঠি লেখা শেষ করে একটা যেন হাঁফ ছেড়ে শৈলেন এসে তার ক্যাম্পখাট-খানিতে শুয়ে পড়ল। জীবনে এই তার প্রথম একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

রাত্রি গভীর। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিশীথের গাঢ় অন্ধকার যেন থমথম করছে। শৈলেনের চোখে ঘুম নেই। নানা চিন্তা ভিড় করে এসে তার মাথার মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল। তার মনের ভিতর একটা ঘোরতর সংশয় ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। শাশ্বতীর পক্ষে সুকুমারকে বিবাহ ক'রে সুখী হওয়া কি সম্ভব? কে যেন কেবলই তার বিবেকের কানে কানে বলতে লাগল— শাশ্বতীকে এরকম চিঠি লেখা তোমার কখনই উচিত নয়। এ যেন মগ্নপ্রায় মানুষকে আরও গভীর জলে ঠেলে দেওয়া! তোমার কাছে আবেদন জানিয়েছে কি সে এই উপদেশ শোনবার জন্য? কেন তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় মেনে নেবে? তোমরা দু'জনে যখন পরস্পরকে ভালবাসো, তখন, সকল বাধা তুচ্ছ করে কেন তোমরা মিলিত হবে না?

হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র যেন ছিঁড়ে গেল। সে স্থির ক'রে ফেললে, নাঃ, এ কিছুতেই ঘটতে পারে না—আমি কালই ভাগলপুরে রওনা হবো।

এই স্থির ক'রে চিঠিখানা সে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললে, এবং পরম তৃপ্তিতেই বোধকরি ক্ষণিকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

পনেরো

লুপ মেল সবেমাত্র সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন ছেড়েছে, এমন সময় পাশের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে একটা আর্ত্তনাদ শুনে শৈলেনের ঘুম ভেঙে গেল।

তখনও রাত্রির অন্ধকার চারিদিক ঘিরে আছে, ভোরের বাতাস পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ উঁকি মারলেও কাকপক্ষীরা কেউ ওঠেনি। শেষ মাঘের কুহেলিকা-প্রভাত আলোককে আড়াল করে রয়েছে।

আবার ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। শৈলেন বিদ্যুদ্বেগে বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়ে চেন টেনে ধরল। গাড়ীর গতি কমতে না কমতেই সে সুদক্ষ টিকিট চেকারদের মতো তার নিজের গাড়ী থেকে ফুটবোর্ড ডিঙিয়ে অবলীলাক্রমে পাশের গাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো।

একজন বলিষ্ঠ পাঠান তখন গাড়ীর ভিতরের একমাত্র যাত্রী একটি তরুণীর কণ্ঠ থেকে ক্ষিপ্রহস্তে অলঙ্কার খুলে নিচ্ছিল। মেয়েটি দস্যুর সঙ্গে ধবস্তাধস্তি করছে আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো শৈলেন তার পিঠের উপর। একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে শৈলেনের কবল মুক্ত হয়ে লোকটা তাকে আক্রমণ করলে। শৈলেন তার জন্যও প্রস্তুত ছিল তাই মুহূর্তমধ্যে সে তাকে এমনি কাবু ক'রে ফেললে যে পাল্টা আক্রমণের আর তার কোন সুযোগ রইল না।

এদিকে বিপদের নিশানা ঘোষণা ক'রে গার্ডের হুইসল বেজে উঠল। পরক্ষণেই Bull's eye লণ্ঠন হাতে গার্ড এসে পৌছল সেই কামরার সামনে। আশেপাশের গাড়ী থেকে যাত্রীরাও কেউ কেউ নেমে এল। ষ্টেশনমাষ্টার, এ্যাসিসট্যাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার, রেলওয়ে পুলিশ, পোর্টার, কুলি—একে একে ভিড় জমে উঠলো।

ধৃত পাঠান ব্যস্ত হয়ে গার্ড সাহেবকে বললে—এই বাবু এই গাড়ীতে ঢুকে ঐ ঔরৎটিকে বেঈজ্জৎ করছিল হুজুর! আমি মেয়েটির গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে বাবুকে ধরেছি।

পাঠানের গালে সজোরে একটি চড় কষিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে—চুপরাও বদমাস!

শৈলেন ও মেয়েটির জবানবন্দী নিয়ে রেলওয়ে পুলিশ পাঠানকে ধরে নিয়ে গেল।

জবানবন্দীর মুখে জানা গেল মেয়েটির নাম রেবা। কলকাতা থেকে সে ভাগলপুরে যাচ্ছে তার মেসোমশাই অবিনাশ ঘোষাল সাবজজের বাড়ী। ছেলেটির পরিচয়ও মেয়েটি পেল।

গাড়ী ছাড়বার আগে শৈলেন বললে, একজায়গারই যখন যাত্রী আমরা, আপনি আসুন আমার গাড়ীতে, সে গাড়ীও খালি। ভোর হয়ে এল প্রায়—আশাকরি ভয় পাবেন না আমার সঙ্গে যেতে।

রেবা কোনও উত্তর দেবার আগেই তার স্যুটকেস বিছানা গুছিয়ে নিয়ে শৈলেন নেমে পড়ল। অগত্যা রেবা নিঃশব্দেই তার অনুসরণ করলে।

রেবাকে নিজের গাড়ীতে তুলে বিছানা করে দিয়ে আরামে বসিয়ে রেখে, শৈলেন চট করে গিয়ে দু'কাপ গরম চা নিয়ে এল। বললে, ঘুম তো আর হবে না, এখন আসুন বাকী পথটুকু চা খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।

ইতিমধ্যে গার্ডও তার কর্ত্তব্য সেরে ফিরে এসেছে। গাড়ীও ধীরে ধীরে চলতে সুরু করেছে।

গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে রেবা একটু মৃদু হেসে বললে—ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলুম! আপনি না এসে পড়লে, উঃ কী যে হ'ত!

—আপনার সাহস ত' কম নয়! রাত্রে একা একটা কম্পার্টমেণ্টে ট্রাভেল করা যে খুবই বিপজ্জনক, আপনি কি তা জানেন না?

—একা ত' ছিলুম না। বাবার এক বন্ধু সপরিবারে সাহেবগঞ্জ আসছিলেন, আমি তাঁদেরই সঙ্গে ছিলুম। তাঁরা সাহেবগঞ্জে নেমে যাওয়ার পর ভোররাত্রে যে এ বিপদ ঘটবে, কে জানে বলুন?

—আপনি কিন্তু বড্ড বুদ্ধি করে এবং সাহস করে গিয়ে লোকটার জামাটা চেপে ধরেছিলেন, নইলে ও তো আমার হাত ছাড়িয়ে একরকম পালিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান আমি একজন বীরাঙ্গনা—এইত?

—শুধু কি একা আপনাকে বলেই চুপ করবো, ভেবেছেন?—ভাগলপুরে পৌঁছে সবাইকে ডেকে একথা বলবো, ব'লে শৈলেন খুব হেসে উঠল।

—অর্থাৎ আপনি যে কী রকম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়ে আমাকে চলন্ত ট্রেনের কামরায় এক দস্যুর আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছেন, এইটে আমার মুখদিয়ে ভাগলপুরে প্রচার করতে চান তো? তা, সেজন্যে আপনাকে আমার বুদ্ধি ও সাহসের সপ্রশংস ঘুষ দেবার কোনও প্রয়োজন নেই, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি নিজেই তা সকলকে জানাবো। বাস্তবিক, এ একটা রোমাণ্টিক এ্যাডভেঞ্চার! এই নিয়ে একখানা বটতলার উপন্যাস লেখা হয়ে যেতে পারে!

—আমি হার মানছি আপনার কাছে। দোহাই, রেবা দেবী, আপনি

কাউকে কিছু বলবেন না এ সম্বন্ধে আর, আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমিও কাউকে কিছু বলবো না আপনার সম্বন্ধে।

—কিন্তু, মামলায় সাক্ষি দিতে যাবার সময় সবই তো জানাজানি হযে যাবে। আপনি যতটা বলবান ততটা বুদ্ধিমান নন দেখছি!

—শাশ্বতীও ওই কথা বলে! বুঝতে পারছি—কথাটা তার একটুও অত্যুক্তি নয়, কিন্তু, আমি নিষেধ করছিলুম কেন জানেন? ওই কৃতজ্ঞতার চাপে পড়ে তার দম বন্ধ হবার যোগাড় হযেছে, আবার আপনিও কি সেই বিপদে পড়বেন?

রেবা এবার উচ্চহাস্য কবে বললে—সে ভয আমার নেই। আপনি তো আর সুকুমারবাবু নন।

শৈলেন চমকে উঠে বললে—আপনি তাহ'লে সমস্তই জানেন?

—আপনার কি মনে হয়? যাক্‌, আমাকে যখন আপনি ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তখন আপনাকেও আমি সুকুমারবাবুর হাত থেকে রক্ষা ক'রে আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ একটুখানি শোধ দেবো।

শৈলেন বিস্মিত হয়ে রেবার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রেবা বলতে লাগল—আপনারা পুরুষমানুষরা সবাই বেশী স্থূলবুদ্ধি। ঐ যে বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ারটি, ওটি আজও বুঝতে পারছেন না যে শাশ্বতীর হৃদয় এমন এক অত্যুচ্চ শৈলচূড়ায আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে কোনও সুকুমার বা সুকঠোর আকর্ষণই তাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। আপনার মতো একজন শিকারী পুরুষও ঐ একই বিষয়ে এমনই অপৌরুষের পরিচয দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন যে আমাদের ইচ্ছা হয় আপনাকে কোনও নারীবর্জ্জিত দেশে নির্ব্বাসিত করে দিই।

—স্বীকার করলুম যে ওর চেয়ে কঠোর শাস্তি আমাদের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে সেকালের সুভদ্রা হরণের মতো একটা ব্যাপার করলেই আমার পক্ষে খুব পৌরুষের কাজ করা হ'তো? ত্যাগের মধ্যে কি পৌরুষ নেই, আত্মসংযমের কঠোরতায় কি বীর্য্য ও বলিষ্ঠতার পরিচয পাওয়া যায় না?

—না, যায় না। ওটা ভাবের ঘরে চুরি। নিজের অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার লজ্জাকে ঢাকবার ও একটা ছদ্ম-আবরণ মাত্র। মনকে চোখ ঠেরে নিজেদের সাহসের অভাবকে ত্যাগের মুখোস পরান আপনারা। সেকালই ছিল ভাল।

রুক্মিণী হরণ বা সুভদ্রা হরণের মধ্যে সুস্থ সবল মানুষের সহজ প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতার প্রমাণ পাই। কিন্তু, আপনারা কি বলুন ত? বনের বাঘ মারতে যান আপনারা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে, কিন্তু, সমাজের হিংস্রতাকে অবাধে ছেড়ে দেন অসহায় নর-নারীর জীবনকে চিরদিনের জন্য দুঃখময় করে। দেখুন, রাজনৈতিক ব্যাপারের কথা বলতে পারিনা, কিন্তু, জীবন-মরণ সমস্যার ক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ একেবারেই অচল।

—হয়ত আপনার কথাই ঠিক কিন্তু—

শৈলেনের কথা শেষ হবার আগেই ট্রেন ভাগলপুর ষ্টেশনে এসে পৌছালো।

—কুলি! কুলি!

লোক ওঠা-নামার ব্যস্ততা, যাত্রীদের কলরব ও ভিড়ের মধ্যে রেবার উৎসুক দৃষ্টি দেখতে পেল প্ল্যাটফর্মের উপর একধারে হিমাংশু, শাশ্বতী ও সুকুমার তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে; শৈলেনকে ডেকে বললে—ওঁরা আমাদের নিতে এসেছেন যে।

শৈলেন তার নিজের ও রেবার স্যুটকেস, হোল্ডঅল ও বন্দুক নিয়ে ট্রেন থেকে নামবার উপক্রম করতে করতে বললে—'আমাদের' বলবেন না, ওরা আপনাকেই নিতে এসেছে—কারণ, আমি কোনও খবর না দিয়েই এসেছি।

শৈলেনের পিছু পিছু রেবা গাড়ী থেকে খুচরো জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে বললে, কিন্তু, আমি জানি শৈলেনদা, একজনের হৃদয়দ্বারে আপনিই আজ সবার চেয়ে স্বাগত অতিথি।

রেবাকে দেখতে পেয়ে শাশ্বতী প্রায় ছুটেই আসছিল তার কাছে। সঙ্গে শৈলেনকে দেখে হঠাৎ সে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল! বিস্ময়-কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললে—তুমি!

উত্তর দিলে রেবা। বললে—হ্যা, উনি তোমাকে হারাবার ভয়ে ছুটে এসেছেন—আগলাতে।

শৈলেন স্মিতমুখে বললে—শুধু আগলাতে নয়—আমি এবার আমার পলাতকাকে তার আপন অধিকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

লজ্জায় উজ্জ্বল মুখখানি নত করে শাশ্বতী বললে—চুপ করো, দাদা আসছে। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে সেই প্ল্যাটফর্মের উপরই শৈলেনের পায়ে তার মাথাটা লুটিয়ে দিলে।

হিমাংশু এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি শৈলেনের হাত থেকে একটা স্যুটকেশ ও একটা হোল্ডঅল টেনে নিয়ে বললে—এ কি? দাদা যে! আরে এস এস। কিন্তু ব্যাপার কি তোমার?—ভাগলপুর ষ্টেশনের কুলিরা কি ষ্ট্রাইক্ করেছে?

সুকুমারও ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছিল। বললে—হ্যাঁ, যথেষ্ট কুলি রয়েছে ত শৈলেনবাবু! আপনি কেন ও গাধার বোঝা বইছেন?

শৈলেন হাসতে হাসতে বললে—যেহেতু আমি একটি আস্ত গাধা ব'লে! বিশ্বাস নাহয়, জিজ্ঞাসা করুন এই বুদ্ধিবরের এই দুই সাক্ষাৎ ভগ্নী রেবা দেবী ও শাশ্বতী দেবীকে!

রেবাকে একটি প্রীতিনমস্কার জানিয়ে সুকুমার বললে—আপনার প্রতীক্ষায় শাশ্বতী দেবী ত' প্রায় অধীর হয়ে উঠেছেন!

রেবা তার দীর্ঘায়ত চঞ্চল চোখের ভ্রূকুটি দৃষ্টি সুকুমারের দিকে ফিরিয়ে বললে—এ আর নূতন খবর কি দিলেন? খুশী হতুম যদি বোলতে পারতেন যে অমনিতর অধীর হয়েই প্রতীক্ষা করছে আমার জন্যে—ভাগলপুরে ঠিক্‌রে আসা কোনও সুপরিচিত কুমার।

রেবার উত্তর শুনে সকলেই খুব হেসে উঠলো। সুকুমার একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠবার সময় দেখা গেল, অবিনাশবাবুর ছোট্ট মোটরখানিতে ড্রাইভার ও মালপত্র নিয়ে মাত্র আর চারজনকে ধরতে পারে। একজনকে হেঁটে যেতে হয়।

শৈলেন, সুকুমার, হিমাংশু প্রত্যেকেই হেঁটে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু, রেবা বললে—শৈলেনদা যখন আমার বডিগার্ড হয়ে এতদূর এসেছেন, তখন ওঁকে গাড়ীতে আসতেই হবে, একযাত্রায় পৃথক ফল হ'তে পারে না।

হিমাংশু একরকম জোর করেই শৈলেনকে গাড়ীতে ঠেলে তুলে দিলে। বললে—ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের সঙ্গে আমিও হেঁটে যাচ্ছি, তোমরা এগোও।

সুকুমার বললে—পোষ্ট অফিসে আমার একটু কাজ আছে। আমি ঘুরে যাবো, হিমাংশুবাবু! আপনি ওঁদের সঙ্গে যান। নূতন অতিথির সম্মান আগে, আমি ত' পুরোনো হয়ে পড়েছি।

হিমাংশু বললে—শৈলেনদা' আবার অতিথি কিসের? উনি ত আমাদের

আপনার লোক ! ওঁরে চেয়ে আমাদের খাতির করা দরকার আপনাকেই বেশী। আপনি হলেন আবার বিশেষ করে মা'র অতিথি।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর শেষপর্য্যন্ত সুকুমারের জিদই বজায় রইল। সে কিছুতেই রাজী নয় দেখে ওরা চারজনেই চলে গেল।

ষোলো

রেবা ও শৈলেন আসবার দু'একদিন পরেই রেবার আগ্রহে ওরা ঠিক করেছিল মন্দার হিলে সকলে মিলে একদিন পিক্‌নিক্ করতে যাবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হৈ হৈ করে সকলে মিলে মন্দার হিলে হাজির হল। সারাদিন সেখানে রান্না খাওয়া, খেলাধূলা ও গল্প-গানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর সকলে ফিরে এলো।

সারাদিন রোদে থেকে মাথা ধরেছে বলে সুকুমার আর হিমাংশুদের বাড়ী বেশীক্ষণ বসতে চাইলে না। রেবা তাকে জোর করে ধ'রে রেখে এক কাপ চা খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

বাসায় এসে সুকুমার আর পোষাক না বদলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। দেহে মনে সে আজ অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছে।

এই কদিনেই সুকুমার একটা ব্যাপার বেশ সুস্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছে যে শাশ্বতীর হৃদয়ের সান্নিধ্যেও সে পৌছতে পারেনি। সেখানে সমস্ত স্থান জুড়ে বসে রয়েছে শৈলেন। শৈলেন আসার পর থেকেই শাশ্বতী যেন সহসা কোন্ সঞ্জীবন রসে উজ্জীবিত হ'যে উঠেছে। এর আগে সুকুমার তাকে দেখেছে নিতান্ত নিরানন্দভরা মনমরা মেয়ে ; হাসিতে প্রাণ নেই, আলাপে মধু নেই, কাজ করে চলেছে যেন কলের পুতুল !

যেটুকু সংশয়ের দোলা তার মনে একটু ক্ষীণ আশার সূত্র ঝুলিয়ে রেখেছিল, আজকের মন্দার হিলের পিক্‌নিক্ সে সূত্রকে শতছিন্ন করে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

আগের দিন বিকেলে ভাগলপুরের গঙ্গায় নৌকো নিয়ে বেড়াবার সময়

শাশ্বতী উঠেছিল শৈলেনের বোটে, হিমাংশু, সুকুমার আর রেবা ছিল অন্য বোটে। দুই নৌকোয় 'রেস' হয়েছিল। সুকুমারদের নৌকাখানা ওদের পিছনে ফেলে প্রায় যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, শৈলেন তখন সামনের দাঁড়িদের পিছনে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বসলো দু'হাতে দুই দাঁড় নিয়ে। শৈলেনের বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র পরিচালনায় ওদের নৌকো ছুটে চললো বিদ্যুদ্বেগে তর তর করে। সুকুমারদের নৌকো দেখতে দেখতে অনেক পিছিয়ে পড়ল। শাশ্বতীর তখন সে কি হাততালি দিয়ে হেসে ওঠা! আনন্দের বন্যা যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে! পরাজয়ের লজ্জা নিবারণের জন্য সুকুমারও উঠে যাচ্ছিল দাঁড় ধরতে, কিন্তু, রেবা ফস্ করে বলে বসল—বৃথা কেন পণ্ডশ্রম করবেন সুকুমারবাবু, ওদের নাগাল কি আপনি ধরতে পারবেন? যে বাতাসে ভর করে ওদের মনো-বিহঙ্গ উড়ে চলেছে আজ কল্পনার নীলাকাশে লঘু-পক্ষ বিস্তার করে—সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

কালকের ও কথাটার অর্থ সুকুমারের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হলেও আজকের বনভোজনের ব্যাপারে তার আর বুঝতে বাকী ছিল না যে শাশ্বতীর কাছে সে শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, রীতিমত অসহ্যও বটে। রেবা যদি এ পিক্‌নিকে না আসতো, সুকুমার নিতান্ত একা হয়ে পড়তো। হিমাংশু যে তাকে পছন্দ করে না, এটা সে জানে কিন্তু সে যে শৈলেনের এত বেশী অনুরাগী, এটা সে জানতে পারলে এই বনভোজনে এসে। ওরা তিনজনে পরস্পরকে নিয়ে সারাদিন এমনভাবে মস্‌গুল হয়ে রইল যে সুকুমার এখানে এসে একেবারে একপাশে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে পড়ল। তার এই একান্ত নিসঃঙ্গতার মধ্যে রেবাকে সে যেন মস্তবড় একটা আশ্রয় ও অবলম্বনস্বরূপ পেয়েছিল। আনন্দোচ্ছল রেবা—হাস্যময়ী, রহস্যা-লাপে নিপুণা, প্রাণ-চঞ্চলা এই তরুণীকে সুকুমার যেন আজ এই প্রথম ভাল করে চোখ মেলে দেখতে পেলে! এই কৌতুকময়ী জীবনদীপ্ত মেয়েটির পাশে লাজভীরু, সরম জড়িতা, স্বল্পভাষিণী শাশ্বতী যেন নির্জ্জীব এক মাটির প্রতিমা!

পুরুষের জীবনযজ্ঞে রেবা যেখানে প্রোজ্জ্বল হোমশিখা, শাশ্বতী সেখানে চন্দন ধূপের প্রশান্ত সুরভি। সুকুমার ওই সুরভিতে আকৃষ্ট হয়ে এক আলেয়ার পিছনে এতদিন ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার সেই মোহগ্রস্ত হৃদয়কে অকস্মাৎ আজ আলোকিত করে তুলেছে ঐ জীবন্ত হোমশিখা! সুকুমারের সমস্ত অন্তর ঐ অবছায়াময়ী ধূপের

ধোঁয়ার সুরভিত কুণ্ডলী হ'তে মুক্ত হয়ে সাগ্রহে ঝাঁপ দিতে চায় এই প্রদীপ্ত হোম-শিখার উজ্জ্বল আলোকে।

কিন্তু, সে কি আর সম্ভব! বৌদিকে দিয়ে সে তার বাবার মত করিয়েছে। মিসেস্ ঘোষালের প্রস্তাবেও সে মৌন সম্মতি জানিয়েছে, এঁরা বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করে ফেলেছেন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও কথাটা মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেছে, এ অবস্থায় আর পিছু ফেরা যায় কেমন করে?

সহসা অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ একটু আলোক রশ্মির মতো সুকুমারের মনে পড়ে গেল আসল মানুষটির সঙ্গে তো আজও কোনও আলোচনা করবার সুযোগ হয়নি তার এ পর্য্যন্ত! শাশ্বতীর সঙ্গে তো এখনও এ বিষয়ে তার খোলাখুলি কিছু আলাপ হয়নি! আলাপ করতে তার সাহসও হয়নি। বরাবরই আশঙ্কা ছিল প্রস্তাব করলেই তা না-মঞ্জুর হতে পারে। তাই সুকুমার চেয়েছিল আগে তাকে খুশী করে তার মনটি জয় করতে, তারপর সুযোগ বুঝে সে তার আবেদন পেশ করবে এমন এক মুহূর্ত্তে যখন 'না' বলা আর শাশ্বতীর পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু, সেই শুভ সুযোগটি এ পর্য্যন্ত আর আসেনি!

তবে আর বাধ্যবাধকতা কিসের? হ্যাঁ, সে চেষ্টা করেছিল বটে এ কথা সত্য, কিন্তু তখন তো সে শৈলেন সম্বন্ধে কোনও সংবাদই জানতো না। এখন যখন জানতে পেরেছে যে শাশ্বতীর হৃদয় তার হৃদয়-দেবতার উদ্দেশে নিবেদিতা, তখন আর এ প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য! বৌদি বার বার তাকে রেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু শাশ্বতীর কেমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাকে এদিকেই টেনে এনেছিল। শৈলেনের কথা বৌদিও হয়ত জানেন না! বৌদিকে সব জানালে কি হয়? এখনও সময় আছে। এই বেলা যদি strategic retreat করা যায় তাহলে অবশ্যম্ভাবী একটা tragic disaster থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে!

সুকুমার লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লো। অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটার সুইচ হাতড়ে জ্বেলে নিয়ে সুলতাকে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলে—

বৌদি, এ চিঠি পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!—এ পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস ঘটে যা অতি-বড় দার্শনিকও

কল্পনা করতে পারেন না। সত্যিসত্যিই, তরী আমার তীরে এসে বানচাল হয়ে গেল ! শাশ্বতীর হৃদয় উপকূলে নামতে এসে দেখি সেখানে স্থানাভাব। শুধু তাই নয়, অন্তরঙ্গতার অবকাশে প্রকাশ পেয়েছে, আমি যা দেখে ছুটেছিলুম তা মরীচিকা ! রেবার তীরে পৌঁছে তৃপ্তি পেয়েছি। এইখানেই তুমি আমার নীড় রচনার ব্যবস্থা করো। কালই আমি রেবার মত নিয়ে তোমাকে জানাবো। তখন বাবাকে বলে যা করবার কোরো। ইতি—

তোমার বিলিতী ঠাকুরপো—'সু'

সতেরো

কোথায যাচ্ছ গো দাদা ?

হিমাংশু বোধহয় শুনতে পেলে না, কিংবা ইচ্ছে ক'রেই শাশ্বতীর কথায় কান দিলে না। সে হন্তদন্ত হ'য়ে বারান্দাটা পার হ'য়ে নীচেয় নেমে যাচ্ছিল। শাশ্বতী ডাক দিলে : ও দাদা ! শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

হিমাংশু থম্‌কে দাঁড়াল। পিছু ডাক্‌লি তো ? নববি, তুই মর্‌বি, আমার কী ?

শাশ্বতী বারান্দায় ব'সে চা তৈরি ক'রছিল। কাছে গিয়ে হিমাংশু বললে : দে, এক কাপ চা ঢেলে দে, খেয়ে যাই।

শাশ্বতী তার মুখের পানে না চেয়েই বললে : তাইতো ডাকলুম। কী এমন রাজকার্য্যে যাচ্ছ যে, পিছু ডেকে কাজ পণ্ড ক'রে দিলুম।

চায়ের কাপটা হিমাংশুর হাতে তুলে দিতে দিতে তার হাতের পানে লক্ষ্য ক'রে শাশ্বতী বললে : ওঃ ! বুঝিচি, রাজকার্য্যই বটে ! সত্যি অন্যায় হয়েচে।

হিমাংশু হাতের চিঠিখানা পকেটে রেখে বললে : বুঝেচিস্‌ ? ইস্‌ ! কী বুঝ্‌লি ?

শাশ্বতী ভুরু কুঁচকে বললে : আবার মুখে বল্‌তে হবে, মনে বুঝেই দেখ না কী রাজকার্য্যে চলেচো—

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হিমাংশু বললে : ও সব চালাকি রাখ্। তুই কী বুঝ্লি তাই বল্না—

আমি যা বুঝেচি আমার মন জানে। আর তুমিও হাড়ে হাড়ে বুঝেচো, আমি কি বুঝেচি।

তুমি ছাই বুঝেচো। কিচ্ছু বোঝনি। তুমি ভাব্চো মিসেস্ সৎপন্থীকে প্রেমের কবিতা পাঠাচ্চি থামে ভ'রে—

শাশ্বতী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল : এই তো সবই বুঝেচো দাদা! ঢোঁক গিল্লে হবে কী?

রট্! কিচ্ছু বোঝ'নি। এ তার চেয়েও ঢের সিরিয়স্, ঢের ইম্পরট্যাণ্ট।

কী রকম? শাশ্বতী ভ্রূকুটি ক'রে তার পানে তাকালো।

হিমাংশু বেশ গম্ভীর হ'য়ে বললে, এইবার তোমার গুমোর ভাঙ্বো। তোমার বড় অহঙ্কার! মনে ভাবো একাই তুমি চিরদিন বাবার হট্ ফেভারিট হ'য়ে থাক্বে। সে দফায় গয়া। এখন শ্রীমান্ হিমাংশু হ'চ্চে বাবার কিপার অব কন্‌সেন্স, সেখানে আর দাঁত ফোটাবার জো'টি নেই। এখন বাবা আমায় পুরো-দস্তুর কন্‌ফিডেন্সে নিয়েচেন।

শাশ্বতী হেসে উঠল। বললে, সত্যি নাকি? তুমি একটু মানুষের মতো হ'লে তো বাঁচি। বাবাও হাঁফ ছাড়তে পারেন।

হিমাংশু বললে, আর সে কথা তোকে বলতে হবে না। আমি এখন শুধু কবি নই। সংসারের জীব। কাব্য-জগৎ থেকে নেমে এসেচি কঠিন বাস্তবে—কিন্তু কেন জানিস্? শুধু তোর জন্যে।

তা আমি জানি। তুমি আমায় খুব ভালোবাসো। পোড়ারমুখী ভিন্ন ডাকতেই জানো না। তুমি একটু বসো, আমি এসে সব শুনবো। কাকীমাকে আর মাকে চা-টা দিয়ে আসি। ওঁরা গঙ্গাস্নান থেকে ফিরেচেন।

শাশ্বতী ফিরে এসে দেখলে, চিঠিখানা হাতে নিয়ে হিমাংশু উলটে-পালটে দেখচে। শাশ্বতীকে সেখানা দেখিয়ে হিমাংশু বললে, দেখেচিস কার হাতের লেখা?

শাশ্বতী বললে : বাবার লেখা, কেন?

হিমাংশু চিঠিখানা পকেটে রাখতে রাখতে বললে, না। এখন বলবো না। ষ্ট্রিক্ট্‌লি কনফিডেনসিয়াল। পরে জানতে পারবি।

হিমাংশু উঠে দাঁড়াল।

শাশ্বতীর কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠল। বাবা চিঠি লিখচেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেবকে। কেন? মাঝের ক'টা দিন পরেই তাঁর জয়েন করবার দিন। তবে কী? তবে কী তার বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে ছুটির দরখাস্ত করচেন? শাশ্বতীর বুকের নীচেটা আগ্রহে কাঁপচে, সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্কের ছায়া নেমেচে। সে সহসা হিমাংশুর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, বলবে না? আমায় বলবে না, দাদা?

শাশ্বতীর কণ্ঠে অনুনয়ের করুণ সুর। হিমাংশুর মনে মায়া জাগলো। সে শাশ্বতীর মাথায় হাত রেখে হাসতে হাসতে বললে: ওরে না, এখন নয়। পরে সব জানতে পারবি। তবে ভয় পাবার কিছু নেই এর মধ্যে। তোরই জীবনযাত্রার পথটিকে জয়যুক্ত ক'রে তোলবার আয়োজন হ'চ্চে। এর বেশী আর আমি এখন বলতে পারবো না।

শাশ্বতী কাঁদ কাঁদ হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। বেশ যাও, বল্‌তে হবে না। পারিতো বাবার কাছেই জেনে নোব।

হিমাংশু বললে, রাগ করিস নি শাশ্বতী, তুই বুঝতে পারচিস নি, এ কথা মায়ের কানে উঠলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে, বিশেষ এই সময়। বাড়ীতে এক-বাড়ী কুটুম।

তুমি কী ভাবো সে বুদ্ধিটুকুও আমার নেই? আমি যাবো মাকে বল্‌তে? বাবাকে তাঁর নির্য্যাতনের হাতে তুলে দেবার জন্যে?

হিমাংশু চুপ করে রইল।

শাশ্বতী বললে, অথচ তুমি জানো, বাবা কোন কথা আমার কাছে গোপন রাখেন না। সময় পেলেই নিজে হ'তে আমায় ডেকে ব'লবেন।

তা আমি জানি। কিন্তু তফাৎ এই, আগেকার দিনের মতো সব কথা তোমায় একা বলেন না—আগে বলেন এই হিমাংশুকুমারকে। হিমাংশু গম্ভীর-ভাবে ঘাড় নাড়লে।

সেই গুমোরেই তুমি গেলে। ইস! ভারী তো! না বল্‌বে না বল্‌বে। যাও বলতে হবে না। খোসামোদ করলে তোমার গুমোর বেড়ে যায়।

হিমাংশু বললে, আগে যেতো বটে! কিন্তু এখন আর যায় না, কেন বল্‌তো

শাশ্বতী ? বরং এখন তোকে সব কথা বলতে না পারলে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। তোর পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করতে আমার প্রাণ চায় না। কেন রে ?

হিমাংশু শাশ্বতীকে কাছে টেনে নিল। শাশ্বতী তার বুকের কাছে মাথাটি রেখে গলার আলগা বোতামটা নাড়তে নাড়তে সকৌতুকে বললে : এখন তুমি বুঝতে পেরেছ যে তোমার চেয়ে বুদ্ধিটা আমার ধারালো এবং সেটা তুমি মানো।

দূর পোড়ামুখি ! ছাই !

মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে হাসতে শাশ্বতী জিজ্ঞেস করলে, তবে ?

হিমাংশু একটু ভেবে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, এ হ'চ্চে ছোটর প্রতি বড়র মমতা বা অনুকম্পা। ছোটর শুক্‌নো ম্লান মুখ দেখলে বড়র মনে আঘাত লাগে। তার ওপর—

হিমাংশু হঠাৎ থেমে একবার চারিদিকে তাকালো।

শাশ্বতী সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করলে : তার ওপর ?

হিমাংশু চাপা গলায় উত্তর দিল : তার ওপর তুই নিগৃহীতা, প্রপীড়িতা। বাবাকে সমর্থন করার জন্যে তোর নির্য্যাতনের অন্ত নেই। তোর জীবন ব্যর্থ হ'তে ব'সেচে।

শাশ্বতীর মুখখানা হঠাৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল। উদ্গত অশ্রুতে চোখদুটি ছল্‌ছলিয়ে এলো।

হিমাংশু তার বিস্রস্ত চুলের মাঝে আঙুল ডুবিয়ে বললে : কিন্তু তা হ'তে দোব না। কিছুতেই তা হবে না। তুই কিচ্ছু ভাবিস্ নি, শাশ্বতী। তোর মতো মেয়ে ঐ কাঠখোট্টা, হাম্‌বাগ্ সুকুমারের জন্যে তৈরি হয়নি। বাবা তোকে সেভাবে মানুষ করেননি। তুই হবি খাঁটি বাঙালীর আদর্শ বধূ ও গৃহিণী।

শাশ্বতী নিঃশব্দে মুখ নীচু করে দাদার জামার বোতাম খুঁটতে লাগল—তার চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

হিমাংশু বললে, ছিঃ ! কাঁদচিস্ কেন শাশ্বতী ? তুই কী ভেবেচিস্ আমাদের বাবা গোবিন্দপদ মুখুজ্যের দয়ার দান মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নেবে ? ফুঃ ! মনেও ঠাঁই দিস্‌নি।

শাশ্বতী আগ্রহকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তবে কা বাবা আর 'জয়েন' করবেন না ?

হিমাংশু একবার এদিক্ ওদিক্ চেয়ে নিম্ন অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে: না, না,—কথ্খনো না। অবিনাশ ঘোষাল একটা মানুষের মতন মানুষ, সাধারণের মাঝে অসাধারণ। যে উচ্ছিষ্ট একবার তিনি ফেলে দিয়েচেন, সে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নেবার মানুষ অবিনাশ ঘোষাল নয়। এ তোকে আমি ব'লে রাখলুম।

তা আমি জানি দাদা—কিন্তু—

হিমাংশু বাধা দিয়ে বললে, তার ওপর নিজের কোনো স্বার্থের বিনিময়ে মেয়েকে বলি দেবার লোক আমাদের বাবা নয়।

আমাদের বাবা দেবতা সে কথা জানতে আমার বাকা নেই। কিন্তু সত্যিই কী তিনি 'জয়েন' করবেন না বলে জজ সাহেবকে চিঠি লিখচেন?

শাশ্বতী ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি দিযে হিমাংশুর পানে চাইল। হিমাংশু বললে: হ্যাঁরে সত্যি। একেবারে প্রত্যক্ষ সত্যি, দিনের আলোর মতো সত্যি, প্রেম ও মৃত্যুর মতো সত্যি! চিঠি তো দেখ্লি—

কিন্তু—শাশ্বতীর গলা কেঁপে উঠলো।

হিমাংশু বললে, কিন্তু একথা যেন কারুর কাছে কোনরকমে বেফাঁস না হয়। হুঁসিয়ার!

হিমাংশু আস্ফালন ক'রে হাত মুখ নেড়ে বললে: অবিনাশ ঘোষালের মুরুব্বি হবে গোবিন্দ মুখুজ্যে, ইস, আস্পর্দ্ধার কথা শোনো দিকি! আর তারি জন্যে তার ঘরে মেয়ে দিতে হবে। ধিক্! অবিনাশ ঘোষাল যে মেয়ে বেচে না—এই কথাটা কান ধ'রে ওদের শিখিয়ে দিতে হবে।

দু'জনেই এম্নি আত্মমগ্ন যে এটা জানতেই পারলে না যে শৈলেন এসে পাশে দাঁড়িয়েচে।

কার কান ধ'রে কী শেখাচ্ছিস রে হিমাংশু।

দু'জনেই সচকিত হ'য়ে তার মুখের পানে চাইল। হিমাংশু নিজের উত্তেজনার সুরে মগ্ন হ'য়ে বলে উঠলো, বলোতো শৈলেনদা, এ অন্যায় নয়?—

হঠাৎ শাশ্বতীর মুখের পানে চেয়ে সে থেমে গেল। বললে, থাক্গে—এ 'কন্‌ফিডেনসিয়াল'।

শাশ্বতী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। শৈলেন বললে, পাগল!

শাশ্বতী বোধ হয় প্রসঙ্গটার মোড় ফেরাবার উদ্দেশ্যে বললে, কোথায় যে ভোর

হ'তে ঘুরে বেড়াচ্চো শৈলেনদা', এতটা বেলা হলো, চা-টুকু পর্য্যন্ত পেটে পড়ল না।

শৈলেন হাসিতে মুখ ভরে বললে : দেবীর করুণা থাক্‌লে এখনো পড়তে পারে—তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

শাশ্বতী ভ্রূকুটি করে বললে : দেবীর করুণার অন্ত নেই—সকাল হ'তে তিনবার চা হ'য়েচে। কী রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন জান্‌তে পারি কী?

শৈলেন হাসলে। বললে, অসংখ্য প্রাণীহত্যা ও রক্তপাত! রাত্রের ডিনারের ব্যবস্থাটা বোধ হয় ভালো রকমই হবে এবং তোমাকে একটু মনোযোগ দিতে হবে সেগুলোর সদ্গতির ব্যবস্থায়। অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ স্নাইপ আর দুজোড়া মাণিকজোড়।

বিস্মিত ব্যথাতুর দৃষ্টি তুলে শাশ্বতী জিজ্ঞেস করলে : সে কী, কোথা?

শৈলেন বললে : নীচে বৈঠকখানার ঘরে।

শাশ্বতী চায়ের বাটিটা শৈলেনের হাতে দিয়ে রাগতস্বরে বললে, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই এতগুলো প্রাণীবধ ক'রে এলে? অনর্থক রক্তপাত করে কী আনন্দ পাও বলতে পারো?

শৈলেন চা খেতে খেতে শাশ্বতীর পানে তাকালো। শাশ্বতীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হ'য়ে উঠেছে, সলজ্জ অধরে বিদ্যুৎরেখা, অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গীতে সে তাকে তিরস্কার করছে।

শৈলেন মুখ ফিরিয়ে নিল। হিমাংশু বললে, একটু কাজে যাচ্চি শৈলেনদা, তুমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করো। আমি এসে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবো।

শৈলেন প্রশ্ন করলে, কাজটা কী জানতে পারি না?

হিমাংশু একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলে না, যেতে যেতে বললে, ধীরে বন্ধু, ধীরে!—সময় হ'লেই জানতে পারবে।

হিমাংশু এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো দু পা' পিছিয়ে এসে। তার সামনে এসে দাঁড়াল, আলোকলতা—সঙ্গে হিরণ্ময়ী!

শোন্ হিমু—এই যে শৈলেনও রয়েচো—কোথায় ছিলে বাবা সারা সকাল, মায়েরা খুঁজে খুঁজে সারা—ছেলেদের কিন্তু মায়ের কথা মনেই থাকে না—

হিরণ্ময়ী হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় পাখী পকাৰী মেরে বেড়াচ্ছিল জিজ্ঞেস করো, কতোদিন পরে ভাগলপুরে এসেছে—রক্ষে আছে -

শাশ্বতী বললে, নীচে গিয়ে একবার দেখে এসোনা কাকীমা, এক ঝাঁকা পাখী মেরে এনে হাজির ক'রেচে। হুকুম হচ্চে আমায় রাঁধতে হবে। রাত্রে ওঁদের ভোজ হবে।

আলোকলতা চোখদুটি বিস্ফারিত করে বললেন, ওমা, সত্যি! এ কী বাই বল্‌তো তোর শৈলেন, বামুনের ছেলে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে এই জীবহিংসে!

হিরণ্ময়ী বললেন, বামুনের ছেলে না ছাই। একটা আস্ত ডাকাত।

শৈলেন মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, আমার বাবা খাঁটি বামুন, জানলেন জেঠাইমা, তবে আমার মায়ের বাপের জাতের খবর জানি না।

সকলে হেসে উঠলো।

হিরণ্ময়ী কৃত্রিম রাগের ভঙ্গীতে শৈলেনকে ধমক দিলেন, আঃ গেল! যতোবড় মুখ নয় ততবড় কথা। আমার বাপের জাতের খবর রাখো না। আমার বাপ ছিলেন মহামহোপাধ্যায়।

শৈলেন ভুরু কুঁচকে মায়ের পানে চাইল।

শাশ্বতী বললে: আমি কিন্তু পাখী পকালী রাঁধতে পারব না।

হিমাংশু বললে, ইস্! বললেই হলো পারব না। বিলেত-ফেরত বিয়ে ক'রে মেমসাব হবে, আর পাখী রাঁধতে পারবে না?

শাশ্বতী প্রতিবাদের মিহিস্বরে বললে, দেখছো তো মা, আমার সঙ্গে লাগতে এলো। ভালো হবে না কিন্তু দাদা!

হিমাংশু মুখ ভেংচে বললে: যেখানে যাচ্চো কত কী রাঁধতে হবে দেখো।

আলোকলতা বললেন, দায় পড়েচে ওর। ও কেন রাঁধতে যাবে? বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার, প্রথমেই চারশো টাকা মাইনে, তোর মতো তো লক্ষ্মীছাড়া নয়। কী বলো বাবা, শৈলেন?

শৈলেনের মুখখানা কিন্তু আরক্ত হয়ে উঠল, আবহাওয়াটা যেন তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল। সে না পারলো প্রাণখুলে তাদের রহস্যালাপে যোগ দিতে, না পারলো শাশ্বতীর মুখের পানে মুখ তুলে চাইতে।

হিমাংশু বললে, রামায়ণের যুগে কে সব চেয়ে বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিল জানিস, শাশ্বতী?

কে?

যে লঙ্কার সেতু বেঁধেছিল।

আলোকলতা ধমক দিলেন, থাম্ মুখপোড়া!

শৈলেন ছাড়া একসঙ্গে সকলে হেসে উঠলো।

হিমাংশু বললে: আমি চললুম শৈলেনদা, জরুরী কাজ রয়েচে।

আলোকলতা বললেন, সুকুমারের খবরটা অমনি নিয়ে আসিস। সকাল থেকে তো তার টিকিটি দেখতে পাইনি।

হিমাংশু যেতে যেতে বললে: তার খবর আন্‌তে হয় শাশ্বতী যাবে, আমার ব'য়ে গেছে—

হিমাংশু বেরিয়ে গেল।

আলোকলতা শৈলেনকে বললেন, এ ক'টা দিন আর তোমার যাওয়া হবে না বাবা। একেবারে বোনের বিয়ে সেরে তবে যেতে পাবে।

শৈলেন আড়চোখে শাশ্বতীর পানে তাকালে। শাশ্বতী মুখ নীচু ক'রে পান সাজছে। কাঁধের ওপর এলোখোঁপাটা দোল খাচ্ছে। অনাবৃত একখানি হাত স্বচ্ছন্দ গতিতে নামছে। শৈলেন তার মুখ দেখতে পেল না, না হ'লে দেখতে পেতো তার মুখে নেমেছে শ্রাবণ সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া, চোখদুটি জলে ভাসচে, সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বষণ হচ্ছে।

শৈলেন আড়ষ্টের মতো সসঙ্কোচে বললে: কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, জেঠাইমা। আমায় যেতেই হবে। তবে আমি ব'লে যাচ্ছি, বিয়ের রাতে যেমন ক'রে হোক এসে পৌছব।

আলোকলতা চোখদুটি কপালে তুলে বললেন, তা হ'লে করবে কে রে? হিমাংশুটা তো মানুষই নয়। আমি যে তোমার ভরসাই করি বাবা! আর আমার পাঁচটা নয়, ঐ একটা। সাধ আহ্লাদ তো আছে।

শৈলেনের মনে হলো যেন চকিতে শাশ্বতা একবার তার পানে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল।

শৈলেন বললে: কিন্তু আমার যে কোন উপায় নেই, জেঠাইমা—

আলোকলতা মাথা নেড়ে বললেন, না ব.ছা তা বললে চলবে না। তোমাকে

আমি ছাড়তে পারবো না। তোমার মাকে বাবাকে এনে আটকে রাখলুম আর তুমি যাবে চলে ?

তা যাবে বৈকি পিসীমা। উনি হ'চ্চেন উড়ে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। উনি কি কম লোক ? তার ওপর একজন বীরপুরুষ, শিকারী—রেবা এসে তাদেব সামনে দাঁড়াল।

শৈলেন ভুরু বাঁকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমি বীরপুরুষ কিনা জানি না রেবা দেবী, তবে আমি যে পুরুষ সে-কথা অস্বীকার করতে পাবেন না আপনি—সাহেবগঞ্জে তার প্রমাণ পেয়েচেন।

রেবা কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বললে: তাই তো আমি আশ্চর্য্য হ'যে যাচ্চি। আপনি কেন এমন কাপুরুষের মতো পালিযে যাবেন ?

পালিয়ে যাবো ? শৈলেন বিস্ময়ের আতিশয্যে রেবার পানে তাকালে।

রেবা বললে : পালানো নয়তো কী ? মনকে চোখ ঠারায় লাভ কী শৈলেনদা ?

শাশ্বতী হঠাৎ কাজ ছেড়ে ধড়ফড় ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার এলো খোঁপাটা আঁটতে আঁটতে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। রেবা হাসি চাপ বার আপ্রাণ চেষ্টায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

আলোকলতা যেতে যেতে বললে, মাঝে আর ক'টা দিন—এ ক'টা দিন তুমি কিন্তু থেকে যাবার ব্যবস্থা করো, শৈলেন। নইলে আমি রাগ করবো।

হিরণ্ময়ী বললেন, তাই না হয় কর্, শৈলেন।

হিরণ্ময়ী ও আলোকলতা চ'লে গেলে রেবা প্রাণ ভ'রে খুব খানিক হেসে নিল। শৈলেন বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর হ'য়ে রেবা বললে : এমন কিছু অপবাদ দেওয়া হয়নি আপনার নামে যে, এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

অপবাদ নয় রেবা! কিন্তু তোমার লক্ষ্য বস্তুকে না বিঁধে বিঁধলো যে আর এক জনের পাঁজরে। তার যাতনার কথা ভেবেই আমি অধীর হ'য়ে উঠ্‌চি। এ কী করলে তুমি ?

রেবা কি ভেবে বিমর্ষ হ'য়ে বললে : সত্যি। চলুন শাশ্বতীদি'কে ধ'রে আনি।

শৈলেন কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে : না রেবা, কাজ নেই। আমার মনে হচ্ছে কি জানো রেবা, এখানে আমার না থাকাই ছিল ভালো। এ যেন ভারী কদর্য্য, ভারী বিশ্রী ঠেকছে। এঁরা এতদূর এগিয়েচেন যে এখন আর ফিরিয়ে আনা চলে না। এই হয়তো শাশ্বতীর নিয়তি! আমি কেন স্নকুমার-বাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। না না, আমি পারবো না, রেবা। এ ভারী লজ্জাকর ব্যাপার, ভারী জঘন্য। আমি আজই ফিরে যাবো!

রেবা হঠাৎ মাথা উঁচু ক'রে উদ্ধত স্বরে বললে, সাধে বল্‌ছিলুম কাপুরুষ!

শৈলেন সহসা অবরুদ্ধ কণ্ঠে রেবার একখানা হাত ধরে বললে : আমি কাপুরুষ রেবা। আমি পারবো না, পারবো না প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, পারবো না দেহের শক্তি দেখিয়ে স্নকুমারের কাছ থেকে শাশ্বতীকে ছিনিয়ে নিতে— পারবো না আমি তার বাবার সর্ব্বনাশ করতে।

রেবা একটু দূরে সরে গিয়ে বিষাক্ত স্বরে বললে, তাই যাও, তুমি ফিরে যাও। তোমরা পুরুষ, তোমরা পারো ওকে এমনি ভাবে ভাসিয়ে দিতে। আমি কিন্তু যাবো না, আমি পারবো না। আমি প্রাণ থাকতে ওর জীবনকে এমনভাবে ব্যর্থ হ'তে দেব না। ওকে ওর লজ্জা থেকে, অবসাদ থেকে উদ্ধার করবো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বাঁচাবো।

আঠারো

মানুষের মন আয়না নয় যে যতক্ষণ সাম্‌নে মানুষ থাক্‌বে ততক্ষণই তার প্রতিবিম্ব বুকে ধ'রে সে হাস্‌বে, আবার মানুষ সরে গেলেই ছায়া যাবে মুছে। মানুষের সচেতন মন কিন্তু ছায়াকে সবলে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, বস্তু সরে গেলেও। বস্তু দূরে গেলেও ছায়াই হয়ে ওঠে অমর; বস্তুর বিলোপ হয়, ছায়ার বিলোপ ঘটে না কোনদিন। স্নকুমারের মনের মাঝে যে শাশ্বতীর ছায়া পড়েছিল গাঢ় হ'য়ে সে-

কথা অস্বীকার করা চলে না। শাশ্বতীকে প্রথম দেখার পর থেকেই সে ছায়া তার মনের মাঝে প্রসার লাভ করেছে আর সুকুমার তাকে প্রশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তার মূলে জলসেচন করেছে। শাশ্বতীর কাছে সে হয়তো প্রশ্রয় পায়নি কোন-দিনই কিন্তু দুর্লভের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েচে। শাশ্বতী যতই তাকে দুরাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে, আকর্ষণ কিন্তু ততই প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে, তার যৌবন-ধর্ম্ম ততই তার প্রতি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে।

সে-রাত্রে সুলতাকে চিঠি লেখা শেষ ক'রে সুকুমার অন্ধকার ঘরের মাঝে চোখ বুজে শাশ্বতীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকে সমস্ত ঘনিষ্ঠতাকে একবার তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে নিল। সে বেশ অনুভব করলে পুরী যাবার আগে পর্য্যন্ত শাশ্বতীর নিজের দিক থেকে তেমন আগ্রহ না থাকলেও তাকে পাওয়া তার পক্ষে এমন কিছু বাধা ছিল না। হঠাৎ কোথা হ'তে ধূমকেতুর মত শৈলেন তাদের জীবন-আকাশে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে উদয় হলো। পুরীর সমুদ্রতলে শাশ্বতী তার সমস্ত স্মৃতি ভাসিয়ে দিয়ে এলো। কিন্তু তবু কী সুকুমার নিশ্চেষ্ট ছিল! শাশ্বতীকে পাবার আশা কী সে ত্যাগ করতে পারলো! না, না। কী আপ্রাণ চেষ্টাই সে করেছে! কোথায় পুরী, কোথায় ভাগলপুর,, কোথায় সুলতা, কোথায় আলোকলতা, এমন কি বাবাকে পর্য্যন্ত টান্‌তে হয়েচে এই ব্যাপারে! শেষে যখন জয় নিশ্চিত, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দুর্গদ্বারে এসে সে ফিরে যাবে শুধু দ্বার বন্ধ ব'লে? রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয় কিনা, পরীক্ষা না ক'রেই সে ফিরে যাবে? আশ্চর্য্য! দ্বার খোল্‌বার চেষ্টা-পর্য্যন্ত সে করবে না? এতদূর অগ্রসর হ'য়ে তার সামনে না গিয়েই, তার মুখ থেকে কোন কিছু না শুনেই সে ফিরে যাবে? তাও কী সম্ভব! কী প্রয়োজন ছিল তবে আকাশ-পাতাল ধ'রে ছুটাছুটি করবার? সে যে ধরা দেবে না, এ কথা কে তাকে বুঝিয়ে দিল? আসল মানুষটির মনের পরিচয় না পেয়ে এম্‌নি ভাবে ফিরে যাওয়া নিছক নির্ব্বুদ্ধিতা! তার বিলেতী শিক্ষা এ কথায় সায় দিল না। তার মত রূপবান ও শিক্ষিত তরুণের কাছে কোন নারীই দুর্লভ নয়। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই সে বিলেত থেকে লাভ ক'রে এসেছে। নারী দুষ্প্রাপ্যও নয়, নারীমন অজেয় দুর্গও নয়। কলাকৌশল জানা থাকলে, নিঃশব্দে অগ্রসর হ'লেই সেখানে পৌঁছানো এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। তবে ধৈর্য্য থাকা চাই! একদিন সে আঙুরকে টক্ ব'লে মনকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। আজ কিন্তু আর

আঙুরের প্রতি তার দুর্ব্বার লোভ তাকে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে দিল না। টক্ ব'লে মনকে আঁখি ঠারার দিন আর নেই। হঠাৎ তার মনে হলো শাশ্বতী তার অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেচে। শাশ্বতীর চিন্তা রোমাঞ্চকর। রেবা সেখানে নিতান্ত অচল। সে শূন্যতা পূর্ণ করবার কোন সঙ্গতি রেবার নেই। রেবাকে তার ভালো লাগে শুধু সে শাশ্বতীর বোন্ ব'লে, শাশ্বতীর নিকটতম আত্মীয় ব'লে। অন্তরটাকে নাড়াচাড়া ক'রে এই কথাই তাব বারবার মনে হলো। রেবার চপলতা তার অন্তরের উদ্দীপনা নেভাতে পারবে না, কিছুতেই না! তাকে ডুব দিতে হবে শাশ্বতীর মনের গভীরতায়, যে দেশের রহস্য আজো তার কাছে অজানা।

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে সুকুমার সারা রাত কাটিযে দিল। সে ঘুমোতে পারলে না।

বিশ্বজয়ী হ'তে হ'লে এ সব সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তাকে অগ্রসর হতে হবে। শৈলেনের কথা ভাবলে চলবে না, রেবার কথা ভাবলে চলবে না। ভাবতে হবে শুধু নিজের অন্তরের কথা, দৃষ্টি রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনের দিকে। প্রেম কিংবা প্রযোজন সূক্ষ্ম দর্শন বা সমাজতত্ত্বের ধাব ধারে না। জীবনকে সে কোন দিক থেকেই অতো সূক্ষ্মভাবে বিচার করেনি—প্রয়োজনও হযনি। বিশেষ, নারী সম্বন্ধে তার মন কোনদিনই অতোখানি সচেতন নয়। বিলেতে যে শ্রেণীর নারীব সঙ্গে সে মেলামেশা ক'রে এসেচে, তাদের সম্বন্ধে এতোখানি তত্ত্ববিচারের কোন প্রযোজন হয় নি।

অনেকখানি বেলায চা খেতে খেতে সে সুলতাকে লেখা গতরাত্রির চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল। না, ফিরতে সে পারবে না, শূন্য হাতে ফেরা তার চলবে না। নদীতে নেমে সে তীর না দেখে উঠবে না। প্রয়োজন হ'লে সে শৈলেনকে সব কথা খুলে বল্‌বে। রেবাকে সে নিক্, শাশ্বতীকে সে তাকে ভিক্ষা দিক্। মনের খেলাব হারজিত আছেই। সময় ও সুযোগ পেলে অবশ্যই সে শাশ্বতীকে আয়ত্তে আন্‌তে পারবে। সে কৌশল তার জানা আছে, তার মাঝে সে উপাদানও আছে প্রচুর।

ব্যাপার কী? এখনো যে একা অমন ক'রে শুয়ে আছেন বড়? শরীর ভালো আছে তো!

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হিমাংশু প্রশ্ন করল।

আরে হিমাংশুবাবু যে ? এসো, এসো, ভেতরে এসো।

তা না হয় এলুম, কিন্তু আপনার ব্যাপার কী বলুন তো, এতোখানি বেলা হলো একবার ও বাড়ীতে গেলেন না ! মা ভেবে সারা—

তাই বুঝি মা পাঠিয়ে দিলেন ?

মা'র তাগিদেই অবশ্য আসা। শাশ্বতী বেচারীও চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে অপেক্ষায় অপেক্ষায় বিরক্ত হ'যে শেষে উঠে গেল, আর শৈলেনদা মনের দুঃখে রাইফেল কাঁধে নিয়ে প্রাণীহত্যা করতে রওনা হলেন।

—শিকার করতে ? আরে বলো কী ? আমাকে একবার খবর দিতে হয়—

শৈলেনদা আমায় ব'লেছিলেন, কিন্তু আমি ইচ্ছে ক'রেই দিইনি। ভয হলো—

কেন ?

হিমাংশু গম্ভীর হ'য়ে বললে : জঙ্গলের মাঝে শেষে ওসমান জগৎসিংহের লড়াই বেধে যাক। দু'জনেরি হাতে বন্দুক—

সুকুমার সশব্দে হেসে উঠলো। কিন্তু সে হাসির প্রাণ নেই। হিমাংশুর কানে কান্নার মতো বাজলো।

সুকুমার সহসা স্তব্ধ হ'য়ে একটা সিগারেট ধরালে এবং কৌটাটা হিমাংশুব পানে এগিয়ে দিল।

হিমাংশু বললে : জানেন তো আমি ও রসে বঞ্চিত।

সুকুমার সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধ'রে প্রশ্ন করলে, আমি তা হ'লে শৈলেন বাবুর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, কি বল ?

আপনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলা বড শক্ত। আমার মনে হলো, ব'ললুম—

শৈলেন বাবু শাশ্বতীকে ভালোবাসে, কি বলো ?

হিমাংশু মাথা নেড়ে বললে : ভালো তো নিশ্চয়ই বাসে, কিন্তু কী রকম ভালবাসে, কেমন ক'রে জান্‌বো !

আর শাশ্বতী ?

শাশ্বতীর সম্বন্ধেও ঐ একই উত্তর।

সুকুমার ব'লে উঠলো, রট ! তবে যে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বল্‌লে ? শাশ্বতী

যদি শৈলেনবাবুকে না চায় বা শৈলেনবাবু তাকে না চায় তাহ'লে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী হই কেমন ক'রে ?

হিমাংশু হো হো ক'রে হেসে উঠলো : উল্টা বুঝিলি রাম ! যার যা চিন্তা ! আপনি শাশ্বতীর কথাই ভাবচেন। কিন্তু শাশ্বতীকে আপনি জড়াচ্ছেন কেন ? সে বেচারী তো বুকড্। এর যে আর একটা দিক্ আছে।

কী রকম ? সুকুমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল।

হিমাংশু পেট-আল্গা মানুষ। রসিকতার লোভ সংবরণ করতে না পেরে হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেছিল, এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথাটা উল্টে নিল। বল্লে, রেবার কথা ধরুন না। মনে করুন, শৈলেনদা রেবাকে ভালোবাসে, ট্রেনের মাঝে প্রথম দর্শনেই ওর মনে প্রেম জন্মেচে—

সুকুমার মাটিতে পা ঠুকে ব'ল্লে, বেশ, তাহলে শৈলেনবাবু রেবাকে বিয়ে ক'রে ফেলুক।

হিমাংশু বললে, অতো সহজ নয়। তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল ?

কেন ?—এর মধ্যে আবার শক্তটা কোন্খানে ?

হিমাংশু বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বললে, শৈলেনদা ভালোবাসলেই তো বিয়ে হয়না। রেবার দিক্‌টা ভাবুন, রেবা এদিকে ভালোবাসে মশায়কে, অর্থাৎ মিঃ সুকুমার মুখার্জ্জিকে। তা না হ'লে আর আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী হন্ কেমন ক'রে ?

এই ব'লে হিমাংশু সুকুমারের পাংশু মুখের পানে চেয়ে এক চোট খুব হেসে নিল।

সুকুমার হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলল : আমিতো আর দুজনকেই বিয়ে করতে পারি না। সমস্ত জেনে শুনে রেবার অমায়িক ভালোবাসার কোন মানে হয় না।

হিমাংশু গম্ভীর হ'য়ে বললে : ভালোবাসা তো কারুর হাত ধরা নয়। ছেলে-মানুষ যখন ভালোবেসেই ফেলেচে, তখন আর উপায় কী !

হিমাংশু লক্ষ্য করলে সুকুমার যতই রুক্ষ হ'য়ে উঠুক, মুখখানা কিন্তু তার প্রসন্নতায় ভ'রে গেছে। রেবা যে তাকে ভালোবাসে আর সেকথা যে এদের কাছে অগোচর নেই, এই চিন্তাই তার মনটাকে প্রসন্নতায় ভরে দিল। তার মুখে চোখে উপচে উঠ্‌লো জয়ের উল্লাস

কিছুক্ষণ ভেবে সুকুমার বললে, তাইতো হিমাংশু বাবু, এ সমস্যার সমাধান করা যায় কেমন ক'রে বলুন তো?

হিমাংশু বললে, সব দিক ভেবে দেখতে হ'লে, আমাদের প্রথমে রেবার কথাই ভাবতে হয়। ও বেচারী যখন আপনাকেই ভালোবেসেচে, তখন আমার মনে হয় আপনার কর্ত্তব্য—

সুকুমার বসলে, তাকেই বিয়ে করা, অসম্ভব! বাবা মা, আত্মীয় স্বজন সবাই জেনে গেছেন। এখন আর ব্যাক্ আউট' করা চলে না। তার ওপর আপনার মা দিনস্থির পর্য্যন্ত ক'রে ফেলেচেন। না না, তাঁকে আমি আঘাত দিতে পারবো না—

হিমাংশু বললে, তা হ'লে সমস্যাটা অমীমাংসিতই থেকে যায়। উপায় যখন নেই, রেবাকেই তখন ভুগতে হবে।

সুকুমার বললে, উপায় করতেই হবে। শৈলেনবাবু সম্বন্ধে আমি রেবাকে বুঝিয়ে বল্‌বো।

হিমাংশু বললে, সেটা কি নিষ্ঠুরতা হবে না? সে আপনাকে চায় আর আপনি তাকে বল্‌বেন তুমি আমার বদলে শৈলেনের কাছে যাও। ভক্ত গেল শিবের মাথায় জল দিতে, শিব বললেন তুমি কেষ্ট ভজো। চমৎকার তো!

সুকুমার মুখ টিপে হাসলে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টেনে বল্‌লে, আমি যখন 'ওপেন' ছিলুম তখন জান্‌লে না হয় ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। কিন্তু এখন যে আমরা দু'জনেই অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েচি।

হিমাংশু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গে বল্‌লে, তা ঠিক! শাশ্বতীকে ব্যথা দেওয়া হবে।

সুকুমার সমালোচকদের দৃষ্টি দিয়ে হিমাংশুর পানে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিল।

হিমাংশু বললে, অনেকখানি বেলা হ'য়ে গেল। আমি চল্‌লুম, শৈলেনদা আমার জন্যে ব'সে থাকবেন।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, শৈলেনবাবু ফিরেচেন?

হিমাংশু বললে, বলতে ভুলে গেচি, শৈলেনদা একরাশ পাখী শিকার ক'রে এনেচে। গোটা পঞ্চাশ স্নাইপ আর দু'জোড়া মাণিকজোড়। রাত্রের ডিনারের চার্জ্জ নিয়েচে শাশ্বতী আর রেবা।

সুকুমার লাফিয়ে উঠলো, 'হাউ লভ্‌লি'!

হিমাংশু জিজ্ঞেস করলে, কখন আস্‌চেন তাই বলুন! মা বকাবকি সুরু করেচেন।

বিকেলের দিকে আমি আসবো। রাত্রে কিন্তু আমার ডিনারের ব্যবস্থা ক্লাবে। কালেক্‌টার সাহেব, পুলিশ সাহেব, জজ সাহেব, সিভিল সার্জ্জন আরো অনেকে থাক্‌বেন।

হিমাংশু যেতে যেতে বললে : মাকে ব'লে আস্‌বেন।

বিকেলের চায়ের আসর শেষ হ'যে গেলে কথা প্রসঙ্গে সুকুমার আলোকলতাকে বললে, দেখুন মিসেস্ ঘোষাল, একটা কথা ক'দিন থেকেই বল্‌বো ভাবছিলুম কিন্তু সুযোগ হয়নি। মিসেস্ মুখার্জ্জিও র'য়েছেন উনি যদি—

হিরণ্ময়ী ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না, তাই হিরণ্ময়ী বল্‌লেন, আমি না হয় একটু বাইরে যাই—

সুকুমার বললে, না না, আপনার কাছেই আমাব আর্জ্জি আছে।

আমার কাছে? বলোনা বাবা—হিরণ্ময়ী ঘুরে দাঁড়ালেন।

সুকুমার জিজ্ঞেস কবলে, রেবা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, মিসেস্ মুখার্জ্জি?

—কেন বলো তো বাবা?

আলোকলতা হেসে বললেন, বেন ঘট্‌কালি করবে নাকি?

—ঠিক তাই, যদি মিসেস মুখার্জ্জি ভরসা দেন্।

সুকুমার সপ্রশ্ন মিনতিভরা দৃষ্টি দিয়ে হিবণ্ময়ীর মুখের পানে তাকালো।

হিরণ্ময়ী বললেন, বেশ মেয়ে তো রেবা, কী বলো দিদি?

হিরণ্ময়ী আলোকলতাকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুকুমার বললে, 'বাই জোভ্' ! উনি তো 'ইন্‌টারেষ্টেড্', ওঁর ভায়ের মেয়ে। কাজেই এক্ষেত্রে ওঁর কোন স্বাধীন মতামত থাকতে পারে না।

হিরণ্ময়ী থতিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই ব'লে উঠলেন: মেয়ে হিসেবে খাসা মেয়ে। যেম্‌নি দেখতে, তেম্‌নি সদাই হাসিমুখ। লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ব'লেই মনে হয়। আমার তো খুব ভালো লাগে রেবার মুখের হাসিটুকু।

সুকুমার লাফিয়ে উঠ্‌লো, বেশ, তা হ'লে এবার আমি আমার আর্জ্জি পেশ করি। আমি বলছিলুম কি, শৈলেন বাবুর সঙ্গে রেবার বিয়ে দিন্।

আলোকলতা হাসলেন। হিরণ্ময়ী বললেন, আমার মতো গরীবের ঘরে কী আর ওর বাপ-মা দেবেন ?

সুকুমার বললে : সে ব্যবস্থা করবেন মিসেস্ ঘোষাল—

আলোকলতা উৎসাহ-দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, সে ভার আমার। রেবা যেমন, তেম্‌নি পাত্র হিসেবেও কি শৈলেন ফেল্‌না ? তার ওপর ছেলের পাঁচশো টাকা মাইনের চাক্‌রি হয়েচে। এর চেয়ে ভালো পাত্র পাবে কোথায় ?

সুকুমার ব'লে উঠ্‌লো : ঠিক ! তা ছাড়া ছেলেমেয়ের দিক্‌টাও তো দেখ্‌তে হবে। তাদের মনকে তো অগ্রাহ্য করা চলে না।

আলোকলতা ঘাড় নাড়লেন, তা তো বটেই !

সুকুমার উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লে : ওই ওদের নিয়তি ! বুঝতে পারচেন না ঘটনাচক্র কি রকম ওদের টেনে আন্‌ল ? কী রকম দৈব-দুর্বিপাকে, কী রকম অপ্রত্যাশিতভাবে এক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে ওদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘট্‌লো ? এই যে ওদের পরিচয়ের সূত্রপাত, এ যেম্‌নি 'রোমান্টিক', তেম্‌নি 'এক্‌সাইটিং'। এর মাঝে দৈবের হাত রয়েচে। কাজেই ওদের মাঝে ভাবান্তর হওয়া কিছু বৈচিত্র্য নয়।

হিরণ্ময়ী হঠাৎ উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস্ করলেন, শৈলেন কিছু ব'লেচে বাবা ?

সুকুমার বললে, প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বল্‌লেও আমার চোখকে কি প্রতারিত করতে পারে ?

আলোকলতা জিজ্ঞেস করলেন, আর রেবা ?

আলোকলতার প্রশ্নে সুকুমারের মুখখানা মুহূর্ত্ত দীপ্ত হ'য়ে উঠেই নিভে গেল। সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারলে না।

আলোকলতা জিজ্ঞাসুভরা চোখে তার মুখের পানে চেয়ে আছে দেখে সুকুমার বললে, মেয়েরা কি আর কোন কথা মুখফুটে বলে ?

আলোকলতা ও হিরণ্ময়ী দুজনেই মাথা নীচু করলেন। 'কী বল্‌ছিলেন সুকুমার বাবু ? মেয়েরা কোন কথা মুখফুটে বলেনা ?'—বলতে বলতে রেবা এসে ঘরে ঢুকলো। সুকুমারের মুখখানা পাংশু হ'য়ে গেল। সে মাথা নীচু করলে। আলোকলতা ও হিরণ্ময়ী চোখ তুলে তার অগোছাল শ্রান্ত মুখের পানে তাকালে। রেবার ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটের ফাঁকে আল্‌গোছে ভেসে উঠলো ক্ষীণ হাসির রেখা !

রেবা কোমরের কসি গোছাতে গোছাতে বললে, পুরুষের কাছে মেয়েদের অনেক কথাই বলতে বাধে—এ কথা সত্যি। কিন্তু মেয়েদের কাছে বলতে তাদের কোন কিছুই বাধে না। বিশেষ ক'রে মা মাসির কাছে।

সুকুমার নিজেকে সাম্‌লে নেবার চেষ্টায় সহসা সশব্দে হেসে উঠ্‌লো। বললে, আমিও সেই কথাই বলছিলুম।

রেবার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো। সে তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের পানে চেয়ে বললে, আপনি কী বল্‌ছিলেন আড়াল থেকে আমি তা শুনেছি মিঃ মুখার্জ্জি! অন্যায হ'য়ে থাকে তো মাপ করবেন। আমার সম্বন্ধে আপনি কা গোপন তথ্য আবিষ্কার ক'রে ফেললেন তাই শোনবার জন্যে আমার কৌতূহল অদম্য হ'যে উঠলো।

রেবার মুখের ভাবে ও কথা বলার ভঙ্গীমায আলোকলতা কেমন অস্বস্তিবোধ করলেন। পাছে প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে তাই হঠাৎ রেবাকে কাছে টেনে নিযে ব'ললেন, অন্যায় কোন কথাই হযনি রে পাগলি! সুকুমার অন্যায় কিছুই বলেনি! শৈলেনের সঙ্গে তোর বিয়েব কথা হচ্ছিল। আমি জান্‌তে চাইলুম, তোর মত আছে কিনা?

রেবা আলোকলতাব বুকের ওপর মাথা রেখে ভাঙা গলায বললে, তা আমি জানি পিসীমা। তার উত্তর ওঁকে দেব বলেই আমার এখানে আসা। নইলে আমি বাইবে থেকে শুনেই চলে যেতুম।

রেবার মাথার উড়ো চুলগুলো সবিয়ে দিতে দিতে আলোকলতা বললেন, বেশ তো, বল্‌না তোর কি মত? আমি কালই দাদাকে লিখে দেব। ফাল্গুন মাসেই ভবোনের বিয়ে হয়ে যাক্।

হিরণ্ময়ীকে দেখিয়ে বললেন, এমন শাশুড়ী কিন্তু তপস্যা ক'রে মেলে।

রেবার মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠলো, ঠোঁটে ফুটে উঠলো সলজ্জ হাসির রেশ। বললে: কাকীমা বা শৈলেনদা সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই অস্পষ্ট নয। তোমাদের কাছে বল্‌তে আমার কোন লজ্জা নেই, পিসীমা। কাকীমার আশ্রয়ে শৈলেনদার চরণে ঠাঁই পেলে আমি কেন, যে কোন মেয়েই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে। কিন্তু উনি জানেন, আমার মনের কথা, উনি জানেন আমি শৈলেনদাকে কী চোখে দেখি। সব জেনে শুনেও যে

উনি তোমাদের কাছে কেন এ মিথ্যার অবতারণা করলেন, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্চি।

সুকুমার চম্‌কে উঠলো। উত্তেজিতও হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ সুর বদ্‌লে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হ'য়ে বললে : অনর্থক আমার ওপর অবিচার ক'রবেন না, রেবা দেবী। আমায় ভুল বুঝবেন না।

রেবা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে : আমি আপনাকে ভুল বুঝিনি, মিঃ মুখার্জ্জি। আপনিই একটা মস্ত ভুলের ওপর নিজের এবং আর একজনের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুল্‌তে যাচ্চেন। আর সেই ভুলকে চাপা দিয়ে সত্যের মুখোস পরাবার এই যে হাস্যকর প্রয়াস, এ শুধু বিলেতী সমাজে চল্‌তে পারে—যে সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের এই বাঙালী সমাজে তা অচল।

সুকুমার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। রেবা বলতে লাগল, চোরাবালির ওপর যে সৌধ গড়তে যাচ্চেন একটা ক্ষণিকের খেয়ালে, তার পরমায়ু কতটুকু? সব জেনে শুনে কেন একটা ভালো মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে উঠে প'ড়ে লেগেচেন—কেন?

রেবা!

শাশ্বতী এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েচে।

তোকে আমি মশলা আন্‌তে পাঠালুম আর তুই এখানে এসে সুকুমার বাবুর সঙ্গে তর্ক করচিস্—আয়!

শাশ্বতী যেমনি ঝড়ের মতো এলো, গেলোও তেমনি ঝড়ের মতো বেগে রেবার হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে।

রেবাকে নিয়ে শাশ্বতী বেরিয়ে গেলে তিনজনেই একটা অস্বস্তিকর নীরবতার চাপে হাঁপিয়ে উঠলো। শাশ্বতীর আকস্মিক আবিভাব ও গর্ব্বিত প্রত্যাগমন সুকুমারের সারা দেহে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বইয়ে দিলে। তার স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্য্যশ্রী সুকুমারের অন্তরটাকে আলোড়িত ক'রে তুললে। শাশ্বতীর গতিভঙ্গীটির পানে সে শুধু দিশাহারার মতো শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সেই দুঃসহ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে আলোকলতা বললেন, মেয়েটা পাগলী! তুমি কিছু মনে ক'রোনা বাবা!

উনিশ

কথা হচ্ছিল অবিনাশ আর আলোকলতার। সামনে বসেছিলেন, হিরণ্ময়ী ও হরেনবাবু। শ্রোতা হিসেবেই তাঁরা স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন।

অবিনাশ বললেন, মেয়ের বিয়ের সমস্যাটা সারা মনটাকে এমনি জু'ড়ে ব'সেছে ছোট বউ যে, এখন চাক্‌রির কথা বা চাক্‌রিতে যোগ দেবার কথা ভাবতেই পার্‌চি না। এখন সে সময়ও নেই, রুচিও নেই।

আলোকলতা ঝঙ্কার তুলে বললেন, শোন কথা ঠাকুরপো! মেয়ের বিয়ের যখন সবই ঠিক তখন আর সমস্যাটা কিসের? বিয়ের ব্যবস্থা? সে তো তুমি সবই করবে! ঠাকুরপো আছে, দাদাকে আস্‌তে লিখেছি আর এদিকের যা কিছু ব্যবস্থা তার জন্যে একা শৈলেনই আমার একশো।

হিরণ্ময়ীর ঠোঁটের ফাকে হাসি ফুটে উঠলো। আলোকলতা বললেন: তার জন্যে তুমি কেন কাজে যোগ দেবে না?

অবিনাশ গুড়্‌গুড়ির নলটায় জোরে জোরে গোটাকয়েক টান দিয়ে হরেন-বাবুর হাতে দিলেন।

হরেনবাবু বললেন: তা না হয় ছুটিটা এক্‌সটেণ্ড ক'রে নিয়ে বিয়ের পর একেবারে জয়েন করলেও চল্‌তে পারে। বিয়ের দুদিন তো ছুটি নিতেই হবে। কী বলো ছোটগিন্নি।

আলোকলতা নিরুৎসাহের ভগ্নকণ্ঠে বললেন: তা চল্‌বে না কেন। তবে আমার বলা এই যে সাবজজ হ'যে ব'সে মেয়ের বিয়েটা দিলে, লোকের কাছে বল্‌তেও ভালো, দেখতেও ভালো। আমার একটা মেয়ে ঠাকুরপো, সায়েব-সুবো, কোর্টের আমলা পেশ্‌কার কাউকে তো বাদ দিলে চল্‌বে না। বাদ দেব কাকে? বাঙালী টোলারই কী কাউকে বাদ দিতে পারবো?

অবিনাশ শুধু নিঃশব্দে হাসলেন।

আলোকলতা বললেন, তাই আমার এই বলা যে নতুন পোষ্টে পাঁচদিন কাজ ক'বে ছুটি নাওনা। লোকে বল্‌বে সাব্‌জজ ঘোষালের মেয়ের বিয়ে।

হরেনবাবু গুড়্‌গুড়ি টান্‌তে টান্‌তে বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললেন:

তা দাদা, ছোটগিন্নি যা বল্‌চে মিথ্যে নয়। ছোট গিন্নি যে সারা শহরে নেমন্তন্ন ক'রে বেড়াবে, লোকের তো জানা চাই যে সবজজবাবুর গিন্নি। সে গৌরব হ'তে তুমি ওঁকে বঞ্চিত করবে কেন ?

অবিনাশ বেশ হাল্‌কা কৌতুকের স্বরেই বললেন : তুমি একটা লেবেল এঁটে দিও হে হরেন তোমাদের বৌঠানের কপালে, তা হ'লেই সবাই জান্‌তে পার্‌বে।

হরেনবাবু ও হিরণ্ময়ী একযোগে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁদের হাসির টুক্‌রোগুলো আগুনের স্ফুলিঙ্গর মতো আলোকলতার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারই আঁচে মুখখানা তাঁর গন্‌গনে আগুনের মতো লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্তরটা কেঁপে উঠ্‌লেও বাইরে তিনি নিজেকে দমন ক'রে নিয়ে বললেন, আজ্ঞে না, তার জন্যে বলা হয়নি বা তার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখানে ফিরে এসে আবার হঠাৎ মত বদ্‌লাবার তো কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

হরেনবাবু বল্‌লেন. বেশ তো ছোটগিন্নি, মাথা হ'তে মেয়ের বিয়ের ভূতটা নামতে দাও না, তারপর দেখে নিও একবার অবিনাশ ঘোষাল চুটিয়ে সাবজজগিরি করবে এবং জেলা-জজ্‌গিরি ক'রে তবে কাজ হ'তে ছুটি নেবে।

আলোকলকা উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, বলোতো ঠাকুরপো, সেই কেমন দেখ্‌তে, কিন্তু তা কী হবার জো আছে, না হবে। মিনিটে মিনিটে মত বদ্‌লাচ্চে, আর আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্‌চে।

অবিনাশ স্তব্ধ হ'য়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

আলোকলতা বললেন : এতোই যদি আত্মসম্মান ঠাকুরপো, তা হ'লে চাকরী না করাই উচিত ছিল। তোমার মতো ওকালতি করলেই তো চলতো। এদ্দিন বিশ বাইশ বছর প্রাকটিশ হ'য়ে যেতো।

অবিনাশ মুখ তুলে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, একটা কথার মতো কথা বলেছো ছোট বউ। ওই আমার জীবনের মারাত্মক ভুল। সে ভুলের মূলে আমার নিজের কতোখানি হাত ছিল তাও তোমার অজানা নেই ছোট বউ। এ চাকরীর মূলে ছিলেন তোমার বাবা। তাঁরই উৎসাহ ও অনুরোধে আমায় হাকিমীর নেশায় পেয়ে বসেছিলো।

আলোকলতা কণ্ঠের মাঝে বিষ মাখিয়ে বললেন : ভারী অন্যায় ক'রেছিলেন তিনি !

ন্যায় অন্যায়ের কথা হ'চ্চেনা, ছোট বউ ! আমি চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ বছর তো নিঃশব্দে চাকরী করলুম, মর্য্যাদায় আঘাত না লাগলে বাকী কটা দিনও বোধহয় নির্ব্বিবাদে মুখ বুজেই কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু—

হরেন বাবু বাধা দিলেন : থাক, ও নিয়ে তো আর বাক্‌বিতণ্ডার দরকার নেই, যখন ও-দিকটা নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে। এখন ছোটগিন্নির কথা হ'চ্চে বিয়ের আগে জজিয়তি করবে কি না ! তোমার কথা হ'চ্চে বিয়ের ভূত ঘাড় হ'তে না নামলে তুমি কাজে মন দিতে পারচো না। এই তো ?

হিরণ্ময়ী হাসলেন। বললেন, তুমি যে ওকালতি কর্‌চো কার পক্ষে —

হরেনবাবু বললেন, দুপক্ষেরই। এসব ঘরোয়া ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তিই ভালো। ছোট গিন্নি ! এখন সত্যি কথা বল্‌তে কী, সবাই বিয়েতে মেতে উঠেচে। এ কটা দিনের ছুটিও না হয় বিয়ের খাতায় খরচ পড়বে।

আলোকলতা হাস্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ী।

হরেন বাবু বললেন, এখন বিয়ের ফর্দ্দ ছাড়া আর কোন কথাতেই গা উঠচে না।

এঁদের যখন এমনি বাকবিতণ্ডা চল্‌চে অবিনাশের ঘরে, একটা পাশের ঘরে রেবা তখন শৈলেনকে ব'লছিল, তোমাকে একটু মানুষের মতো ভেবেছিলুম শৈলেনদা, কিন্তু সে ধারণা আমার বদ্‌লে দিলে। তোমরা সবাই সমান। এতখানি পথ ছুটে এলে যাকে বাঁচাবে ব'লে, আজ তাকে এই বিপদের মুখে ফেলে তুমি নিশ্চিন্তে পালিয়ে চললে ? তোমাকে পথের মাঝে পেয়ে তোমার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে আমি আশার আলো দেখেছিলুম, কিন্তু এ কা করলে তুমি শৈলেনদা ?

শৈলেন রাইফেলটা কেসের ভেতর রাখতে রাখতে বললে : উপায় নেই রেবা ! উপায় থাক্‌লে আমি কখ্‌খনো পালিয়ে যেতুম না। আগেকার যুগ হ'লে আমি লড়াই ক'রে শাশ্বতীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতুম, কিন্তু এটা যে সভ্যতার যুগ ! তার ওপর সে যখন নিজে নির্লিপ্ত, এতো উদাসীন !

রেবা বললে : চমৎকার তো ! সে কী বলবে ? বলবে, শৈলেনদা আমি তোমায় বিয়ে করবো—তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল ?

শৈলেন বললে : এ যুগ না হ'লে তো সেও সম্ভব হোতো।

রেবা আগ্রহকম্পিত স্বরে বললে : শৈলেনদা, তুমি নিজের মুখে বলেচো তোমাদের উড়িষ্যার জঙ্গলে নৈশ অভিসারের কাহিনী। শাশ্বতীদির দিক হ'তে বলবার কী আর কিছু বাকি আছে ?

শৈলেন মুখ তুলে রেবার পানে তাকালে। রেবার চোখদুটি অশ্রুতে ভারী হ'য়ে উঠেচে, কালো দীর্ঘ পক্ষ্মগুলিতে শিশিরবিন্দু ঝক্‌ঝক্ করচে তার ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটদুখানি কাঁপচে !

রেবা বললে, সব জেনেশুনেও তাকে নির্লিপ্ত বলচো, তাকে উদাসীন বলচো ? তার মনের গোপন অভিলাষ গুরুজনদের কাছে নিজের মুখে বলতে কি সে পারে ? কথাটা কানাকানি হলেই কলঙ্কের সীমা থাকবে না। এ কথা তুমি বোঝনা কেন, শৈলেনদা ? তার ওপর—

শৈলেন নিঃশব্দে সপ্রশ্নদৃষ্টিভরা চোখে তার পানে চাইল।

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সুকুমারবাবু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেচেন। দুঃখের কথা, লজ্জার কথা বল্‌বো কী, সকলকে ব'লে বেড়াচ্চেন যে আমাদের দু'জনের প্রণয় হযেচে—প্রথম দর্শনে, ট্রেনের মাঝে।

শৈলেন সশব্দে হেসে উঠলো। তাই নাকি, খাসা চাল চেলেচে তো। এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। এই না হ'লে বিলিতী ট্রেণিং ! একবার বিলেত থেকে ঘুরে এলে প্রণয ব্যাপাবে পোক্‌তো হ'যে আসা যায়—

রেবা বললে. মস্ত ভুল। না পারে ওদেশের মেযেদের বুঝতে, না পারে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে খাপ খেতে—ফলে মেয়েদেব চোখে অকওয়ার্ড ও কদর্য্য হ'য়ে ওঠে। শাশ্বতীর মতো মেয়ে—তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাছে ও যে একেবারে অচল। অথচ ওঁর শাশ্বতীকে চাই-ই।

কিছুক্ষণ ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈলেন বললে, কিন্তু আমার যে হাত পা বাঁধা ভাই। বলতে গেলে আমি যে শাশ্বতীদের সংসারেরই একজন, আমি কী ওর বাপমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি ? ওঁরা যদি সুখী হন, সুকুমার বাবুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই যদি ওঁদের অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে শাশ্বতীকেও যেমন মুখ বুজে সেই আদেশ মানতে হবে, আমাকেও দণ্ডাজ্ঞার মত তা মাথা পেতে নিতে হবে—তা সে যতো কঠোরই হোক্।

রেবা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। বল্‌লে, যারা অযোগ্য তারাই ওই রকম

উদারতা দেখিয়ে মনকে প্রবোধ দেয়। ও একটা সৌখীন দুঃখবিলাস। যারা আসল কথাটা জানে না, তাদের কাছে বাহবা পেতে পারো, কিন্তু যারা জানে তারা তোমায় ঘৃণাই করবে, তারা তোমার পৌরুষকে ধিক্কার দেবে।

শৈলেন মাথা নীচু ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। রেবা বললে, এ ভুল করোনা শৈলেনদা, উল্‌টো দিকে কাঁটা ঘোরালে ঘড়ি চলে না—

শৈলেন মুখ তুলে রেবার পানে তাকালে।

হৈ হৈ ক'রে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো শৈলেনের ছোট ভাই অজু আর তার পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে শাশ্বতী। দুজনেরই হাতে এক গোছা ক'রে কৃষ্ণচূড়া।

অজু ধপ ক'রে শৈলেনের কোলের কাছে ব'সে প'ড়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। শাশ্বতী থমকে দাঁড়াল।

অজু বললে: ধরো না দেখি এইবার—

কী হ'য়েচে রে অজু? শৈলেন প্রশ্ন করলে।

অজু তেমনি হাসতে হাসতে বললে, ছোড়্‌দি আমায় মারবে—

কেন? ক'রেচিস্ কি?

অজু শাশ্বতীর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, বল্‌বো ছোড়্‌দি?

শৈলেন শাশ্বতীর পানে চাইল, তার মুখখানা আকর্ণ রাঙা হ'যে উঠ্‌লো। সে নিঃশব্দে অজুকে চোখের ইঙ্গিতে শাসালো।

রেবা বললে, বল্‌না অজু কি হ'য়েচে? ছোড়্‌দি কিচ্ছু বল্‌বে না।

অজু শাশ্বতীর মুখের পানে চেয়ে দেখলে সে মুখ নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সে শৈলেনকে জিজ্ঞেস করলে, বল্‌বো দাদা?

শৈলেন বললে, বল্ না—

অজু বললে, আমি ছোড়্‌দিকে বললুম আমায় ফুল পেড়ে দাও, তা ছোড়্‌দি বললে, আমায় যদি বউদি বলিস্ তো ফুল দেবো—

শাশ্বতী ঘর হ'তে পালাবার পথ খুঁজছিল, রেবা তার পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো তার হাত দুটো চেপে ধ'রে।

রেবা অজুকে বললে, তুমি কি বললে?

অজু বললে, হ্যাঁ। তবে তো আমাকে ফুল দিলে, চুমু খেলে আর জিজ্ঞেস করলে—

শাশ্বতী রেবার কাঁধের আড়ালে মুখ লুকালো।

রেবা বললে : কী জিজ্ঞেস করলে?

অঞ্জু বললে, আমায় জিজ্ঞেস করলে, আমি যদি বউদি হই, তুমি আমায় ভালবাসবে অঞ্জু?

আমি বললুম, হ্যাঁ—খুব ভালোবাসবো।

ছোড়্‌দি বললে, তা জানি। তুমি আমায় ভালবাসবে, সবাই বাসবে, কেবল তোমার দাদা আমায় ভালোবাসেনা—

আমি বললুম, দাদাকে বলিগে, তাইতো আমায় মারতে এলো—

রেবা হাসলে। শৈলেন কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিল না, আর শাশ্বতী রেবাকে আশ্রয় ক'রে তার কাঁধের ওপর মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

রেবা তার মাথাটি চেপে ধরল। শৈলেন বললে : সত্যি বলেচো শাশ্বতী, তোমার স্পর্শ পেয়েও দস্যু রত্নাকর কবি বাল্মিকী হ'তে পারলে না।

রেবা বললে, কাজ নেই কবি হয়ে, দস্যু রত্নাকরের শক্তি ও সাহসই দরকার।

ওদিকে অবিনাশের ঘরে সুকুমার কখন এসে আসর জমিয়ে বসেচে। কেমন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় ঘরখানা থম্ থম্ করচে। অবিনাশ ঘোষালের সদাপ্রফুল্ল মুখে নেমেচে শ্রাবণ সন্ধ্যার অন্ধকার, আর শাশ্বতীকে কেন্দ্র ক'রেই বোধ হয় আলোকলতার সঙ্গে চলেছে একটা বিশেষ অশান্তিকর বাদানুবাদ।

সুকুমার বললে, আমি স্যাণ্ডিস্ কম্পাউণ্ডে শুনলুম, আপনি ফের মত বদলেচেন এবং কাজে জয়েন করবেন না। আই ওয়াজ্ শক্‌ড।

অবিনাশ হাসলেন, মত আমি বদ্‌লাইনি সুকুমার, মত আমার একটাই। পরের বেলা রায় দিয়ে যখন কখনো বদলাইনি, নিজের বেলাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন?

আলোকলতা হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, তা হ'লে কী তুমি মোটেই আর জয়েন করবে না?

অবিনাশ নতমুখে নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

আলোকলতা তেমনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ঘাড় নাড়লে হবে না, যা বল্‌বে মুখ ফুটে বলো।

অবিনাশ এবার মুখ তুলে আলোকলতার পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানা

হঠাৎ যেন পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো,—পুরু ঠোঁট দু'খানা সম্বদ্ধ, ললাটের শিরাগুলো মোটা হ'যে ফুলে উঠেছে, ভুরুর নীচে চোখদুটো যেন জ্বলচে।

অবিনাশ বল্‌লেন, মিছেই ছোটবৌ এতোদিন একসঙ্গে ঘর করলে, নিজের স্বামীকে চিন্‌তে কোন স্ত্রীর যে এতো দেরি লাগে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমায় যদি আজও না চিনে থাকো, তাহ'লে আমার বলবার কিছু নেই।

অবিনাশের দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের ঝাঁঝে আলোকলতা হঠাৎ যেন বেত্রাহত পশুর মতো সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলেন।

অবিনাশ বল্‌লেন, তাহ'লে আমায় উত্তর দিতেই হবে। বলি শোন। অবিনাশ ঘোষাল যে চাকরীতে ইস্তফা দিয়েচে, সে চাকরী আর সে গ্রহণ করবে না, কোন বিশেষ কারণেই নয়। এ কথা তোমার জানা উচিত ছিল এবং হয়তো জানো। কিন্তু কেন যে তুমি বারবার আমার আহত আত্মমর্য্যাদায় আঘাত ক'রে ক'রে রক্তাক্ত ক'রে তুল্‌চো তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্চি। মানুষটাকে তুমি যে চাওনা তাও আমি জানি, তুমি চাও তার পদমর্য্যাদা, তার অর্থ!

কথাগুলো আলোকলতাকে যে খুব তীব্র হ'য়েই আঘাত করল, তাঁর মুখের চেহারা দেখেই তা বোঝা গেল। সবার উপরে তাঁর নীরবতা এই আঘাতের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই যেন ব্যথিত ও শঙ্কিত ক'রে তুলল।

অপমানের প্রচণ্ড আঘাত আলোকলতাকে মাথা তুল্‌তে দিল না। অবিনাশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েই বোধ হয় শাশ্বতী এসে ঘরে ঢুকলো।

অবিনাশ আবার বললেন, পারিবারিক অশান্তির ভয়ে চাকরী যদি বা আবার স্বীকার করতুম—এখন আর পারিনা। কারণ ঐ ছেলেটির হাতে শাশ্বতীকে তুলে দেব ব'লে স্বীকার করেছি। যাকে কন্যাদান করবো, তার বাপের কাছে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাক্‌তে পারে না। তাঁর কোন দানই যে আমি গ্রহণ করতে পারি না, এ সহজ কথাটা বুঝতে এদের এতো দেরি লাগে কেন বল্‌তে পারো হরেন?

হরেন ও হিরণ্ময়ী অলক্ষ্যে নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

অবিনাশ সুকুমারকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, তোমার বাবাকে আমি অসম্মান করিনি বাবা, তাঁর চেষ্টার জন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার উন্নত

পদমর্য্যাদা স্বীকার ক'রে নিযে যদি আমি শাশ্বতীকে তোমার হাতে তুলে দিই, তোমার চোখে ও তোমার বাবার চোখে আমি চিরদিন ছোট হ'যে থাকবো। তোমরা ভাববে নিজের উন্নতির বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করলুম পণ্যের মতো।

সুকুমার বললে, আই এ্যাপ্রিসিয়েট্‌ ইউ মিঃ ঘোষাল, ইন ওয়ান্‌ সেন্স ইউ আর রাইট্‌!

অবিনাশ বললেন, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে—আমি দেবো, তুমি গ্রহণ করবে। তোমাদের কোন দানের বিনিময়ে আমি দান করবো না।

সুকুমার বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললে, রাইট্‌!

আলোকলতা সেই যে মাথা নীচু করেছেন, আর ঘাড় তোলেন নি। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেচে। তাঁর অবস্থা দেখে শাশ্বতীর প্রাণে মায়া জাগলো। জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত সে মাকে কোনদিন এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'তে দেখেনি। চিরদিন সে তাঁরই লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন হ'তে বাবাকে রক্ষা ক'রে এসেচে শিশুর মতো; মায়ের পানে চেয়ে দেখবার কোন প্রয়োজন হয়নি। পিতার সঙ্গে, অর্থাৎ পিতাকে আগলাতে গিযে, সে নিজেও কম নির্য্যাতন সহ্য করেনি। কিন্তু আজ তার মায়ের এ হলো কী! পিতাব রূঢ় পৌরুষ তাঁকে যে একেবারে ধরাশায়ী ক'রে দিল! শাশ্বতীর বুকের নীচেটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ ক'রে উঠলো, অথচ পিতার অবিচলিত দৃঢ় মুখের পানে চেয়ে তার কথা বলবার সাহস হলো না। সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার মার চোখের প্রবাহিত অশ্রুধারা তাকে স্থির থাকতে দিল না। সে হঠাৎ মার কাছে গিয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে ডাকলে, মা! উঠে এসো মা!

শাশ্বতীর কণ্ঠস্বরে চকিত হ'যে অবিনাশ মুখ তুলে চাইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁর মুখের চেহারা গেল বদ্‌লে। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতার বুকে নেমে এলো গোধূলির ধূসর ছায়া! অবিনাশ মাথা নত করলেন।

আলোকলতা নির্য্যাতিত অসহায় শিশুর মতো শাশ্বতীর বুকে মুখ লুকিয়ে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলেন।

হিমাংশু এসে খবর দিল, শৈলেনদাকে আজই রওনা হ'তে হবে—রাজাসাহেব টেলিগ্রাম করেচেন।

কুড়ি

মাঘের শেষ। শীতের জড়তা গেছে কেটে, বসন্তের এলোমেলো দখিন বাতাস এসে শীতার্ত্ত ধরণীকে জাগিয়ে মোহগ্রস্ত ক'রে তুলেচে। বনস্পতির বুকে রোমাঞ্চের মতো নবকিশলয় দেখা দিয়েছে। স্তবকে স্তবকে ফুলের সমারোহ জেগেছে অরণ্যের গহনে; পাখীর কাকলি, মৌমাছির গুঞ্জন, পলাশের রাঙা রঙে মনের মাঝে লাগে আবেশের ঘোর। পূর্ব্ব-রাগের ছোঁয়াচ লেগেচে বনানীর অন্তরে। তার সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব হিল্লোলের সঞ্চার—কিশোরীর দেহে যৌবন সঞ্চারের মতো, যার স্পর্শে দৃষ্টি উজ্জলতর ও প্রখর হ'য়ে উঠে। আকাশের বুকেও আলোর সমারোহ একটা অপরূপ দীপ্তিতে ফেটে পড়চে।

শুক্লপক্ষের আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ছায়া পড়েছে গঙ্গার জলে। গঙ্গার পানে চেয়ে চেয়ে শাশ্বতীর চোখ ফেটে জল এল, সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না। শৈলেন চ'লে যেতেই সে অজুকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসেছে বোধহয় নিজের অন্তরের বিরহব্যথাকে পাশ কাটাবার প্রয়াসে। হিমাংশু আর রেবা গেছে ষ্টেশনে শৈলেনকে তুলে দিতে। শাশ্বতী গেল না, কেন গেল না সে নিজেই বুঝতে পারে না – কে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো নিজেই জানে না। সে গেল না, অথচ ঘরে থাকতেও পারলে না। বদ্ধ প্রাচীরে কঠিন বেষ্টনীর মাঝে সে হাঁপিয়ে উঠলো। সে পালিয়ে এলো গঙ্গার তীরে, অজুকে সঙ্গে নিয়ে। পথ হ'তে অনেকখানি চর ভেঙ্গে নদীর কিনারায় পৌছাতে হয়। অজু লাফাতে লাফাতে চাঁদের আলোয় বালুচরের ওপর ছুটতে লাগল। এক জায়গায় মাঝে চর ফেলে নদী গেছে দুদিকে ভাগ হয়ে, তারই তীরে গিয়ে শাশ্বতী থম্‌কে দাঁড়াল। নদী যেন দুই বাহু বিস্তার ক'রে চরকে আঁকড়ে ধ'রে আছে।

ছোড়্‌দি!

অজু এসে শাশ্বতীর আঁচলে টান দিল।—কি দেখ্‌চো গো?

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে বললে, দেখ্‌না নদীর জলে চাঁদ নেমেচে—

দূর! ও তো চাঁদের ছায়া—চাঁদ তো আকাশে—

ছায়া?

শাশ্বতীর ধরা গলার কম্পিত স্বরে অজু চম্‌কে উঠ্‌লো। সে শাশ্বতীর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, তোমার চোখের জলেও চাঁদ ভাসচে—সেও ছায়া—

শাশ্বতী ত্রস্ত হ'য়ে আঁচলে চোখ মুছে বললে, খুব দুষ্টু তো তুই? চোখে আবার জল কোথা?

অজু বললে, আঁচলে মুছে ফেল্‌লে যে—কাঁদ্‌চো কেন বলো ছোড়্‌দি?

শাশ্বতীর বুকের নীচেটা দুলে উঠলো। সে অজুকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, কেন?

অজু তার মুখের পানে চেয়ে বললে, তোমার মন কেমন করচে—কার জন্যে বল্‌বো?

বল্‌তে হবে না। তুই খুব দুষ্টু হ'যেছিস্‌।

শাশ্বতী অজুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে একটা উঁচু বালিব ঢিবির ওপর বস্‌লো।

অজু বললে, আমারও খুব মন কেমন করচে ছোড়্‌দি। আমারো কান্না পাচ্চে।

শাশ্বতী অজুর মাথাটি বুকের ওপর চেপে ধ'রে তাব পশমের মতো চুলেব ওপর গাল রেখে বললে, ছিঃ ভাই।

শাশ্বতীর বিস্ময়ের অন্ত রইল না, অজু কাঁদচে। শাশ্বতীর রুদ্ধ অশ্রুবন্যা কি অজুকে আশ্রয় করলে? তার বিরহব্যথা কি অজুর কচি বুকে উদ্বেল হ'যে আত্মপ্রকাশ করলে। শাশ্বতী কাঁপতে কাঁপতে অজুকে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে নিষ্পেষিত ক'রে ফেললে। অজু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, দাদা কেন চ'লে গেল ছোড়্‌দি?

শাশ্বতী ভেঙ্গে পড়ল। সে অজুকে আশ্রয় করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওরে, আমাদের কাঁদাবার জন্যে—সে আমায় কাঁদাতে ভালোবাসে কিনা।

দু'জনে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে আশ্রয় ক'রে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে রইল। অজু গভীর আরামে শাশ্বতীর বুকের ওপর মাথাটি রেখে চাঁদের পানে চেয়ে রইল।

হঠাৎ রাস্তার ওর মোটরের হর্ণের আওযাজে সচকিত হ'য়ে শাশ্বতী অজুকে কোল থেকে তুলে দিয়ে উঠে দাঁডাল। বললে, চলো, বাড়ী যাই। ওরা বোধহয় ফিরে এলো—

অজু বললে, দাদার ট্রেণ এতোক্ষণ ছেড়ে দিয়েচে, না ছোড়্দি ?

বোধ হয় !

অজু বললে, জানো ছোড়্দি। যাবার সময় দাদাও আজ কাঁদছিল—

শাশ্বতী চমকে উঠলো, সত্যি ?

হ্যাঁ, রেবাদি জানে। রেবাদি'কে তুমি জিজ্ঞেস ক'রো।

চর ভেঙ্গে পথে এসে উঠতেই তারা দেখতে পেলে একজন লোক সিগারেট টানতে টানতে সেই দিকে আস্‌চে। অজু বললে, কে একজন সাহেব আস্‌চে ছোড়্দি।

চাঁদের আলোয় অনেকখানি পথ দেখা যাচ্চে। শাশ্বতী দেখলে কালো সাহেবী পোষাক, মাথায় টুপি নেই। পথের মাঝে তারা কাছাকাছি হ'তেই শাশ্বতী চিন্‌লো সুকুমারকে। সুকুমার শাশ্বতীকে চিন্‌তে পেরে একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—ইজ ইট্ এ ড্রিম অর এ ফ্যান্টাশি অফ্ এ হিট্ অপ্রেশড্ ব্রেন্! আমি যে শাশ্বতী দেবীকেই ধ্যান করতে করতে পথ চলেছিলুম। একী সৌভাগ্য যে, আমার ধ্যানের মূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহ ক'রে আমার সামনে এসে দাড়াল। তার ওপর প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্যসম্ভার—এই অপরূপ পটভূমিকায়—

শাশ্বতী করজোড়ে নমস্কার ক'রে সামনে দাঁড়াল। তার মনে হলো সুকুমারের স্বর ঈষৎ জড়িত। সে সঙ্কুচিত হ'য়ে অজুর হাত ধ'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার বললে, ক্লাব হ'তে ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরছিলুম। তোমার আকর্ষণ আমায় এই পথে টেনে আনলো। কিন্তু ·মনি অপ্রত্যাশিতভাবে যে এই প্রকৃতির রাজ্যে আমার মানসীর সাক্ষাৎ মিলবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

শাশ্বতী বললে, সেরকম স্বপ্ন দেখাও আপনার পক্ষে অন্যায়। যে আকর্ষণই আপনাকে এ পথে টেনে আনুক, নিশ্চয়ই এ ভেবে আসেন নি যে সেই আকর্ষণ এই রাত্রে নির্জ্জন পথে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

শাশ্বতীর কণ্ঠে বিরক্তির আভাস। সুকুমারের কানে গিয়ে তা ধাক্কা লাগলো। সুকুমার মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে অবিচল দৃষ্টি দিয়ে শাশ্বতীর মুখের পানে চেয়ে রইল।

শাশ্বতী মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াল।

হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠে সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, শৈলেনবাবু চ'লে গেছেন বুঝি?

উত্তর দিল অজু। হ্যাঁ, এই ন'টার গাড়ীতে।

সুকুমার শাশ্বতীকে বললে, আপনি গেলেন না কেন সি অফ্ করতে?

শাশ্বতী কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ সুকুমারের গলার স্বর গেল বদলে। সে বল্‌লে, একটু সময় হবে কী শাশ্বতী দেবী? সামান্য মুহূর্ত্ত কয়েক, আমার কিছু বলবার ছিল।

এখন, এইখানে? শাশ্বতী মুখ তুলে চাইলে।

সুকুমার হাসল। বললে, আমার মনে হয় এই তো উপযুক্ত সময় ও অবসর।

শাশ্বতী বললে, অবসর আমার প্রচুর নয়। এখুনি ডাক পড়বে বাড়ীতে।

সুকুমার বললে, কিন্তু আমি যে একটুও ফাঁক পাইনে শাশ্বতী! অথচ কথাগুলো বলবার জন্যে আমার মন হ'যে উঠেছে অশান্ত—অত্যন্ত অশান্ত।

শাশ্বতী লক্ষ্য করলে সুকুমারের স্বর আরো জড়িত হ'য়ে উঠেছে, তার উপর সিগারেটের গন্ধ ছাপিয়ে সুরার উগ্র গন্ধ বেরিয়ে আসচে। শাশ্বতী নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে সরে দাঁড়ালো।

সুকুমার বললে, তাই বলছিলুম, অবসর প্রচুর না হলেও ক্ষতি নেই, আমি সংক্ষেপেই শেষ ক'রে নেব। কিন্তু কথাটার মীমাংসা হওয়া দরকার আমাদের দু'জনেরই দিক থেকেই।

শাশ্বতীর মন হঠাৎ সুকুমারের কথায় সায় দিল। তার মনে হলো কোনো ছিদ্র ধ'রে যদি আসল কথাটা পাড়া যায়, হয়তো এই সদ্য জীবনসঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ মিল্‌তে পারে; হয়তো তা তাদের দুজনকে একটা নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। শাশ্বতী হঠাৎ উৎসাহিত হ'যে বললে, বেশ তো, বলুন না।

সুকুমার বুঝলে না যে শাশ্বতীর মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা যুদ্ধের সূচনা। সে এই অনুকূল আবহাওয়ায় মন খুলবার সুযোগ পেয়ে অধীর ও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। অজুর পানে চেয়ে বললে, আমাদের এই আলোচনার মাঝে এই শিশুর—

শাশ্বতী বললে, অঞ্জু তুমি বাড়ী যাও। আমাকে যদি কেউ খোঁজে, ব'লো আমি এখানে সুকুমারবাবুর সঙ্গে কথা বল্‌চি।

অঞ্জু চলে গেলে সুকুমার বললে, বাঃ! চমৎকার! তোমার সৎসাহসকে প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই!

শাশ্বতী মুখ তুলে সোজা সুকুমারের পানে তাকিয়ে বললে, সাহসটা কোথা দেখলেন?

সাহস নয়! আমাদের মেয়েদের কাছে এতোখানি আমি আশা করি নি! এই নির্জ্জন রাতে একা আমার সঙ্গে আলাপ করচেন বাড়ীর বাইরে এসে, সে-কথা বাড়ীতে জানিয়ে দিতেও আপনার বাধলো না,—সাহস নয়!

শাশ্বতীর মুখে ফুটে উঠলো কৌতুকের ক্ষীণ হাসি। সে পাল্টা প্রশ্ন করলে, কিন্তু সত্যি কোন ভয় আছে নাকি? বলুন, তা হ'লে ফিরে যাই।

শাশ্বতী আবার হাসল—তাচ্ছিল্যের হাসি। সুকুমার কিন্তু তা উপলব্ধি করতে পারলে না, তাই উপভোগ করল সেই হাসি। অন্ধ প্রাণের মত্ত আবেগে সে যে তখন ছুটে চলেছে।

একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির নীচে কতকগুলো ভাঙ্গা সিঁড়ি। হয়তো এককালে গঙ্গার ঘাট ছিল। সেই সিঁড়িতে ব'সে কথা হচ্ছিল।

সুকুমার বললে, আসল কথাটা হয়তো আমি ঠিকমতো গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না। বল্‌তে আমি নিজেই মনে মনে লজ্জা পাচ্চি। মন আমার বড় অশান্ত— কিছুতেই নিজেকে আমি আয়ত্তে আনতে পারচি না!

শাশ্বতী নতমুখে নিঃশব্দে ব'সে রইল আসল কথাটার অপেক্ষায়।

সুকুমার বললে, আমার মনে হয়, এমনি সময় এমনি জায়গায় একজন মানুষের সঙ্গ আর একজনকে এমনিভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে, তার অন্তর-বাহির এমনি সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে যে মনে হয় সেই মানুষটি ছাড়া সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা।

শাশ্বতী একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লে। সুকুমার উৎসাহিত হ'য়ে বললে, আপনি সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের মতন হ'লে এসব কথা স্পষ্ট বল্‌তে পারতুম না, মুখে বাধতো, কিন্তু—

শাশ্বতী বললে, আমি যদিও অসাধারণ নই, তবুও আপনি দ্বিধা করবেন না, বলুন।

শাশ্বতীর প্রসন্ন কণ্ঠস্বর ও নির্ব্বাক নিস্তব্ধতা তাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলে। উৎসাহের অবাধ কণ্ঠে বললে, আমাদের বিয়ের দিন স্থির হয়েচে নিশ্চয়ই সংবাদ রাখেন! মাঝে আর ক'টা দিন মাত্র বাকি, অথচ আমাদের পরস্পরকে চেনবার বা জানবার সুযোগ সুবিধা আজো হয়নি। তাই জিজ্ঞেস ক'রছিলুম—

বলুন, কী জানতে চাইচেন?

নির্জ্জনতার একটা মোহ আছে। লোকালয় থেকে দূরে বনচ্ছায়ার অন্তরালে প্রকৃতির অখণ্ড প্রভাবে মানবচিত্ত স্বতঃই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে—প্রবল হ'য়ে ওঠে তার রক্তের মাঝে আদিম মানব প্রকৃতির বর্ব্বরতা। রাত্রির এই নির্জ্জন পরিবেশ, শাশ্বতীর রোমাঞ্চকর সান্নিধ্য ও তার নির্ব্বাক প্রসন্নতা সুকুমারের উন্মত্ত যৌবনকে আলোড়িত ক'রে তুলল। তার উপর তার মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল সুরার বহ্নিশিখা তাকে যেন উত্তেজনায় অধীর ক'রে ফেললে। সে সহসা শাশ্বতীর একখানা হাত ধ'রে বললে, আমি শুনতে চাই শাশ্বতী তোমার মুখ হ'তে ছোট্ট একটি কথা, যার উপর এই আদর্শভ্রষ্ট যুবকের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে।

জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রির তরল অন্ধকারে শাশ্বতীর চোখদুটো সহসা জ্বলে উঠল। সে সুকুমারের শক্ত তপ্ত হাতের মুঠো হ'তে নিজের হাতখানা মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে কোন আপত্তি না জানিয়ে সে সংযতকণ্ঠে উত্তর দিলে, বিয়েতে দেব-দানব সকলেরই সমান অধিকার। সেখানে বাঙালী মেয়েদের স্বাধীন কোন মতামত থাকতে পারে না, অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বুই জন মেয়েকেই মেনে নিতে হয় পিতামাতার বা অভিভাবকের নির্ব্বাচিত পাত্রকে। কাজেই এক্ষেত্রে আমারো কোন স্বাধীন মতামত নেই। আমি সাধারণেরই একজন।

শেষের দিকে শাশ্বতীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় সুকুমার চমকে উঠলো। কিন্তু সে নিজেকে দমন করতে পারলে না, বরং উল্লাসে কলরব ক'রে উঠলো, ধন্যবাদ। প্রার্থনা করি আমাদের জীবনযাত্রার পথে আমরা দুজনে যেন এক হ'য়ে গড়ে উঠি! তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শাশ্বতীর দিকে অগ্রসর হ'লো। শাশ্বতী ফিরে দাঁড়াল। এবং পরক্ষণেই মাথা উঁচু ক'রে দৃপ্তস্বরে বললে, বাড়ী যান সুকুমার বাবু, আপনি প্রকৃতিস্থ নন্।

সুকুমার সশব্দে হেসে উঠে তার একখানা হাত ধ'রে ব'লে উঠল, তোমার আদেশ অবশ্য আমায় মেনে চলতেই হবে, কিন্তু—

শাশ্বতী সজোরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে অপরিসীম ক্রোধে অধীর হ'য়ে বললে, কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবার মতো অবস্থা এখন আপনার নেই। ভুলে যাবেন না সুকুমার বাবু, এটা বিলেত নয়!

সুকুমার বললে, ও হাত ধ'রেচি বলে! আই সী! কপালে সিঁদুরটুকু না ওঠা পর্য্যন্ত এদেশের মেয়েরা দখল দিতে চায় না, বা স্বামীর কোন স্বত্ব জন্মায় না—না?

সে কথায় দৃক্‌পাত না ক'রে শাশ্বতী নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুকুমার হঠাৎ তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

শাশ্বতী যাবার পথ খুঁজলে—সুকুমার বাধা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাকলে, শাশ্বতী ডিয়ার! তুমি হয়তো জানো না কতোখানি আমি তোমাকে চাই! সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ত আবেগে শাশ্বতীর হাত চেপে ধরলে।

শাশ্বতী ভয় পেলে। সে রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, সুকুমার বাবু!

সে স্বরের প্রতিধ্বনি বাতাসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তীরের বেগে একটুক্‌রো মোটা কাঠ বাতাসে ভেসে এসে সুকুমারের একটা পায়ে সজোরে আঘাত করলে। সুকুমার একটা আর্ত্তধ্বনি ক'রে দু'হাতে নিজের পা'টা চেপে ধ'রে মাটিতে ব'সে পড়ল।

সুকুমার বাবু!

ব্যস্ত হ'য়ে চকিতে শাশ্বতী ফিরে দাঁড়াল।

ছোড়দি, বাড়ী চলো! অজু এসে বললে।

লজ্জায় ক্ষোভে মর্ম্মাহত দৃষ্টি দিয়ে শাশ্বতী অজুর মুখের পানে চাইলে। অজু মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে মাথা নীচু করলে।

সেদিনের সুকুমারের ঘটনাটি রেবা ছাড়া সকলের কাছেই গোপন রয়ে গেল। রেবাও হয়ত এর কোন কিছুই জানতে পারত না, কিন্তু দুটি দিন কাটতে না কাটতে রেবাকে এ ঘটনাটি সবিস্তারে বলবার জন্যে শাশ্বতী যেন মনের মধ্যে একটা তাগিদ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু নিজের মুখে এ কথাটি বলতে গিয়ে কেমন যেন সে বাধা পেল। তাই কৌশলে অজুকে দিয়ে একসময়ে রেবার সামনে এ প্রসঙ্গের

উত্থাপন করতেই সে সাহস পেয়ে রেবাকে সব কথা বলে ফেললে। অজু যখন বললে, ছোড়্দিকে হাত ধরে টানাটানি করতে দেখে আমার ভারি রাগ হলো, আমি আর সামলাতে না পেরে তাঁর পায়ে তাক্ ক'রে একটা ঘুঁটির টুকরো ছুঁড়ে দিলুম, শাশ্বতী তখন তাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের সুরে বললে, তুমি একটি ক্ষুদে ডাকাত—বড় হলে দাদাকে ছাপিয়ে উঠবে।

এ কথায় রেবার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেই নিমেষে মিলিয়ে গেল। সে মুখ তুলে তাদের আনন্দ কলরবে যোগ দিতে পারলে না। একটা প্রচণ্ড আঘাতের ব্যথায় তার মুখখানা যেন মরার মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

শাশ্বতী ব্যথাতুর দৃষ্টি দিযে তাব মুখের পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

রেবা বলে উঠলো, এ আমি মুখ বুজে সইতে পারবো না শাশ্বতীদি। আমি বডদিকে সব লিখবো।

ছিঃ! লাভ কী? শাশ্বতী তার মুখের উপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দিল।

রেবা বললে, কিন্তু এর সবটাই চেপে গেলে এ বিযে ভাঙবো কেমন ক'রে? শৈলেনদা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছে। তার শেষ আশা মুছে গেছে পিসেমশায়ের কথায। তিনি স্পষ্টই সেদিন সবার সামনে ব'লেছেন, ওর সঙ্গে মেযের বিয়ে দেব ব'লেই চাকরী গ্রহণ করবো না,—ওদেব দয়ার দান হাত পেতে নিতে পারবো না।

শাশ্বতী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না রেবা! আমার বাবাকে আমার চেয়ে বেশী কেউ চেনে না!

রেবা শাশ্বতীর মুখের পানে তাকালে। রেবার মুখখানা যেন বড ম্লান, বড় বিমর্ষ দেখালো। শাশ্বতী ডাকলে, রেবা!

রেবা মুখ তুলে চাইতে পারলে না, শাশ্বতী লক্ষ্য করলে অশ্রুর আভাসে তার চোখদুটি ছলছল ক'রচে। শাশ্বতী তার চিবুক ধ'রে মুখখানা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে বললে, ঢেউটা যে কোথা গিয়ে লাগলো রেবা আর তার প্রচণ্ড আঘাত যে কাকে তটভূমির কঠিন মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল, কাল হ'তে আমি সেই কথাটাই ভাবচি, আর লজ্জায় তোর মুখের পানে চাইতে পারচি নে।

রেবার চোখ ছাপিয়ে দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

শাশ্বতী আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বললে, আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তোর মনের কথা! তোর ভালোবাসার যে একটা সত্য পটভূমিকা আছে, এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে আমাকে। তাই ভাবছি রেবা, এর পর তুই দাঁড়াবি কোথায়? পুরুষের যশই যে আমাদের সব চেয়ে বড় সঙ্গতি—তারই ওপর ভর ক'রে যে আমাদের সারাজীবন কাটাতে হয়!

রেবা আঁচলে মুখ মুছে হাসলে।

শাশ্বতী বললে, হাসচিস্ যে?

রেবা আবার গম্ভীর হ'য়ে বললে, ভালোই তো হলো! ফাঁড়াটা কেটে গেল!

শাশ্বতী নিঃশব্দে তার পানে চেয়ে রইল; রেবা বললে, সময় থাকতে যে ওর স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল, এই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় শাশ্বতীদি? আরো কিছুদূর এগুলে যে মারাত্মক হ'য়ে উঠতো! ফেরবার পথ পেতুম না!

শাশ্বতী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, আর এখন? তুই ফিরে যাবি? কী ব'লছিস্ তুই রেবা?

তা ভিন্ন আর উপায় কি ভাই?

রেবার গলার স্বর ভেঙ্গে এলো, তার দু'চোখ আবার জলে ভ'রে গেলো। বললে, এর পরও কি ওর মূল্য বুঝতে দেরি লাগে? ওর সম্বন্ধে যে খুব উচ্চ আশা রাখতুম বা উচ্চ ধারণা ছিল, এ কথা আমি মানি না। তবে জীবনে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল, একথাও অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষ ক'রে, তোমার চিঠি পাবার পর হ'তে আমি যেন কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লেগেছিলুম—তোমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। ও যত এগিয়ে গেছে তোমার দিকে, আমি প্রাণপণে বাধার সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজেই জালে জড়িয়ে পড়েছি। তোমার অভাব পাছে ওকে ব্যথিত ক'রে তোলে তাই ওর প্রতি আমার করুণার অন্ত ছিল না। আমি আমার মত, আমার বিশ্বাস নিজের অগোচরে চোখ বুজে অন্ধের মত ওকে সমর্পণ করেচি—

শাশ্বতী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, এর পরও তুই ফিরে যাবি বলচিস্ রেবা? পারবি না? চেষ্টা করলে ওর এ ত্রুটিটুকু কি পূরণ ক'রে নিতে পারবি না?

রেবা ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে, না। সমারোহ ক'রে আত্মহত্যা করা চলে না, শাশ্বতীদি। যদি আত্মহত্যা করতেই হয়, আমি নীরবে শুকিয়ে মরতে রাজী আছি, তবু আমি এ অসম্মান সইতে পারবো না। যারা মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের কাউকে মেনে নেওয়া মানে অপঘাতে প্রাণ দেওয়া—

শাশ্বতী কি বলতে যাচ্ছিল, রেবা বাধা দিয়ে বললে, না শাশ্বতীদি, যাকে ভালোবাসি তার ঘৃণাকে আমি সব চেয়ে ভয় করি।

আলোকলতা এসে ঘরে ঢুকলেন, শাশ্বতী উঠে মায়ের সামনে দাঁড়াল, রেবা নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলে।

আলোকলতা বললেন, সুকুমার, শুনলুম, এখানকার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চাকরবাকরদের জবাব দিয়ে কলকাতা চ'লে গেছে?

রেবা ফিরে দাঁড়ালো। আলোকলতা বললেন, এই চিঠিখানা তোমায় দিয়ে গেছে ওদের চাকরের হাতে।

শাশ্বতী কম্পিতহাতে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করে পড়লে। দু'লাইনের ছোট্ট চিঠি:

মিস ঘোষাল,

চলার রাস্তা ভুল ক'রেই তোমার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিলুম। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তোমার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আমি স'রে যাচ্ছি। তোমাকে তোমার আসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে হ'লে তপস্যার প্রয়োজন।

পথভ্রষ্ট—

সুকুমার

চিঠিখানা প'ড়ে মায়ের মুখের পানে চেয়ে শাশ্বতী বললে, পড়ে শোনাব মা?

কা লিখেছে?

শাশ্বতী চিঠিখানা প'ড়ে শোনালে। আলোকলতা উদাসিনার মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ আর তাঁর কোন বিরোধিতা নেই, কোন অভিমান নেই। রেবা মুখ বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাধা পেল—পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন অবিনাশ!

অবিনাশ বললেন, জানি। ভুল একদিন ধরা পড়বেই! আর মানুষের মূল্য মানুষকে দিতেই হবে!

একুশ

সুকুমারের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আলোকলতা যেন আপনা থেকেই শাশ্বতীর বিবাহ ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তাঁর তরফ থেকে কোন বিরোধের সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, অতি ক্ষুদ্র অভিযোগটি পর্য্যন্ত তাঁর কাছ থেকে আর শোনা গেল না। এবং শাশ্বতীর বিবাহ যে উপস্থিত স্থগিত রইল, এ সংবাদটি হিরণ্ময়ী প্রভৃতির কর্ণগোচর করতে তাঁর সঙ্কোচ বা দ্বিধার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। বেশ সুসংযত সহজকণ্ঠেই তিনি সেদিন সবার সামনে হিরণ্ময়ী ও হরেনবাবুকে বললেন, বিয়ের ব্যাপার সবটাই দৈবের হাতে। আমরা হাফাহাফি ক'রে মরলে কী হবে! সময় না হ'লে হবার জো নেই! আর যার সঙ্গে বিধাতার লিখন, ঠিক সময়টিতে তারই হাতে গিয়ে পৌঁছবে।

হরেন, হিরণ্ময়ী ও অবিনাশ সকলে একযোগে হেসে উঠলেন। তাদের হাসিতে যোগ না দিয়ে নীরব দৃষ্টি তুলে আলোকলতা বললেন, ঘটনার বিচিত্র গতি দেখে বুঝচো না?

হরেন বললেন, তুমি যে বুঝেচো বোঠান্, সেই সবচেয়ে বড় কথা। সেইটেই পরম সান্ত্বনার কথা। বিয়ে একদিন হবেই নিঃসন্দেহ এবং ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারবে না। মিছে লাফালাফি দৌড়ঝাঁপ করা।

আলোকলতার এই নিশ্চিন্ততা আর যাকেই সান্ত্বনা দিক এবং আশ্বস্ত ক'রে তুলুক, শাশ্বতীকে কিন্তু আড়ষ্ট ও চিন্তিত ক'রে তুলল। শাশ্বতীর চোখে তার মায়ের চেহারা বা গলার স্বর আজকাল খুব স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না।

বিশেষ ক'রে সকল ব্যাপারে মায়ের নীরবতা তার মনের উপর কেমন একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কের ছায়াপাত করে। একটা আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে সে সদাই উন্মুখ হ'য়ে থাকে। সে এটা মনে মনে বেশ বুঝতে পারে যে, যে ছিল এই সংসারের প্রাণ, যার ইঙ্গিত-ইশারায় সংসারটা চলাফেরা করতো, সেই যেন আজ নিতান্ত অসহায়ার মতো আশ্রয়-কোণ খুঁজে বেড়ায়, যাকে সংসারের সবাই সমীহ ক'রে এসেচে, যার বিচার-বুদ্ধির ওপর তার বাবা পর্য্যন্ত কোনদিন কটাক্ষ করবার সাহস করেন নি, সেই আজ সহসা যেন সর্ব্বস্ব হারিয়ে দেউলে হ'য়ে গেছে—আর

তার কিছু নেই ! তার যা কিছু গর্ব্বের, যা কিছু অহঙ্কারের সবই যেন লুপ্তগৌরবের পিছনে পড়ে আছে। তাই সে আর এগোতে চায় না। যে অহঙ্কার ছিল তার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য, আজ সেই অহঙ্কারের স্থানটিই গেছে শূন্য হ'য়ে ! এই বিরাট অবসাদ মা যে কি দিয়ে পূরণ করবেন, এই হ'লো শাশ্বতীর সবচেয়ে বড় চিন্তা।

সেদিন হিরণ্ময়ীরা যখন চ'লে যান আলোকলতা সকরুণ চোখে হিরণ্ময়ীর হাতদুটি ধ'রে বলেছিলেন, ভুলিস্‌নি ভাই, আবার আসিস্ ! দেখে যাচ্ছিস্ তো, আমার আর কেউ নেই, কেউ রইলো না !

শাশ্বতী যখন হিরণ্ময়ীকে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম করলে, আলোকলতা বললেন, আর বলতে সাহস হয় না। তবু ঘটনার গতি দেখে মনে হ'চ্চে যেন তোকেই শাশ্বতীকে নিতে হবে। ভেবে দেখিস যদি—

অবিনাশ ও হরেন ঘরে ঢুকলেন। হরেন বললেন, অতো 'কিন্তু' হ'চ্চো কেন বৌঠান্। যাকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো আর আমাদের আদেশ করো, মা লক্ষ্মীকে আমরা ঘরে নিয়ে যাই। আদেশই তো ক'রে এসেচো চিরদিন ভাই—

হিরণ্ময়ী শাশ্বতীকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আলোকলতা নিঃশব্দে চোখ মুছলেন।

হিরণ্ময়ীরা চলে যেতেই কিন্তু আলোকলতা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হ'য়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। শাশ্বতী ও অবিনাশ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এদিকে হিমাংশুও বাড়ী নেই। রেবাকে নিয়ে সে দুম্‌কা গেছে ট্রেনের মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে। শৈলেন সংবাদ দিয়েছিল, সেও দুম্‌কায় আস্‌চে। কথা ছিল দুম্‌কা থেকে হিমাংশু রেবাকে নিয়ে কলকাতা যাবে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে।

এ অবস্থায় অবিনাশ একা কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে যেন পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। শাশ্বতী নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে মায়ের পরিচর্য্যায় লেগে গেল। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ পাওয়ামাত্রই পাড়ার প্রবীণ চিকিৎসক অনুকূলবাবু এসে উপস্থিত হলেন। আলোকলতাকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি হেতু সংজ্ঞাহীন হয়েচেন। বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট। তবে প্রথম আক্রমণ, সেরে যেতেও পারেন।

আশা ও নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে পিতাপুত্রীতে মুখ-চাওয়াচাওয়ি

করলেন। অবিনাশ বললেন, সত্যিই কি অভিমান ক'রে চলে যাবে রে শাশ্বতী! আমি যে সারাজীবন ওর অভিমানকেই সবচেয়ে ভয় ক'রে এসেচি মা! ও যে বড় অভাগিনী!

শাশ্বতী আঁচলে চোখ মুছে বললে, তুমি দাদাকে টেলিগ্রাম ক'রে দাও বাবা। দাদা আসুক—

অবিনাশ বললেন, তা না হয় দিলুম মা, কিন্তু তোমাকে শৈলেনের হাতে দেবার মতো সময়টুকুও কি দেবে না? আমি ভাবছিলুম কি মা, শৈলেনও যখন এসেছে দুম্‌কায়, শৈলেনকেও ডাকি। যদি জ্ঞান ফেরে, অন্ততঃ তার মুখে শুনে যাক্ যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান সে-ই তোমায় দিল।

পিতার ইচ্ছাকেই শাশ্বতী চিরদিন নিজের ইচ্ছা ব'লে মেনে নিয়েছে, কাজেই সে নিঃশব্দে মাথা নত করলে।

অবিনাশ শাশ্বতীর আনত মাথার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, যা পারিনে তার দুঃখ থেকে যাবে চিরদিন আমার মনে—যা পারি তার সুখ হ'তে ওকে বঞ্চিত করবো কেন মা?

শাশ্বতী অঝোরে কাঁদতে লাগল।

হিমাংশুকে তার করা হলো, কিন্তু হিমাংশু ফিরলো না। দিন দুই পরে তারটা ফিরে এলো। কল্‌কাতায় অবশ্য নিবারণবাবুকে সংবাদ দেওয়া হয়েচে, তবুও হিমাংশুকে আবার কলকাতায় তার করা হলো। তৃতীয় দিন ভোরের দিকে আলোকলতার জ্ঞান ফিরে এলো। শাশ্বতী মার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ডাকলে, মা, মাগো—

আলোকলতা তার মাথাটি বুকের ওপর চেপে ধরলেন। তার দু'চোখ জলে ভরে এলো।

অবিনাশ ডাকলেন, ছোট বউ—

আলোকলতা বললেন, আমি ভাল আছি তো। হিমাংশু কই?

শাশ্বতী বললে, দাদা কল্‌কাতা থেকে ফেরেনি মা। আস্‌তে তার করা হয়েচে।

আলোকলতা বললেন, আবার তার করতে গেলে কেন, হাঁফাহাঁফি ক'রে ছুটে আসচে।

অবিনাশ মৃদু হাসলেন।

হিমাংশু ফিরলো না, তার বদলে এলো একখানা খামে দু'খানা চিঠি। হিমাংশু লিখেচে একখানা, রেবা আর একখানা।

মা'র অসুখের সংবাদ পৌছবার আগেই চিঠিখানা লেখা। হিমাংশু সেইরাত্রেই উড়িষ্যা রওনা হচ্ছে—সেখানে শৈলেন এক কাণ্ড ক'রে বসেচে। রতনগড়ের জঙ্গলে রাজার সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে এক শিকারীর গুলিতে আহত হ'য়ে শৈলেন হাসপাতালে। সেই কারণেই সেদিন সে দুম্‌কা কোর্টে উপস্থিত হ'তে পারেনি। কল্‌কাতায় পৌছেই রেবাকে রেখে সে উড়িষ্যা ছুটেচে।

রেবাও সেই কথাই লিখেচে। হিমাংশুর সঙ্গে তারও যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিদেশে তার জন্যে পাছে হিমাংশুকে বিব্রত হ'তে হয় তাই তার যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

শাশ্বতী চোখে অন্ধকার দেখলে। অদৃষ্টের এ কী বিচিত্র পরিহাস! এ কী পরীক্ষা! শৈলেন সম্বন্ধে এতদিন সে যা ভয় ক'রে এসেচে তাই ঘটল! শাশ্বতী অৰ্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় অনেকক্ষণ কাঠ হ'য়ে ব'সে রইল। কী যে করবে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

শেষে একসময় হিমাংশুর চিঠিখানা সে অবিনাশকে দিয়ে বললে, দাদা কিয়োঞ্ঝোরে গেছে।

চিঠিখানা পড়ে অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ ব'লে উঠলেন, সে কী মা? এ আবার কী দুঃসংবাদ শোনালি? এর কী শেষ নেই? যেখানে আশা সেইখানেই বাধার পাঁচিল উঁচু হ'যে ভবিষ্যতের আলোটুকু আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্চে মা!

শাশ্বতীর বুকের নীচেটা একটা অসহনীয় ব্যথায় মুচ্‌ড়ে উঠল। বাবার মুখে চিরদিন আশ্বাসের বাণী শুনতেই সে অভ্যস্ত, তাঁর অটল অন্তস্তলের এই ওলোট-পালোট সে কখনো আশা করেনি। তবে কী বিপদের মাত্রাটা দুর্লঙ্ঘ্য! শিউরে উঠলো শাশ্বতীর সমস্ত শরীর। অস্থির ভঙ্গীতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আশা ও নিরাশা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মিশিয়ে পিতাপুত্রীর অন্তরে অশান্তির উপদ্রব চলতে থাকে। আলোকলতা উন্নতির পথ নিয়েছেন, কিন্তু শৈলেনের কোন

সংবাদ নেই। অবিনাশ লক্ষ্য করেন মেয়েব ছটফটানি। নিঃশব্দে শুধু মমতামাখা দৃষ্টি তু'লে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সারাক্ষণ শাশ্বতী শৈলেনের চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকে। অতর্কিতে মায়ের ডাকে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, ধরা প'ড়ে যায়। অন্তরের আলোড়নে সে মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে ওঠে। অথচ নিজেকে কিছুতেই সে দমন করতে পারে না। প্রিয়তমের ভাবনায় সে যেন ধূপের মত তিলে তিলে পুড়তে থাকে। তার মনে হয় সে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেচে, নদীর মত লীন হ'য়ে গেছে সাগরের বুকে—নিজের আর অস্তিত্ব নেই। এই উপলব্ধি তাকে ব্যথা দেয় কি আনন্দ দেয়, সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। শৈলেনের সংবাদের আশায় সে সর্ব্বদাই উন্মুখ হ'যে থাকে, একটা শঙ্কিত আচ্ছন্নতা তার গভাব শান্ততাকে ম্লান ও ম্রিয়মাণ ক'রে তোলে।

মায়ের কাছে পদে পদে বাধা পেযে বাপের ওপর শাশ্বতীর নির্ভর একান্ত ও মজ্জাগত হ'য়ে গিয়েছিল। বাপের সেবাই ছিল তার জীবনের একমাত্র সাধনা; বাবাই ছিল তার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এত ভক্তি সে আর কোন মানুষকে, কোন দেবতাকেও দিতে পারেনি। কিন্তু আজ তার মনে হ'লো, শৈলেন যেন তার অন্তর জুড়ে ব'সে আছে। তার নিষ্ঠা-ভক্তি, সারা জীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইহকাল-পরকাল সবই যেন ঐ একটি লোকের পাষাণ বেষ্টনীর মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারই কল্যাণ কামনায তার বুকের নীচেটা যেন তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

পূর্ণোদ্যমে যে-বাড়াতে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চল্‌ছিল, সেখানে যে বিনা কারণে হঠাৎ এমনি একটা বিপ্লব ঘটবে, এটা যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর। বিবাহ-সম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হ'য়ে গিয়েছিল, এমন কি দিনস্থির ক'রে আলোকলতা গোবিন্দপদবাবুকেও চিঠি লিখেছিলেন। গোবিন্দপদবাবুর একমাত্র বিলেত-ফেরত ছেলের বিবাহ, কাজেই আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না। বাড়ীতে রঙ্‌ মাখানো থেকে আরম্ভ ক'রে কেতাদুরস্তভাবেই আয়োজনপর্ব্ব সুরু হয়েছিল। হঠাৎ যে সেই পাকাপাকি ব্যবস্থার এমনিভাবে অপমৃত্যু ঘটতে পারে, এ সম্ভাবনা গোবিন্দপদবাবুর মত বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারীরও বুদ্ধির কেতাবে লেখে নি।

অবিনাশের তরফ থেকে কোন কারণ দর্শানোর চেষ্টা নেই। হঠাৎ একদিন সুকুমার ফিরে এসে সুলতা মারফত বাড়ীতে জানিয়ে দিল, এ বিয়ে হবে না, হ'তে পারে না। উপরন্ত তার অনুরোধ যেন এ প্রসঙ্গটা এইখানেই শেষ হয়। কাজেই কেন হবে না, কেন হ'লো না, সে প্রশ্নটা পর্য্যন্ত চাপা পড়ে গেল। সুকুমারের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সুলতার পর্য্যন্ত এগিয়ে যাবার সাহস হ'লো না, দুর্নিবার কৌতূহলকে দমন করতে হ'লো। ইতিমধ্যে সাবজজ্ হ'য়েও অবিনাশের কাজে ইস্তফা দেওয়ার সংবাদটা গোবিন্দপদবাবুর কানে পৌঁছেচে। তাঁর এতোখানি দৌড়ঝাঁপ ক'রে উমেদারি করা সব ব্যর্থ হয়েছে। এই চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার মাঝেই যেন গোবিন্দপদবাবুর দূরদর্শী তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিবাহ না-দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত মনে মনে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বুকের মাঝে একটা রূঢ় ধাক্কা খেতে হলো। অথচ এতবড় ধাক্কাটাকে অবাধে ও নিঃশব্দে সহ্য করবার মত মানুষ তিনি নন্। অবিনাশের ভদ্র আচরণের প্রশংসাপত্র পেয়েচেন তিনি অনেকের কাছে। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান, তাঁর ঔদার্য্য গোবিন্দপদবাবুকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু এতখানি অগ্রসর হ'য়ে যে অবিনাশের মতো বিচক্ষণ লোক এমনিভাবে বিনা কারণে পিছিয়ে যাবেন, এর মাঝে তিনি কোন সঙ্গতি খুঁজে পেলেন না। অথচ অবিনাশ কন্যার পিতা হ'য়ে ছোট্ট কৈফিয়ৎটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না। গোবিন্দপদবাবুর প্রকৃতিগত কাঠিন্য অবিনাশের এই আপত্তিকর আচরণে সায় দিতে পারলো না। তিনি বেশ গম্ভীর হ'য়েই স্ত্রীকে বললেন, না, এর পর আর কোন রকমেই কোন সন্ধি-টন্ধি হ'তে পারে না। সে-ইচ্ছে থাকলে এতদিনে সন্ধির প্রস্তাব আসা উচিত ছিল ও-পক্ষ থেকে।

তা হ'লে কি করবে? শুষ্ক-মুখে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

গোবিন্দপদবাবু রায় দিলেন, বিয়ে হবে, এই মাসেই। এতদূর এগিয়ে, ওখানে বিয়ে হ'লো না ব'লে বিয়ে বন্ধ রাখা অসম্ভব। লোক হাসবে। তা ছাড়া, ও-প্রশ্রয় আমি অবিনাশ ঘোষালকে দেব না।

স্ত্রী বললেন, বেশ তো বাপু, রেবার সঙ্গেই পাকাপাকি ক'রে ফেলো। আমার সেই তো বরাবরই মনের ইচ্ছে। সুকুমার যখন বিলেতে তখন থেকেই সুলতা বৌমার সঙ্গে আমার কথা। আর আমার মনের কথা তো তুমি জান,

রেবাকেই আমার পছন্দ। তবে নাকি ছেলে ঘোষালের মেয়েকে দেখেই ঝুঁকে বসল, তাই চুপ ক'রে গেলুম। নইলে অত গম্ভীর মেয়েকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। মেয়ের যেন সব পণ্ডিতি-পণ্ডিতি ব্যবস্থা। না আছে তেমন মুখে হাসি, না আছে একটু ছেলেমানুষি। ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই! তুমি ঐখানেই ঠিক ক'রে এস। আমি বরং সুলতা বৌমাকে ডেকে সুকুমারকে বলতে বলি।

ছেলের মত হবে ত? গোবিন্দপদবাবু প্রশ্ন করলেন।

হবে। সে আমি জানি। তুমি বরং নিবারণ বাবুর সঙ্গে দেখা কর। তুমি দেখো, ঐখানেই হবে।

স্ত্রীর কথায় উৎসাহিত হ'য়ে গোবিন্দপদবাবু দৃঢ়ভাবে বললেন, বেশ, সেই ব্যবস্থাই আমি করচি। কিন্তু পরক্ষণেই কি যেন একটা ভেবে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, কিন্তু আমার নিজের যাওয়াটা কি ভাল হবে?

কেন? নিবারণ বাবু তো পর নন্—তিনি হলেন বৌমাব বাবা, তাঁর কাছে যেতে কি আপত্তি থাকতে পারে!

গোবিন্দপদবাবু আর প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পেলেন না। বরং নিজের এই আপত্তিতে নিজেই যেন লজ্জিত হ'যে পড়লেন।

বাইশ

এই ক'টি দিনের মধ্যেই রেবার সবকিছু যেন বদ্‌লে গেছে। এ রেবার মধ্যে পূর্ব্বেকার সেই প্রগল্‌ভা, মুখরা, চঞ্চলা রেবাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন শাশ্বতীর প্রতিবিম্ব!

রেবার এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সুলতা সত্যিসত্যিই ভয় পেযে গেল। বললে, রেবা, সত্যি ক'রে বলবি, কি তোর হয়েছে? তোকে যে কোন দিন এমন গম্ভীর দেখব, এ আমি কখন ভাবি নি।

রেবা ক্ষীণহাসি হেসে বললে, তোমার নিজের মনটাই গম্ভীর হ'য়ে আছে তাই আমাকেও গম্ভীর দেখচ। এখন কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, বল ত?

সুলতা সঙ্কোচে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল, কি যে বলবে ঠিক করতে পারলে না।

রেবা নিজেকে সহজ ক'রে নেবার জন্যে একটু মুচকে হেসে বললে, কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছ, বলব ? তোমার ঠাকুরপো রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এলেন কেন, এটাই জানতে চাও তো ?

ঠিক বলেছিস্ রেবা—ঠিক তাই। কিন্তু তোর মুখের চেহারা দেখে আমার যেন এ প্রশ্ন আর তোলবার সাহস হচ্ছিল না। সত্যি ক'রে বল্ ত, ঠাকুরপো'র সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে হ'লো না কেন ?

এই সোজা কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারনি ?

সুলতা বললে, জিজ্ঞাসা আমি অনেক রকমেই করেছি কিন্তু কিছুই সে বলতে চায় না। তা ছাড়া, আজকাল এমন একটা গম্ভীর ভাব ক'রে থাকে যে সব কথা সব সময়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস হয় না।

রেবা হঠাৎ খুব হেসে উঠল। বললে, তোমার কি হ'লো দিদি! আমাকে দেখেও তো তোমার সাহস হয় নি।

এবার সুলতা আবহাওয়াটা বেশ সহজ বোধ করলে, তাই সেও হেসে উঠল। বললে, তোরা কখন কি চালে চলিস্, সে বোঝবার সাধ্য কি আমার আছে! তাই তো তোদের গম্ভীর মুখ দেখলে মনে হয়, নিশ্চয় কোন গুরুতর সমস্যা নিয়ে তোরা মাথা ঘামাচ্ছিস। তোদের সঙ্গে সাবধান হ'য়েই কথা কওয়া ভাল।

রেবা হেসে বললে, বুঝ্‌চ ত! কিন্তু আমি তো একা তোমার সঙ্গে কথা কইচি, তবে বহুবচনটা ব্যবহার করচ কার উদ্দেশ্যে ?

সুলতা মুচকে হেসে বললে, তোর একার মধ্যেই তো আমি আর একজনকে দেখতে পাচ্ছি—আজকাল কি আর তুই একা আছিস! তোকে দেখলেই আমার আর একজনকে যে মনে পড়ে যায়!

রেবা বললে, তাহ'লে তোমার দিব্যচক্ষু খুলেছে বল!

যা-ই বলিস্ রেবা, তোদের দু'জনকে যেমন মানায়, শাশ্বতীর সঙ্গে তেমন মানায় না। আমার মনে হয় ভবিতব্য তোদের দু'জনকে এক করবার জন্যেই এই বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

রেবা আবার গম্ভীর হ'য়ে গেল। বললে, তোমার এই সব বাজে কথা বারবার শোনাবার জন্যেই কি তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ ?

সুলতা কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, রাগ করিস নি ভাই, আমার যেটা সব চেয়ে বড় সাধ সেই কথাটাই বলচি।

রেবা প্রতিবাদস্বরূপ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সুলতা তার অবকাশ না দিয়েই ব'লে উঠল, তোর কথা আমি আর শুনব না—আমি যা ভেবেছি তাই হবে।

রেবার মুখখানা একেবারে ফেকাশে হ'য়ে গেল। বললে, একদিন হয়ত তোমার কথাই ফলতে পারত, কিন্তু আর তার হবার উপায় নেই। তোমার ঠাকুরপো আমার সব আশা নির্ম্মূল ক'রে দিয়েছেন। বলতে বলতে তার চোখ দু'টো অশ্রুতে ভরে উঠল।

সুলতা অবাক্! এমনটা সে মোটেই আশা করেনি। এখন সে বেশ বুঝতে পারলে রেবার যে-পরিবর্ত্তন সে একটু পূর্ব্বে লক্ষ্য করেছিল, আসলে সেটা তার মনেরই প্রতিচ্ছবি। জোর ক'রে সে তাকে হাসি-তামাসার মধ্যে টেনে আনলেও তার মনের আসল সংবাদের সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই নেই।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্নেহ ও মমতাভরা চিত্তে সুলতা বললে, জানি না কিসে তুই এত ব্যথা পেয়েছিস, কিন্তু এটা বলতে পারি, ঠাকুরপো'র কাছে তোর স্থান শাশ্বতীর চেয়ে এতটুকু কম নয়।

একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে রেবা বললে, তুমি যে কত বড় মিথ্যাকে আঁকড়ে ধ'রে আছ তা তুমি জান না দিদি। তোমার ঠাকুরপো'র আর যত ভুলই হোক্, তোমার এই বোনটি সম্বন্ধে মনের ধারণা কোথাও এতটুকু অস্পষ্ট নেই। যদি থাকত, তাহ'লে অমন ক'রে সেদিন শৈলেনদা'র কাঁধে তাকে চাপিয়ে দেবার জন্যে তিনি অতো ওকালতি করতেন না। সত্যি বলচি তোমাকে, নিজের অন্তরের তাগিদে আমি তাঁর সবকিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু যার কাছে একটুকুও ভালবাসা পাব না, তা জেনেও তাঁকেই জীবনে স্বীকার ক'রে নেব, এতবড় ভুল আমি শোধরাব কি ক'রে!

সুলতা ব'লে উঠল, না রেবা, এ সত্যি নয়। সে যে তোকে কত ভালবাসে তা আমি জানি। শৈলেনবাবুর ব্যাপারটা কি, আমায় খুলে বল্ দেখি। তাঁর কাঁধে তোকে চাপিয়ে দিয়ে ঠাকুরপো'র কি লাভ!

লাভ না থাকলে কি তোমার বিলিতী ঠাকুরপো এই ফন্দি আঁটতে যেতেন? নিজের স্বার্থের জন্যে মানুষ অনেক কিছু করে, কিন্তু যা একেবারে মিথ্যা, যার মধ্যে সত্যের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নেই, তাকেই প্রত্যক্ষ সত্য ব'লে চালিয়ে দেওযার চেষ্টার মধ্যে যে যথেষ্ট বাহাদুরি আছে তা মানতে হবে। তিনি বেশ জানেন আমার দুর্ব্বলতা কোথায়, কিন্তু সব জেনেশুনেও সেদিন সভা ক'রে শৈলেনদা'র কাঁধে আমায় চাপিয়ে দেবার ওকালতিতে তাঁর যে উৎসাহ দেখেছি তা তো মিথ্যা নয়!

সুলতা অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু কেন?

একটু ম্লানহাসি হেসে রেবা বললে, তুমি সত্যিই বোকা দিদি। এটা বুঝছ না যে, শাশ্বতীদি যাঁকে ভালবাসে তিনি হচ্ছেন ওঁর কতবড় প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব তাঁকে যদি আমাকে দিয়ে আটকে ফেলা যায় তাহ'লে ওঁর নিজের পথটা কতটা সুগম হ'যে ওঠে।

কিন্তু শাশ্বতীর সেই চিঠি থেকে আমি যা বুঝেছি তাতে তো ঠাকুরপো'র কোন আশাই নেই।

রেবা তেমনি ম্লান হেসে বললে, তোমার ঠাকুরপো তো শাশ্বতীদি'র মনের খবর জানতে চান নি—নিজের প্রয়োজনকেই তিনি সবচেয়ে বড় আসন দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন সত্যিই বুঝতে পারলেন যার পিছনে তিনি এতদিন ছুটাছুটি করেছেন তাকে পাওয়া তাঁর সাধ্যে নেই, সেদিন পরাজয়ের কালি মুখে মেখে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ছাড়া আর উপায় কি।

সুলতা মুচকি হেসে বললে, তবে তো গোলমাল চুকেই গেছে। এখন তোর আর ভাবনা কিসের।

এ কথায় রেবা সত্যিই রেগে গেল। বললে, তুমি কি বলতে চাও যে, যাকে বিবাহ করব তার ভালবাসার উপর আমার কোন দাবি থাকবে না? শুধু স্ত্রী হ'য়েই তার ঘর করব!

তুই অবাক্ করলি রেবা। বিয়ে হবে, অথচ ভালবাসা থাকবে না, এ কি সম্ভব!

সম্ভব নয় কেন? তোমার ঠাকুরপো যে শাশ্বতীদি'কে সত্যিই ভালবাসেন এটা তো মিথ্যে নয়। আর শাশ্বতীদি'কে না পেয়ে তাঁর মনটা যে ভেঙ্গে গেছে,

এটা তো অস্বীকার করতে পার না! তবে, আমাকে বিয়ে করলেই তাঁর মনটা জোড়া লেগে যাবে, তার নিশ্চয়তা কোথা! এমন তো হ'তে পারে, শাশ্বতীদি'র চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে অনুক্ষণ জেগে থাকবে, আমি শুধু তাঁর বাইরের স্ত্রী হ'য়ে থাকব!

সুলতা এতক্ষণ হাঁ ক'রে রেবার কথাগুলো গিলছিল। এখন একটা হাঁপ ছেড়ে বললে, বাবা, এর মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে! তবে তোর জামাইবাবুর সঙ্গে আমার বিয়েতে বাবা রাজী হয়েছিলেন কি ক'রে? তোর জামাইবাবুরও তো একেবারে ছেলেবেলায় বিয়ে হয় নি—তাঁরও তো মনের খবর বাবা জানতেন না! এই তো ভোর হ'তে না হ'তে তিনি কাজে চলে যান, রাত্রে যখন বাড়ী ফেরেন তখন কি পরিশ্রান্ত হয়েই না তিনি আসেন, কিন্তু কোন দিন যদি আমার মুখটা একটু শুক্নো দেখেন, তাহলে আগে তার কারণ তাঁকে বলতে হবে, নইলে আমার নিস্তার নেই। তুই ছোট বোন, বয়সে আমি তোর চেয়ে ঢের বড়, তবুও তোর ভুল ভাঙবার জন্যে তোকে বলছি, ভালবাসার কথা যদি বলিস, তাহলে বলব আমার চেয়ে সুখী বোধহয় খুব কম মেয়েই আছে। আসল কথাটা কি জানিস, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা চুল-চিরে বিচারের জিনিস নয়—ওর এমনি একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে যা কোন পক্ষই সহজে অস্বীকার করতে পারে না। বেশী লেখাপড়া শিখলে, বেশী বিচার কবার শক্তি বাড়ে, তা আমি মানি। কিন্তু বিচার মানেই তো সত্য নয, রেবা! বিচারের মধ্যে তো ভুল থাকতেও পারে!

দিদির নিকট হ'তে এমনি পাল্টা উত্তর রেবা আশা করে নি। অন্য সময় হ'লে এই নিয়ে দিদিকে সে যথেষ্ট অভিনন্দন জানাত। কিন্তু আজ নাকি সে সত্যিসত্যিই সুকুমার সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চায়, তাই গভীর আগ্রহ সহকারে সে বললে, তোমার সব কথার আমি প্রতিবাদ করচি না দিদি। কিন্তু বিচারে ভুল হয় ব'লে বিচার না ক'রেই একটা জিনিসকে মেনে নিতে হবে, এটা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। তোমার মত যারা সুখী তাদের কথা আমি বলছি না। কিন্তু এমনও তো আছে যাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবন ঠিক তোমার মত সুখের হ'তে পারে নি। আমাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই ব'লেই তাদের সবার কথা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু এ তো মিথ্যে নয়, বাইরের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে তাদের বন্ধন অটুট থাকলেও মনের

দিক থেকে তারা একেবারে নিঃস্ব। তুমি কি বলতে চাও, সেই দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনাকে জেনেও আমি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব !

রেবার শেষের কথাটায় সুলতা বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই খুব সহজ ভাবেই সে বললে, এখানে তো কোনো দুর্ভাগ্যকেই আমি ভাবতে পারচি না, রেবা। সুকুমার ঠাকুরপো শাশ্বতী সম্পর্কে যা-ই ক'রে থাক্, তোর সম্পর্কে তার মনের ভাব আমার কাছে তো এতটুকু অস্পষ্ট নয়। শাশ্বতীও তো চিঠিতে এই কথাটাই লিখেছিল। আর তোর নিজের মনের কথা তুই তো ভাল ভাবেই জানিস। তবে, দুর্ভাগ্যের কথা এখানে আসছে কি ক'রে তা আমি ভেবে পাই না। তুই বলবি, তবে সে কেন শৈলেনবাবুর কাঁধে তোকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল ? তোর সংশযের মূলে যে কিছু সত্য নেই তা আমি বলচি না, কিন্তু এটা তার ছেলেমানুষি ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারি না। এটা আমি জোর ক'রে বলতে পারি রেবা, শাশ্বতী তার চিঠিতে ঐ যে কথাটা লিখেছিল, সেটাই সত্যি,—তোর সঙ্গে তাকে না দেখলে ঠাকুরপো'কে আর এত হাঙ্গামা পোহাতে হ'ত না। প্রথম দিনের পরিচয়ে তুই আর শাশ্বতী একসঙ্গে থেকেই যে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে, শাশ্বতীর এই ইঙ্গিতটা আমিও এখন মানতে বাধ্য হচ্ছি। আসল কথাটা কি জানিস্, তোদের দু'জনার দ্বন্দ্বে ঠাকুরপো নিজেই বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। এখন যখন একটা দিকের শেষ নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে তখন আর ভাবনা কিসের ! দেখ্, তোকে সব কথা আমি এখনও খুলে বলি নি। পরশু দিন শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তোর সঙ্গে ঠাকুরপো'র যাতে বিয়ে হয়, তার জন্যে ওরা কর্ত্তা-গিন্নী একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। এমন কি, ঠাকুরপো'র বাবা খুব শীগ্গিরই আমাদের বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবার জন্যে নিজেই যাবেন। আমি যতদূর জানি বাবা-মা'র এ বিয়েতে যেটুকু আপত্তি তা এমন কিছু নয়, কিন্তু তোর মত না নিয়ে যে এ বিয়ে হ'তে পারে না তা তুই নিজেও জানিস। তাই তোর মতটা পাকাপাকি জানবার জন্যেই আমি তোকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলুম। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁদের একরকম কথাই দিয়ে এসেছি।

রেবা রাগের ভান ক'রে বললে, যদি কথাই দিয়ে এসে থাকো, তবে আমার আবার মতটা এত আড়ম্বর ক'রে জানতে চাচ্ছ কেন ?

সুলতা হেসে বললে, সত্যিসত্যিই কি তোর মত জানচি! তোর মত তো আমার জানাই আছে, নইলে গুরুজনদের কাছে কি আর কথা দিয়ে আসতে পারি—

সুলতা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সে ব'লে উঠল, ঐ ঠাকুরপো আসচে, তাকেও আসবার জন্যে আমি ব'লে পাঠিয়েছিলুম।

রেবা মুখখানা খুব গম্ভীর ক'রে সুলতার দিকে তাকালে, কি যেন একটা বলবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু কিসের একটা আবেশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হ'যে গেল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করলে এতক্ষণ সে যত কথা কয়েছে—যত তর্ক করেছে সবকিছু ছাপিয়ে একজনের পায়ের শব্দ শোনার জন্যেই সে যেন ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হয়েছিল!

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে বাড়ী ফেরবার পথে এ বাড়ীতে একবার আসা সুকুমারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু আজকের আসাটার মধ্যে এমনি একটা প্রচ্ছন্ন আশা ছিল যা তার সারাদিনের কাজকর্ম্মকেও এলোমেলো ক'রে দিয়েছে। কিন্তু বৌদি'র ঘরের সামনে যখন সে উপস্থিত হ'ল তখন অকারণেই তার মুখের চেহারাটা ভারী হ'যে উঠল। রেবাকে যেন লক্ষ্য করে নি এমনি ভাব দেখিয়ে সে বললে, আজ আমি বড় ব্যস্ত আছি, বৌদি, তাই বেশীক্ষণ বসতে পারব না। কেন ডেকে পাঠিযেছিলে বল ত?

সুলতা বললে, কাজ না থাকলে কি আর বিশেষ ক'রে ডেকে পাঠাই—কাজ একটা আছে বৈ কি। কিন্তু যদি ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাক তাহলে বলি কি ক'রে। ওঃ, তুমি বুঝি রেবাকে চিনতে পার নি, তাই ঘরে ঢুকতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

সুকুমার হাতের মোটা ফাইলটা বাইরের একটা ছোট টেবিলের উপব রেখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, রেবা দেবীকে আমার নমস্কার জানান উচিত ছিল, কিন্তু উনি গ্রহণ করবেন কিনা সেটাই ঠিক করতে পারচি না।

রেবা নিঃশব্দে দু'টি হাত তুলে সুকুমারকে নমস্কার জানাল, সুকুমারও কাজটা নিঃশব্দেই সেরে নিলে। তারপর সুলতাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, এবার বলত বৌদি, তোমার কাজের কথাটা। কিন্তু আমি সত্যই ব্যস্ত বৌদি, সেটা ভুলে যেও না।

না ঠাকুরপো, যখন এত ক'রে বলছ তখন যে সত্যিই ব্যস্ত আছ তা আমাকে মানতেই হবে। কিন্তু তোমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করবার সময়টুকু তো আমায় দেবে। এত তাড়াতাড়ি করলে আমিই বা পেযে উঠব কেন? বলতে বলতে সুলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার জলখাবার আনতে হবে না দিদি, আমিই যাচ্ছি। এই ব'লে রেবা ওঠবার উপক্রম করতেই সুকুমার বললে, এ বাড়ীতে আমাদের দেখা এই নূতন নয়, তাই আপনার উঠে না গেলেও চলবে। এখন বলুন ত' কেমন আছেন? সত্যিই, বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে যে মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু সাহস পাই নি। কি জানি একজনের কাছে যে অপরাধী হয়ে রইলুম, আবার আর একজনের কাছে সেই অপরাধই যদি ক'রে বসি, তাহলে এবাড়াতে মুখ দেখাব কি ক'রে!

রেবার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সুকুমার নিজেই বললে, আপনার কাছেও আমি অপরাধ কম করি নি। ভেবেছিলুম ভাগলপুর থেকে চলে আসবার আগে আপনার কাছে একটা ক্ষমা চেয়ে আসব, কিন্তু তার আর সুযোগ পেলুম না।

রেবা মাথা তুলেই ধীরভাবে বললে, ক্ষমা কেন চাইবেন মিঃ মুখার্জ্জি, আমার কাছে তো আপনি কোন অপরাধই করেন নি। বরং আমিই আপনার কাছে অপরাধিনী হ'য়ে আছি। সেদিন পিসিমা'র সামনে আপনাকে অতো রূঢ় কথা বলার আমার কি প্রয়োজন ছিল? না হয় শৈলেনদা সম্পর্কে আমার মনের গোপন ভাবটা আপনি তাঁদের শোনাচ্ছিলেন, এতে আর আমার রাগের এমন কি কারণ ছিল!

না রেবা দেবী, সত্যিই সেদিন আমার বড় ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। যেটা মিথ্যা সেটা কেউ-ই সহ্য করতে পারে না। আপনিই বা সহ্য করবেন কেন?

কোন্‌টা মিথ্যা, মিঃ মুখার্জ্জি? রেবার কণ্ঠের স্বরে ব্যথার সুর বেজে উঠল?

সুকুমারের বুকে সে-সুরের যেন প্রতিধ্বনি হ'ল। বললে, আচ্ছা রেবা দেবী, হিমাংশুবাবু যা বলেছিলেন, সেটা সত্যি না মিথ্যে?

একটা করুণ দৃষ্টিতে রেবা সুকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বললে, হিমাংশুদা কি আপনাকে বলেছেন তা না শুনলে সত্যি-মিথ্যে কি ক'রে বিচার করব বলুন?

তা বটে, তা বটে? কিন্তু আপনার দাদার সঙ্গে আপনার কি কোন কথা হয়

নি ? তবে তিনি জানলেন কি ক'রে ! আর তিনিই বা আমার কাছে একটা মিথ্যা কথা বলতে যাবেন কেন ?

কে মিথ্যে বলেছে, ঠাকুরপো ?—ব'লে সুলতা জলখাবার নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

সুকুমার উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠল, হিমাংশুবাবুর কথা বলছি, বৌদি। আমাকে তাঁর এতবড় একটা মিথ্যো কথা ব'লে লাভ কি !

সুলতা কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কথাটা কি বলেছে বল না, তবে তো বলবার চেষ্টা করতে পারি।

কথাটা—সুকুমার যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠে বললে, কি সব বাজে বকচি ! কিছু না বৌদি, কিছু না। তুমি জলখাবার এনেচ—খুব ভাল করেছ—ভারী খিদে পেয়েছে।

সুলতার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি উথলে উঠেই থেমে গেল। রেবা যে এই ফাঁকে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তা তারা কেউ-ই লক্ষ্য করলে না।

প্লেট থেকে একখানা নিম্‌কি মুখে তুলে দিয়ে চিবুতে চিবুতে সুকুমার বললে, এইবার তোমার কাজের কথাটা বল ত বৌদি। কিন্তু তোমার আর একটা প্লেট যে অমনি প'ড়ে রইল। উনি যদি এখানে খেতে না চান্, তাহলে ওঁর কাছে এটা পাঠিয়ে দিলেই ত হয়।

সুলতা ঝি-কে ডেকে খাবারের থালাটা রেবার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, শোন ঠাকুরপো, বেশ মন দিয়ে শোন। তোমাদের বাড়ী যে আমি পরশু দিন গিয়েছিলুম, এটা নিশ্চয় তুমি শুনেছ। কেন গিয়েছিলুম, এবং কি কথা হয়েছে, তার আভাসও নিশ্চয় পেয়েছ।

সুকুমার বাধা দিয়ে বললে, তুমি আমাকে এত জেরা করচ কেন বৌদি ? তোমার নিজের যেটা বলবার কথা, সেটাই তো সোজা ব'লে ফেলতে পার। তোমার কথা কি আমি অবিশ্বাস করব ?

না ঠাকুরপো, এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। এর মধ্যে তোমার ও রেবার জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি নির্ভর করচে। তুমি তো জান, রেবার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, এটাই আমার মনোগত ইচ্ছা। কিন্তু যখন দেখলুম তুমি শাশ্বতী'র দিকেই ঝুঁকে পড়েছ তখন আর আমি রেবার ব্যাপার নিয়ে কোন কথা উত্থাপন

করি নি। তা ছাড়া, পিসিমা'রও তোমার প্রতি যখন ঝোঁক গেছে দেখলুম, তখন রেবার কথা তো আমি আর তুলতেই পারি না। শাশ্বতীও আমার বোন—কিন্তু রেবা যে আমার নিজের বোন, ঠাকুরপো। আমি তো এমন কিছু করতে পারি না যাতে পিসিমা'র মনে কোন ব্যথা লাগে। আজ যখন সে সমস্যাটার সমাধান হ'য়ে গেছে তখন স্পষ্ট ক'রে বল ত, রেবাকে বিবাহ করতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা। তুমি একটুও সঙ্কোচ ক'রো না, ঠাকুরপো,—তোমার যেটা সত্যিকার মনের কথা তা তুমি আমায় বল। তোমার বাবা-মা এই মাসেই তোমার বিবাহ দিতে চান। আমিও বাবার দিক থেকে তাঁদের একরকম কথা দিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার আসল মতটা জানবার ভার পড়েছে আমার উপরে।

স্নকুমার চোখ দু'টো সজোরে খানিকক্ষণ বুজে থেকে কি যেন গভীর চিন্তা ক'রে বললে, সবই তো বুঝলুম। কিন্তু যাঁদের নাম করলে তাঁরা ছাড়া আরো তো একজনের মতের প্রয়োজন আছে। তিনি যদি শেষ পর্য্যন্ত সব উল্টে দেন, তখন কোথায় থাকবে তুমি আর কোথায় থাকবেন আমার বাপ-মা। সেই নিদারুণ অপমানের কথাটা কি তুমি একবারও ভেবে দেখ নি?

স্নলতা বললে, তুমি রেবার কথা বলছ?

হ্যাঁ, তাই। এখানে তাঁর কথাটাই তো সবচেয়ে বড।

স্নলতার গলার স্বর হঠাৎ কেমন ভারী হ'য়ে গেল। বললে, তার মত আমি পেয়েছি ঠাকুরপো। যদি জানতে, কি দুঃখ তুমি তাকে দিয়েছ—

স্নলতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্নকুমার ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল, আমি তাকে দুঃখ দিয়েছি? এ কিছুতেই হ'তে পারে না, এ যে বলেছে সে মিথ্যা কথা বলেছে, বৌদি।

এ কেউ বলে নি ঠাকুরপো—এ কারুর মুখের কথা নয়। মানুষের মুখের কথা মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু তার চোখের জল তো মিথ্যা বল্‌বে না।

কার চোখের জল, বৌদি? ব্যাকুলভাবে স্নকুমার ব'লে উঠল।

স্নলতা তেমনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, জানি, তুমি যেটা বলেছ, সেটা তুমি না ভেবেই বলেছ। তবুও তোমার মুখে শৈলেনবাবু সম্বন্ধে সে অমন কথা আশা করে নি, তাই এই দুঃখটাই তার সবচেয়ে বেশী বেজেছে।

একান্ত অপরাধীর মত স্নকুমার বললে, আমার ভারী ভুল হ'য়ে গিয়েছিল

বৌদি। বিলেত থেকে এসে পর্য্যন্ত খালি ভুল ক'রেই চলেছি! এবার দেখো, তোমার ঠাকুরপো আর ভুল করবে না।

সুকুমারের কথায় সুলতা ভারী তৃপ্তি বোধ করলে। কতকটা উচ্ছ্বসিত হ'যেই সে ডাকতে লাগল, ও রেবা, কোথায় লুকিয়ে বসে আছিস, এখানে কি আর আসবি না?

গৃহকর্ত্রীর ডাকে ঝি এসে সংবাদ দিলে, একটু আগে রেবা দিদিমণি বাড়ী চলে গেছেন। ব'লে গেছেন, আর দেরি করলে বাড়ীতে ভাববে।

তেইশ

পুরীর হাসপাতালে শৈলেনের দিনগুলি খুব যে খারাপ কাটছিল তা বলা যায় না। গুলিটা পায়ে লাগায় আঘাতটা তার তেমন গুরুতর হ'তে পারে নি। একে তো সে পার্লেকামেদীর মহারাজার সহচর, তার উপর সৎপন্থী সাহেব সস্ত্রীক প্রাস প্রতিদিনই আসা-যাওযা করাতে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ শৈলেনকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লেই গণ্য করেছিল। তাই সেবা শুশ্রূষার দিক থেকে কোথাও কোন ত্রুটি না হওযায অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে বেশ সুস্থ বোধ করলে কিন্তু রাজা সাহেবের ইচ্ছায় আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকাই তার ব্যবস্থা হ'লো।

হিমাংশু যেদিন প্রথম এই সংবাদটা শুনলে, সেদিন সে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু এর দিন দুই পরে সে হাসপাতালে এসে এই প্রসঙ্গটাই আগে তুললে। বললে, বড়লোকদের সঙ্গে মেলামেশায এই বড বিপদ। নিজের ইচ্ছাকে সব সমযই চেপে কাজ করতে হয়।

শৈলেন হেসে বললে, রাগ করচিস কেন হিমাংশু, তিনি তো আমার ভালর জন্যেই বলেছেন। আরো কিছুদিন এখানে থেকে বাড়ীতে গেলে চলাফেরা করতে আর আমার মোটেই কষ্ট হবে না। আর রাজা সাহেব যখন বলেছেন এখন মাস দুই বিশ্রাম করতে, তখন আর ভাবনা কি!

হিমাংশু এ কথায় সায় দিতে পারলে না। বললে, তা ব'লে বাড়ী ছেড়ে

হাসপাতালে থাকার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া, কাকাবাবুও যাবার সময় সেদিন কি ব'লে গেলেন?

বাবা যা-ই ব'লে যান, হিমাংশু, দু'চার দিন এখানে বেশী থাকলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না। আমি যখন ভাল হ'য়ে গেছি, বাবা নিজেও দেখে গেলেন, তখন তাঁদের ভাববার কি আছে! কিন্তু তুই এত যাবার জন্যে তাড়া করচিস্ কেন? আমি তো ভেবেছিলুম, আমাকে উপলক্ষ ক'রে তুই-ই পুরীতে বেশীদিন থাকতে চাইবি।

হিমাংশু মুখখানা বেঁাকিয়ে ব'লে উঠল, কেন, এখানে থেকে আমার লাভ?

শৈলেন একটু মৃদু হেসে বললে, অতো লাভ-লোকসান খতিয়ে কি আর বলেছি —মনে হ'লো, বললুম। আচ্ছা, সৎপন্থী সাহেব যে পুরী থেকে কোথায় যাবেন বলেছিলেন, চলে গেছেন নাকি?

হিমাংশু রাগ ক'রে বললে, যখন যাবেন বলেছিলেন, তখন না যাবার আর কি কারণ ঘটতে পারে!

শৈলেন বললে, তুই কেন যে এমন রেগে গেছিস তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার এখানে থাকার সংবাদটা শুনে পর্য্যন্ত তোর মেজাজটা যেন একটু চড়া হ'য়ে আছে। দেখ্, তোর যদি সত্যি কোন কাজ থাকে, তাহলে তুই আমাকে নিয়ে এখানে আটকে বসে থাকিস নি। আমি তো এখন ভালই আছি। আর হাসপাতালে আমার কোন কষ্টই নেই। তবে তুই-ই বা কেন আর মিছামিছি হোটেলের কষ্টভোগ ক'রে এখানে পড়ে থাকবি!

হিমাংশু মুখখানা যৎপরোনাস্তি গম্ভীর ক'রে বললে, বরাতে আমার কষ্টভোগ থাকলে তুই আর কি করবি বল্?

শৈলেন কথাটার যথার্থ তাৎপর্য্য ঠিক উপলব্ধি করতে পারলে না। বললে, সত্যি, তোর এখানে এসে পর্য্যন্ত কি কষ্টই না হচ্ছে! ঝুম্কার মোকদ্দমাটা না থাকলে আমি তোদের কারুকেই এ ব্যাপারটা জানতে দিতুম না। প্রথম দু'দিন তো সৎপন্থী সাহেবও জানতে পারেন নি, তুই এসে যদি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে না যেতিস্ তাহলে তাঁদেরও আমার জন্যে কষ্ট ক'রে এখানে আসা-যাওয়া করতে হ'তো না।

হিমাংশুর সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল। বললে, আমার কি জ্বালা তুই তার কি বুঝবি !

শৈলেন একটু চিন্তিত হ'যে বললে, তুই যদি আমায় না বলিস্ তাহলে কি ক'রে বুঝব বল্ ? সত্যি, ব্যাপারটা কি আমায খুলে বল্ না ? এখান থেকে কি তার আমি কোন একটা বিহিত করতে পারি না ?

হিমাংশু অন্যমনস্কভাবে বললে, না। এখানে যত বেশী থাকবি আমার জ্বালাও ততবেশী বাড়বে। আচ্ছা, তুম্‌কার মোকদ্দমাটার তাবিখ কবে ?

শৈলেন বললে, তোকে ও কথাটা বলাই হয় নি। ও নিয়ে আমাদের বোধহয আর ছোটাছুটি করতে হবে না। আমাদেব ম্যানেজার সাহেব তার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বলেছেন।

হিমাংশু বললে, তা না হয হ'লো ! কিন্তু তুই এখান থেকে কলকাতায় না গিযে যদি ভাগলপুর যাস, তাহলে তোর অসুবিধা কি। আচ্ছা, তোর তো দু'মাস ছুটি বল্‌ছিস, তবে কাকাবাবুদেবও সবাইকে কলকাতা থেকে আমাদের ওখানে আসবার জন্যে চিঠি লিখে দে না ! তোব পক্ষে তো এখন কলকাতাব চেয়ে ভাগলপুবে থাকাই ঢের ভাল হবে।

শৈলেন বললে, সে-ব্যবস্থা কবাতে আর অসুবিধা কি। কিন্তু তুই এ সব কথা বলচিস কেন, কি হযেছে বল্ না ?

হিমাংশু সে-কথাব উত্তব না দিযে প্রশ্ন করলে, কাকাবাবুব সঙ্গে কি আমাদেব বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে তোর কোন কথা হয়েছে ?

শৈলেন খানিকটা চিন্তা ক'রে বললে, কৈ না ! ববং কলকাতায় গিযে মা যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে শুধু এই কথাটাই তিনি জানিযেছিলেন যে, শাশ্বতী'র বিযেটা হঠাৎ পিছিযে যাওয়ায় ভাগলপুব থেকে তাঁরা চলে এসেছেন। এছাডা আব তো কোন খবর আমি পাই নি।

হিমাংশু বিমর্ষভাবে বললে, তোব এই বিপদেব জন্যে সব কথা আমি তোকে বলি নি। বাবা যা আমাকে চিঠিতে জানিযেছেন তাতে এ যাত্রা মা যে আর সেবে উঠতে পারবেন তা তো মনে হয না, আর তার উপর বিপদ হয়েছে শাশ্বতীকে নিয়ে। তুই গুলির আঘাতে আহত হ'য়ে হাসপাতালে আছিস, এই দুঃসংবাদে সে এমনি ভেঙ্গে পড়েছে যে, তার মুখের দিকে চাইতে বাবার সাহসই হয় না।

বলিস্ কি, হিমাংশু,—এ সমস্ত কথা তুই আমায় কিছুই বলিস নি! জ্যাঠাই-মা'র অসুখটা কি?

অসুখ আর কি! বাবার সাবজজ হ'য়েও তা প্রত্যাখ্যান ক'রে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া, আর সুকুমারবাবুর সঙ্গে শাশ্বতীর বিবাহ না হওয়া—এই দু'টি ঘটনাই মায়ের মনকে এমনিভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে যে, তিনি প্রায় জীবন্মৃত হ'য়ে পড়েছেন।

শৈলেনের বুকের ভিতরটা কি রকম যে টন্‌টন্ করতে লাগল তা সে হিমাংশুকে এতটুকু জানতে দিলে না। বললে, সুকুমারবাবুর সঙ্গে শাশ্বতী'র বিবাহ ভেঙ্গে যাবার কারণটা কি তিনি কিছু বলেছেন?

হিমাংশু বললে, কারণ আর কি! শাশ্বতী যে সুকুমারবাবুকে বিবাহ করতে পারে না, এটা তিনি শেষপর্য্যন্ত বুঝতে পেরেই সসম্মানে স'রে দাঁড়িয়েছেন। আমি কিন্তু এদিক্ থেকে মায়ের জন্যে ভাবচি না। মায়ের যেটা আসল মনস্তাপের কারণ, সেটা হচ্চে বাবার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া—তাঁর এতবড় দুঃখের কারণ বোধহয় জীবনে আর কখন ঘটেনি। তাই এ আঘাতকে যে তিনি কি ক'রে সহ্য ক'রে থাকবেন সেটাই আমি ভেবে ঠিক করতে পারচি না। মাকে আমি এখন যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'য়ে উঠবে।

শৈলেন বললে, তুইও তো জ্যাঠামশাইয়ের চাকরি ছাড়াটা সমর্থন করতে পারিস নি?

হিমাংশু কতকটা বিরক্ত হ'য়েই বললে, আমার কথা তুই তুলচিস কেন? ও নিয়ে সত্যিকার দুশ্চিন্তা আমার কোনদিনই হয় নি, তবে হঠাৎ একটা অতবড় চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা আমি ভাল মনে করি নি। আমার দুর্ভাবনা ছিল শাশ্বতীকে নিয়ে—সুকুমারবাবুকে যে শাশ্বতী কিছুতেই বিয়ে করতে পারে না, এটা যেদিন আমি যথার্থই জানতে পারলুম, সেদিন থেকেই মায়ের সঙ্গে আমার যত ঝগড়া। কিন্তু এও জানি, এ বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়াতে তিনি যত দুঃখই পান তা ভুলতে তাঁর বেশীদিন লাগবে না, কিন্তু বাবার চাকরি মায়ের সবচেয়ে বড় গর্ব্ব—তাঁর আত্ম-সম্মানের শ্রেষ্ঠ সম্বল। এর অভাব তিনি কোন কিছু দিয়েই পূরণ করতে পারবেন না।

শৈলেন অনেক ভেবেচিন্তে যেন একটা নূতন কথা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে,

এমনি ভাবে সে ব'লে উঠল, আচ্ছা, জ্যাঠামশাই রোজগার তো এতদিন মন্দ করেন নি, তবে তাঁর চাকরি ছেড়ে দিলে এমন কি জ্যাঠাইমা'র অসুবিধা হবে! এটা তুই গিয়ে তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললে কি কিছু ফল হবে না ব'লে তোর মনে হয়।

হিমাংশু বললে, মাকে তুই ঠিক চিনিস না। আমি ছাড়া বোধ হয় মায়ের এই দিক্‌টা কেউ কোনদিন লক্ষ্য করে নি। মা যে কত বড়ঘরের মেয়ে তা তোর ঠিক জানা নেই। ছেলেবেলা থেকে জীবনের সবকিছুই তিনি এত অপর্য্যাপ্তভাবে ভোগ ক'রে এসেছেন যে, তার এক তিল বিচ্যুতি তাঁর সহ্য হয় না। এর উপর বাবার পদমর্য্যাদার সঙ্গে নিজের আত্মমর্য্যাদাকে তিনি এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছেন যে, এ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তিনি যে বেঁচে থাকতে পারেন, এটা তিনি ভাবতেই পারেন না।

হিমাংশুর কথায় শৈলেন যেন আজ তাকে নূতন রূপে দেখতে পেলে। চিরদিন সে তার এই সঙ্গীটিকে কবি ব'লে উপহাসই করেছে, ছেলেমানুষ মনে ক'রে সহানুভূতিই দেখিয়েছে, কিন্তু আজ তার বিচারবুদ্ধির প্রখরতায় সে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সে যে এতটা মাথা ঘামাতে পারে, এটা সে কল্পনা করে নি। এমন কি সে নিজেও যে এতটা বিশ্লেষণ ক'রে কোন কিছু ভেবে দেখতে পারে না, এটা তাকে মানতেই হ'ল। আজ হঠাৎ তার মনে হ'ল, সে যে তার সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে নিয়ে এতটা উঠেপড়ে লেগেছে, এর মূলে আছে ওর এই বিচারবুদ্ধি।

ঠিক এই সময়ে কেবিনের পর্দ্দা সরিয়ে একটি বাঙ্গালী মেয়ে এসে সান্ধ্য-নমস্কার জানাল। হিমাংশু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, আমি যাই, নার্স এসেছেন। তুই বেশী ভাবিস নি—যতটা পারি বুঝিয়ে-সুজিয়ে মাকে একটা আজ চিঠি লিখব রাত্রে।

শৈলেন বললে, তাই করিস।

হিমাংশু চলে গেল। নার্স তাকে একটা ছোট গেলাসে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে খাবার আনতে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরের ওয়ার্ডের রুগীদের সঙ্গে যারা অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করতে এসে কিছুটা গোলমালের সৃষ্টি করেছিল, তারা সব চলে যাওয়াতে সমস্ত হাসপাতালটা এমনি স্তব্ধ হ'য়ে পড়েছে যে এর মধ্যে

কোথায়ও যে আর কোন মানুষ আছে তা মনে হয় না। অন্য দিনও ঠিক এমনিই ঘটে। হাসপাতালে এসে এ অভিজ্ঞতা শৈলেনের নূতন নয়। কিন্তু আজ এই নিস্তব্ধতা তার সমস্ত চেতনাকে যেন অসাড় ক'রে তুললে। গভীর রাত্রের গহন অরণ্যের চিরমৌন মূর্ত্তির সঙ্গে তার বহুবার পরিচয় ঘটেছে—কোন দিন যে তার কাছে তার মনের পরাভব ঘটেছে, এমন ঘটনা কখন ঘটে নি। তবে, এই সামান্য নিস্তব্ধতা তার সমস্ত চেতনাকে এমনভাবে কি ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। সে যা ভাবতে চায়, তা সে ভাবতে পারচে না কেন? মনের ভিতরটা যেন তার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে—একটা কথাও সে যেন স্মরণ করতে পারচে না। এ কি তার হ'লো!

নার্স খাবারের আয়োজন নিয়ে কখন যে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে তা সে লক্ষ্য করে নি। ইজি-চেয়ার থেকে টেবিলের কাছে উঠে যাবার জন্যে নার্স যে তাকে দু'তিন বার অনুরোধ জানিয়েছে, তা-ও সে শুনতে পায় নি। তবে কি সে সত্যসত্যই জ্ঞানশূন্য! নার্স ভয় পেয়ে সজোরে চীৎকার ক'রে ডাকলে, মিঃ মুখার্জ্জি, মিঃ মুখার্জ্জি, আপনি সাড়া দিচ্চেন না কেন?

ওঃ! আপনার ভয় নেই— আমি ঠিক আছি।

নার্স ব্যাকুল হ'য়ে বললে, এই তো হিমাংশুবাবু গেলেন, আমি ওষুধ খাইয়ে গেলুম, এর মধ্যেই আপনাব কি হ'লো?

শৈলেন বিশেষ লজ্জিত হ'য়েই বললে, না, ও কিছু নয় আপনি ব্যস্ত হবেন না।

শৈলেনের কথায় নার্স বেশ খুশী হ'য়ে বললে, সত্যিই আমার বড ভয় হয়ে গিয়েছিল। এখন আপনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন, আর ইজিচেয়ারে বসে থাকবেন না। আমার মনে হয শবীরটা আপনার ভিতরে ভিতরে বেশ দুর্ব্বল হ'য়ে আছে।

শৈলেন বললে, না, আমি, বেশ আছি। আপনি যেন আর ডাক্তারকে এ সব কথা বলবেন না?

আপনি যদি বারণ করেন তাহলে অবশ্য বলব না। কিন্তু—

শৈলেন বাধা দিযে বললে, আমার কোন অসুখ নেই, তবে তাঁকে বলবার কি আছে!

নার্স এ কথার প্রতিবাদ করলে না। কিন্তু শৈলেন সামান্য কিছু খেয়ে উঠে পড়তেই সে বললে, এ কি, আপনি তো খেতেও পারলেন না ?

শৈলেন বললে, সব দিন কি সমান খিদে থাকে ?

বড়লোক রুগীর পরিচর্য্যা করতে অনেক রকম হাঙ্গামা পোহাতে হয়, এই অভিজ্ঞতাই নার্সের হয়েছে। কিন্তু শৈলেনের ভদ্র আচরণ ও সৌজন্যের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে তার সম্পর্কে তার অভিযোগের কোন কারণ ঘটে নি। তাই শৈলেনের এই উক্তিকে সহজ-ভাবেই সে গ্রহণ করলে—বড়লোক রুগীর অহেতুক খেয়াল ব'লে মনে করতে পারলে না।

মিনিট দশেক পরে ছোট-খাটো দু'একটা কাজ সেরে নার্স যখন চলে গেল, তখন শৈলেন অন্য দিনের মত আজ আর ইজি-চেয়ারে বসে থাকবার মত যেন শক্তি খুঁজে পেলে না। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং ক্লান্তিতেই বোধকরি এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। খানিকটা পরে নার্স এসে তাকে ঘুমুতে দেখে সে-ও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত্রিটা হয়ত ঘুমের মধ্যেই শৈলেনের কেটে যেত, কিন্তু পাশের ওয়ার্ডের এক রুগীর করুণ আর্ত্তনাদে তার ঘুমটাই শুধু ভেঙ্গে গেল না, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মনটা যেন কি এক প্রকার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। আজ হিমাংশু এসে তাকে যত কথা বলেছে সবকিছু ছাপিয়ে তার কেবলি মনে হ'তে লাগল, এ কি সম্ভব! একজনের আঘাতের কথা শুনে আর একজন এমন ভাবেই ভেঙ্গে পড়েছে যে তার নিজের বাপই তার মুখের দিকে চাইতে সাহস পাচ্চেন না ! এ কি অদ্ভুত কথা হিমাংশু আজ তাকে শুনিয়ে গেল ! সংসারে এমন উদ্ভট ব্যাপার কি ঘটতে পারে ! নাঃ, হিমাংশুটা সত্যিই বোকা—কি কথার কি মানে হবে ও ঠিক বুঝতে পারে নি ! নইলে জ্যাঠামশাই নিজে কি কখন চিঠি লিখে এই কথাটা তাকে জানাতে পারেন ! উল্টেপাল্টে যতই সে এ নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, ততই এটাকে সে হিমাংশুর নির্ব্বুদ্ধিতার চরম দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলে না। এমনি ভাবে যে তার কতক্ষণ কেটে গেল তা তার হুঁস ছিল না। হঠাৎ সে যেন বহুদূরে কি একটা দেখতে পেয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এ কি! সে রতনগড়ের সেই অরণ্যের মধ্যে নাকি ! তবে এ দৃশ্য সে কেন দেখচে ! এ যে শাশ্বতী ! তার পা দু'টো ধ'রে বলচে, এমন ক'রে তোমাকে আমি বিপদে

যেতে দেব না—একটা কিছু ঘটলে পুরী গিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

উত্তেজনায় শৈলেন প্রায় বিছানার উপর উঠে বসল।···তার সমস্ত শরীর তখন কাঁপচে।

চব্বিশ

আজকাল সকালবেলার দিকটা অবিনাশ বেশীর ভাগ সময় বাইরের দিকেই কাটান। অন্যদিনের মত আজও তিনি একখানা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে দিনের সংবাদপত্রখানা পড়ছিলেন। চিরদিন যে-মানুষ নিয়মের কঠিন বন্ধনে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, হঠাৎ সে-বন্ধন থেকে যে সহজে মুক্তিলাভ করা যায় না, অবিনাশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সেই প্রমাণই জাজ্জ্বল্যমান। শাশ্বতী কিন্তু পিতার এই নিয়মানুবর্ত্তিতাকে সমর্থন করতে পারে না। সে বলে, কাজের তাড়নাতেই মানুষ সময়ের বন্ধনকে মানতে বাধ্য হয়—কিন্তু কাজের এই দাবি যখন থাকে না, তখন সময়ের আর মূল্য কি! অবিনাশ এ কথার প্রতিবাদ করেন না, শুধু হাসেন। শাশ্বতী জোর ক'রে বলে, না বাবা, আমার এ কথাটাকে তোমাকে আমি এ ভাবে এড়িয়ে যেতে দেব না—আমাকে তোমায় বোঝাতেই হবে। অবিনাশ তেমনই হেসে বলেন, আমি আর তোমায় কি বোঝাব, মা,—তুমি তো নিজে বুঝছ, যেটা তুমি বলছ সেটা সত্য নয়।

শাশ্বতী সত্যিই প্রতিবাদ করতে পারে না, চুপ ক'রে থাকে। অবিনাশ নিজেই বলেন, তুমি চাইচ, মা, আমি সারাক্ষণ তোমার মায়ের কাছে থাকি। তোমার ধারণা, আমি যদি সব ছেড়েছুড়ে তাঁর কাছে সমস্তক্ষণ থাকি, তাহলে হয়ত তাঁর মনটা ভাল হ'তে পারে। কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই, মা। তোমার মা তাঁর মনের ব্যাপারে এমনি বদ্ধমূল হ'য়ে আছেন যে সেখানে ভগবান এলেও প্রবেশ করতে পারবেন না। সেই অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা ক'রে লাভ কি হবে, মা!

পিতার কথায় শাশ্বতীর চোখ দু'টি জলে ভ'রে ওঠে। অবিনাশ ব্যথা পান, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পান না।

গত কয়েক দিন ধ'রে পিতা-পুত্রীতে এই ধরনের আলোচনায় অনেকটা সময়ই কেটেছে। প্রতিদিনই একটি বিশেষ সময় ব্যতীত আজকাল আর অবিনাশ আলোকলতার সঙ্গে তেমন দেখাশোনা করেন না। শাশ্বতী কিন্তু তা সহ্য করতে পারে না। তাই পিতার সঙ্গে এ নিয়ে তার এত বাদানুবাদ। হোক্ না মায়ের ধারণা বদ্ধমূল, কিন্তু পিতার এই ঔদাসীন্যকে সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। একদিন মায়ের হাত থেকে পিতাকে রক্ষা করাই ছিল তার জীবনের ধর্ম্ম। কিন্তু সেদিন মা ছিলেন তার কঠোর, নির্ম্মম। আজ সেই মায়ের মুখের দিকে চাইলে শাশ্বতীর বুকটা ফেটে যায়। বেঁচে আছেন কি বেঁচে নেই, সহজে তা বুঝবার উপায় থাকে না। মানুষ যে কত সামান্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার মাকে দেখে সে তা বলতে পারে। রাস্তায় না খেয়ে মানুষকে সে মরতে দেখেছে—রোগে ভুগে অস্থিসার মানুষকে পথে ঘুরে বেড়াতেও সে কম দেখে নি। কিন্তু তার মায়ের মুখের উপর যে বেদনার চিহ্ন সে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে এমনটা সে দেখে নি। মা যেন তার পুড়ে ঝলসে গেছেন!

একদিন যার হাকডাকে বাড়ীর সবাই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, আজ সে-ই সবার আড়ালে দিন কাটাচ্ছে! ঝি-চাকর, দাস-দাসী আজও সবাই তেমনিই আছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নি, তবু কেমন একটা চাপা দুর্ভাবনা যেন বাড়ীর সমস্ত শ্রীকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। সামান্য দাসীও আজ নিজের চীৎকারে নিজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। যেন হাসি আনন্দ উচ্ছলতা আজ আর এ বাড়ীতে শোভা পায় না! এই দারুণ অবসাদের মধ্যে শাশ্বতীর মনের স্থৈর্য্য লক্ষ্য ক'রে অবিনাশ ভগবানের কাছে মাথা নোয়ান। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁব একটা সান্ত্বনা এই যে, শৈলেন ভাল হ'য়ে উঠেছে—আর কোন ভাবনা নেই। একটি পরম শুভদিনের জন্যে তাঁর পিতৃহৃদয় এমনি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে যে ভিতরে ভিতরে একটি দিনও তিনি যেন আর অপেক্ষা করতে পারচেন না! তাঁর সবচেয়ে বড ভাবনা এই যে, সেই দিনটি পর্য্যন্ত আলোকলতা যেন অপেক্ষা করতে পারে। পিতার এত কাছে থেকেও শাশ্বতী তাঁর মনের এ সংবাদটা ধরতে পারে নি। তাই পিতার ঔদাসীন্যটাই তার বুকে বড় হ'য়ে বাজে।

আজ হঠাৎ অসময়ে পিতাকে:মায়ের ঘরে ঢুকতে দেখে, শাশ্বতী একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। ভাবলে, নিশ্চয় মা নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন, নইলে বাবা যে এখন

নিজে বাইরে থেকে ভিতরে আসবেন তা হ'তে পারে না। অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে হয়ত এখনি সেখানে ছুটে যেত, কিন্তু ঠাকুরঘরের কাজ এখনো তার শেষ হয় নি, তাই আশা ও আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে সে শুধু গৃহদেবতার চরণে মাথা ঠুকতে লাগল।

ঘরের মধ্যে আলোকলতা মেঝেতে একটা কার্পেটের উপর চুপ ক'রে বসেছিলেন, একটু দূরে তাঁর সামনে বসেছিল বাড়ীর পুরোনো ঝি। শাশ্বতীর হুকুমে আলোকলতার কাছে সমস্তক্ষণ ব'সে থাকাই হচ্ছে এই ঝি'টির প্রধান কাজ। সামান্য দু'একটা কথা আলোকলতা মাঝে মাঝে কন্, কিন্তু সে এত সামান্য যে চুপ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া ঝিয়ের আর অন্য কাজ থাকে না। হঠাৎ কর্ত্তা মশাইকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেকে ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবিনাশ কার্পেটের একটা কোণে বসে বললেন, নিবারণ একখানা চিঠি দিয়েছে—এইমাত্র এল।

আলোকলতা মাথার কাপড়টা একটু বেশী ক'রে কপালের দিকে সরিয়ে দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অবিনাশ বললেন, তোমাকেই বিশেষ ক'রে লিখেছে। চিঠিটা সব না পড়লে বুঝতে পারবে না। এই ব'লে অবিনাশ চিঠিখানা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

আলোকলতা কাতর হ'য়ে বললেন, আমাকে আর দিচ্চ কেন! দাদা যা লিখেচেন তুমিই মুখে বল না?

অবিনাশ বললেন, সুকুমারের সঙ্গে রেবার বিবাহ হয় এই প্রস্তাব নিয়ে তার বাবা নিবারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নিবারণেরও এ বিয়েতে তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া যে এ বিয়ে হ'তে পারে না, এটাই সে জানিয়েছে। তাই তোমার মতটা যত শীঘ্র সে জানতে পারে তার জন্যে সে তোমাকে তাড়াতাড়ি চিঠি দিতে বলেছে।

আলোকলতা তেমনি ব্যথিত হ'য়ে বললেন, এর মধ্য আর আমায় দাদা জড়াচ্ছেন কেন! আমি কি বলব, বিয়ে হ'য়ে কাজ নেই? ছেলে যদি তার পছন্দ হয়, বিয়ের যদি কোন বাধা না থাকে, তাহলে বিয়ে হবে। আমার সঙ্গে এ বিয়ের কি সম্পর্ক আছে!

অবিনাশ বললেন, না ছোট বউ, নিবারণ তোমার মত না নিয়ে যে এ বিয়েতে রাজী হ'তে পারে না, এটা তো অসঙ্গত কথা নয়। কারণ, সে তো জানত

শাশ্বতীর সঙ্গে সুকুমারের বিয়ে দেবার জন্য তুমি কি রকম ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলে। হ'লো না, ভবিতব্য! কিন্তু নিবারণ তোমার মত না নিয়েই রেবার সঙ্গে বিযে দেবে, এটা তো সম্ভব নয়। বরং এটাই আমি বলব, সে এই চিঠি লিখে তাব যথার্থ কর্ত্তব্যই করেছে—

অবিনাশ হয়ত নিজের ঝোঁকে আরো কত কি বলে যেতেন, কিন্তু শাশ্বতী ঘরের দরজার সামনে আসতেই মায়ের মাথাটা মেঝের উপর গুঁজে পড়তে দেখে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, মা অমন ক'রে লুটিয়ে পড়েচেন কেন বাবা, তুমি ওঁকে কি সব বাজে কথা বলচ?

অবিনাশ শশব্যস্তে উঠে পড়ে শাশ্বতীর সঙ্গে আলোকলতার মাথাটা তুলে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, আমি তো নিবারণের চিঠির কথাই তোমার মাকে বল্‌ছিলুম, আর তো কোন কথা বলিনি, মা।

শাশ্বতী প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, তুমি চিঠির কথা মায়ের কাছে কেন বলতে গেলে, বাবা? বলতে বলতে সে মাযের মুখটা বুকের কাছে তুলে নিযে ডাকলে, মা, একটু জল খাবে?

আলোকলতা শুধু মাথাটা একবার নেড়ে মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বইলেন। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুর প্লাবন ভেসে যেতে লাগল।

অবিনাশ নীরব হ'য়ে আলোকলতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আজ নিশ্চিত তাঁর মনে হ'ল, এ দুর্জ্জয় অভিমানের শেষ নেই—সান্ত্বনা নেই। মৃত্যুই এর একমাত্র মুক্তি!

আজকের এই ছোট্ট ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে আলোকলতার দিনগুলি আরও ভারী হ'যে উঠল। শাশ্বতী সাধ্যমত মায়ের কাছেই থাকে—মাঝে মাঝে গিয়ে পিতার প্রযোজনীয কাজগুলি সেরে দিয়ে আসে। অবিনাশ বলেন, মা, নিজেব শরীবের দিকটাও একটু লক্ষ্য রেখো। এর উপর যদি তোমার একটা ভারী অসুখ হয়, তাহলে আর আমার কোন উপায়ই থাকবে না। শাশ্বতী রেগে উঠে বলে, তুমি বার বার আমার অসুখের কথা বলচ কেন, বাবা? অবিনাশ চুপ ক'রে যান, মেয়েকে আর রাগাতে সাহস পান্ না।

সেদিন বৈকালে প্রতিবেশী সঞ্জীববাবুর স্ত্রী এসে ডাকলেন, বড়-মা কৈ গা?

শাশ্বতী মায়ের ঘরে ব'সে কি একটা সেলাই করছিল—আলোকলতা মেঝেতে কার্পেটের উপর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শুয়েছিলেন। শাশ্বতী ঘর থেকে বাইরে এসে তাঁকে মায়ের ঘরে নিয়ে এল। আলোকলতাকে শুয়ে থাকতে দেখে আগন্তুক বললেন, বড় অসময়ে এসেছি, আমি এখন যাই, পরে আসব!

আলোকলতা জেগেই ছিলেন তাই তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে উঠে বসে বললেন, যাবে কেন মা, ব'স। আমি অমনি শুয়ে থাকি।

আগন্তুক তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, কর্ত্তা বললেন, বড়-মা'কে তো আর আমাদের কোন মেয়ের বিয়েতেই আনা হয় নি, এবারে যখন ওঁরা এখানেই আছেন, তখন বিয়ের দিনে আমাদের বাড়ীতে বড়-মা'র যাতে পায়ের ধুলো পড়ে তার ব্যবস্থা ক'রে এস।

আলোকলতা ম্লান হেসে বললেন, আমার তো শরীর ভাল নেই মা, আমি তো কোথাও যেতে পারব না।

আগন্তুক কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন, কি অসুখ করেছে, মা? সত্যি, আপনার শরীরটা খুব দুর্ব্বল দেখাচ্চে।

আলোকলতা বললেন, অসুখ আর কি বলব, মা! আমার বরাত! তা এটি তোমার কোন্ মেয়ে মা?

আগন্তুক বিনীতকণ্ঠে বললেন, এটি আমার সেজ মেয়ে, মা। কর্ত্তা বলেন, এ জন্মটা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই কেটে গেল।

আলোকলতা একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে চাপবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শাশ্বতীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। বললেন, এই বিয়েতে তোমাদের কত খরচ হবে, মা?

আগন্তুক তেমনি বিনীতভাবেই বললেন, কর্ত্তার আয় তো বেশী নয় মা, তাই খরচটা একটু বেশীই হ'য়ে যাবে। প্রায় হাজার টাকা পড়বে, মা।

আলোকলতা কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, নিশ্চয় তিনি ভুল শুনেছেন—কয়েক হাজার টাকাই নিশ্চয় হবে। তাই আবার বললেন, কত টাকা বললে, মা?

হাজার টাকা। তাই-ই কি সব যোগাড় আছে! এখনো দু'শো টাকা যোগাড় করতে বাকী।

আলোকলতা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি একটা ভেবে বললেন, এই টাকাও যোগাড় নেই ? কি ক'রে যোগাড় হবে ?

ভগবান ক'রে দেবেন মা। গরীবের তিনি ছাড়া আর কে আছে মা !

আলোকলতা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই দুঃসময়ে এতবড় বিশ্বাস এই সাধারণ মেয়েটির মধ্যে কোথা থেকে এল ! শেষপর্য্যন্ত যদি যোগাড় না হয় তাহলে তার নিদারুণ লাঞ্ছনার কথা কি একবারও ওর মনে হয় নি ! এ কি ক'রে সম্ভব ! এতবড় অনিশ্চিতের উপর এতবড় সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা কি বাতুলতা নয় ! 'গরীবদের তিনি ছাড়া আর কে আছে মা !' যদি গরীবদের তিনি এতবড় বন্ধু, তবে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় পথে-ঘাটে এত লোক মরে প'ড়ে থাকে কেন ! কেন গরীবদের তিনি কোন ব্যবস্থাই করতে পারেন না ! এই অন্ধবিশ্বাস, এই আত্মপ্রতারণা মানুষকে আর কতকাল ভুলিয়ে রাখবে ! নিজের চিন্তার জালে নিজে তিনি এমনি জড়িয়ে পড়লেন যেন আর কিছুতেই তা ছিন্ন ক'রে তিনি বেরিয়ে আসতে পারচেন না ! হঠাৎ চোখের সামনে নিজের পুত্র-কন্যার চরম দারিদ্র্যের মূর্ত্তি দেখে তিনি যেন শিউরে উঠলেন।

শাশ্বতী সঞ্জীববাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই ঘরের বাইরে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসে মাযের মুখের চেহারা দেখে সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এ ভাব গোপন ক'রে সে বললে, মা, তুমি একটু শুয়ে থাক না—আজ তো আর তোমার তেমন বিশ্রাম হ'লো না।

আলোকলতা বললেন, একটু জল দিও ত মা।

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে মাকে খাইয়ে বললে, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি বাবাকে ওভালটীন দিয়েই আবার আসচি।

অবিনাশ দিবানিদ্রা থেকে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে উঠেছিলেন। এখন ওভালটীন খাবার জন্যেই যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন শাশ্বতীর আবির্ভাবে সেই কথাটাই তিনি হেসে জানিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আজ একটা বড় সুসংবাদ আছে, মা।

শাশ্বতী কৌতূহলী হ'য়ে বললে, কি বাবা ?

অবিনাশ হেসে বললেন, আচ্ছা মা, বল ত, সুসংবাদ কি হ'তে পারে ?

শাশ্বতী রাগের ভান ক'রে বললে, না বাবা, তুমি আমার বেশী সময় নষ্ট করতে পারবে না, মাকে আমি একলা ফেলে এসেছি।

অবিনাশ অবাক্ হ'য়ে বললেন, তোমার মায়ের বডি-গার্ডটি কোথায় গেল মা।

শাশ্বতী বললে, না বাবা, তুমি আমাদের বুড়ীঝি'কে ঠাট্টা করতে পারবে না। ও যে মায়ের কাছে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, তই যথেষ্ট।

অবিনাশ হাসলেন।

শাশ্বতী বললে, কি বলছিলে, বল না ? সত্যি, আমি দেরি করতে পারব না।

অবিনাশ বললেন, হিমাংশু একখানা আমাকে খুব বড় চিঠি লিখেচে। সে লিখেছে খুব শীঘ্রই শৈলেনকে নিয়ে সে এখানেই চলে আসবে। এমন কি তোর কাকাবাবুরাও কলকাতা থেকে এখানে এসে উপস্থিত হ'তে পারেন। শৈলেনের এখন দু'মাস ছুটি, এই ছুটিটা সে এখানেই কাটাবে বলেছে—

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, আমি যাই বাবা।

কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সে বাপের কাছ থেকে চ'লে এল, ততো তাড়াতাড়ি সে আর মায়ের কাছে যেতে পারলে না। চকিতে তার দেহ-মন কার যাদুস্পর্শে যেন অবশ হ'য়ে গেল! শৈলেন আসবে—ছুটিটা সে এখানেই কাটাবে! কিন্তু এতবড় চিঠিটার মধ্যে সেই আসার দিনের তারিখটা জানাতেই কি দাদার যত কষ্ট হ'ল! নাঃ, দাদার এ ভারী অন্যায়! দাদা—কবি! ঈশ্! দাদা কিচ্ছু নয়! বার বার যে আই-এ ফেল্ করে, সে আবাব কবি!

শাশ্বতীর চিন্তাধারা শেষপর্যান্ত যে তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেত তা তার জানা ছিল না। এমন ছেলেমানুষও যে সে হ'তে পারে, এটাই কি সে ভাবতে পারে! কিন্তু এমনই হয়! এ নিয়ে তর্ক চলে না—তিরস্কার চলে না। অতি-বড় জ্ঞানীও কেমন ক'রে এক সময়ে একান্ত ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে, তার কোন হদিস মেলে না। তাই তো আজও কাব্যের রসধারা শুকিয়ে যায় নি! তাই তো আজও কালিদাস অমর হ'যে আছেন! শুধু কি অলকার সেই অভিশপ্ত যক্ষই একমাত্র প্রিয়ার বিরহে কাতর হ'য়ে কেঁদেছে! পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্ত্ত এই কান্নাই তো গুমরে উঠ্ছে! এই তো মানুষের আদিম কান্না! এই কান্না থামাবার জন্যেই তো মানুষ ঘর বেঁধেছে—বাঁচতে চেয়েছে! তবে শাশ্বতীকে তিরস্কার ক'রে লাভ কি!

শাশ্বতীর কিন্তু এমনি ক'রে চ'লে আসাটা উচিত হয় নি। এমন সুসংবাদে মেয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে তাঁর সব কথাগুলো শুনবে, এটাই অবিনাশ আশা করেছিলেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস তো দূরে থাক্—তাঁর কথাগুলো যে শাশ্বতী মন দিয়ে শুনেছে, তা তার হাবভাবে অবিনাশ বুঝতে পারলেন না। নাঃ, মেয়ে তাঁর সত্যি পাগ্‌লী। যেটা সবচেয়ে সুসংবাদ, সেটা শোনবারই তার ধৈর্য্য নেই।

অবিনাশ মনে মনে হাসলেন।

পঁচিশ

পুরীর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কটকে রাজা-সাহেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে দুই বন্ধুতে যখন ষ্টেশনে এল তখন ট্রেনখানা এসে পৌঁছায় নি।

হিমাংশু হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, বাবা, বাঁচা গেল! কাল থেকে যেন দম বন্ধ হয়েছিল। হাঁচ্‌তে, কাসতে, বসতে সব সময়ই কেবল রাজা-সাহেব কি করলেন, কখন তিনি একবার নীচে আসবেন—সমস্ত লোক যেন তা নিয়েই ক্ষেপে আছে! সত্যি, এখানে মানুষ বেঁচে আছে কি ক'রে! কারুর যে এতটুকু স্বাধীনতা আছে তা তো মনে হ'লো না। সবাই যেন সদাই সশঙ্কিত—এখনি কি যেন মহাসর্ব্বনাশ ঘটে যেতে পারে!

শৈলেন হাসতে হাসতে বললে, তুই কবি কিনা, তাই মনে মনে এত ভাবচিস। আমাদের তো কিছুই মনে হয় না।

হিমাংশু বললে, আমি হ'লে একদিনও এখানে চাক্‌রি করতে পারতুম না।

একটু দূরে ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজতে লাগল। যাত্রীরা কুলিরা সমস্বরে চীৎকার ক'রে যে ভাবে ট্রেনকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল তা দুই কর্ণ সজাগ ক'রে শোনা সবার সাধ্যে নেই।

হিমাংশু রেগে উঠে বললে, এই লোকগুলো এত চেঁচাচ্চে কেন বল্ ত? ট্রেন আসচে—থামবে, যে যার গাড়ীতে উঠবে, তা নয় জন্তু-জানোয়ারের মত চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছে।

শৈলেন বললে, সাধারণ মানুষ সবকিছু শব্দ ক'রেই করতে ভালবাসে, এটাই হ'লো তাদের স্বভাব।

দূর-দূর! আমাদের দেশের সবই উদ্ভট—কৈ—

শৈলেন বাধা দিয়ে বললে, তোর এখন তর্ক রাখ, গাড়ী এসে পড়েছে, চল্।

দুই বন্ধু একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। ভিতরে দু'চার জন যাত্রী বসেছিলেন, তবুও অপেক্ষাকৃত খালি বলা যায়। হিমাংশু বললে, পথে যদি ভিড় না হয়, তাহলে রাতটা শুয়েই কাটান যাবে।

শৈলেন বললে, এখনো বিকেল হয় নি, এর মধ্যেই রাতের কথা উঠচে কেন?

হিমাংশু বললে, সব জিনিস ভেবেই করতে হয়—রাতটা যখন ট্রেনেই কাটাতে হবে, তখন রাতের কথাটা না ভেবেই বা উপায় কি!

শৈলেন একটু মুচকে হাসলে। ট্রেন তখন চলতে সুরু ক'রে দিয়েছে। খানিকটা পরে গাড়ীর ভিতরটা বেশ নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। হিমাংশু যে ষ্টেশনে এসে পর্য্যন্ত বকতে আরম্ভ করেছিল, সেও চুপ ক'রে গেল।

তাদের সামনের বেঞ্চিতে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এতক্ষণ নিজের মনে একখানা বই পড়ছিলেন। শৈলেনের পাশে তার রাইফেলটা দেখে তিনি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আপনি কি এখানে শিকারে এসেছিলেন?

শৈলেন বললে, শিকার আমি করি।

হিমাংশু বন্ধুর গৌরবের আনন্দটা আর চেপে রাখতে পারলে না। বললে, ইনি খুব ভাল শিকার করেন। অনেক বাঘ মেরেছেন।

সাহেবটি খুব খুশী হ'য়েই বললেন, আচ্ছা, বাঘ মারার যদি একটা গল্প করেন তাহলে আমার অনেক কিছু শেখা হয়।

শৈলেন বললে, আপনি বুঝি নিজেও একজন শিকারী?

সাহেবটি যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। বললেন, শিকারী আমি নিজেকে বলতে পারি না, তবে এ-ব্যাপারে আমার উৎসাহ আছে। বলুন না আপনার গল্প?

শৈলেন ভদ্রলোকের অনুরোধ পালন ক'রে যখন সত্যিই বলতে আরম্ভ করলে তখন সাহেব যেন শুনতে শুনতে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। শিকারের

গল্প যে কি রকম রোমাঞ্চকর হ'তে পারে, উনি যেন তা এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। শেষে বললেন, আপনি সত্যিই খুব বড় শিকারী।

হিমাংশু দুষ্টুমি ক'রে বললে, কিন্তু এর চেয়েও রোমাঞ্চকর ব্যাপার বনের মধ্যে ঘটেছে।

সাহেব উৎসুক হ'য়ে হিমাংশুর দিকে চাইতে হিমাংশু বললে, গভীর রাত্রে গহন অরণ্যের মধ্যে মানুষ-মারা বাঘ মারতে গিয়ে—

শৈলেন বললে, কি হচ্ছে হিমাংশু! সাহেব বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু হিমাংশুর বলার ভঙ্গীতে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন গাড়ী চলতে লাগল—রাত্রিও তেমনি গভীর হ'তে লাগল। সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু হিমাংশু আর শৈলেন নিদ্রা দেবীর কোমলস্পর্শ লাভে বঞ্চিত হ'যে জেগে আছে।

শৈলেন বললে, একটু ঘুমুলি না কেন?

হিমাংশু বললে, তোর মতই আমার অবস্থা। ঘুম আসচে না। বাড়ী গিয়ে যে মাকে কি রকম দেখব তাই ভাবচি। বাবা সেদিন যে-চিঠি লিখেছেন তাতে তো স্পষ্টই বলেছেন, তোমায় মাযের রোগ হচ্ছে মনের রোগ, ও সারবার আর সম্ভাবনা নেই। তবে একটা সুসংবাদ এই যে, সুকুমারবাবুর সঙ্গে রেবার বিয়ে ঠিক হ'যে গেছে। এতে সবচেয়ে কে খুশী হয়েছে জানিস্?

শৈলেন বললে, কে?

শাশ্বতী।

কিন্তু জ্যাঠাইমার তো দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

না, তা আমি বলি না। তোকে তো বলেছি, সুকুমারবাবুর সঙ্গে শাশ্বতীর বিবাহটাই মায়ের কাছে বড় জিনিস নয়। বাবার চাকরি ছাড়াটাই মায়ের একমাত্র দুঃখ। তাঁর কত বড় সাধকে যে বাবা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছেন তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। বলতে বলতে হিমাংশুর গলার স্বর বেশ ভারী হ'য়ে উঠল।

শৈলেন বললে সংসারে যে কেমন ক'রে ট্র্যাজিডি ঘটে তা কিছুই বলা যায় না। আচ্ছা হিমাংশু, তোদের এই বিপদের মধ্যে আমাকে আবার তুই নিয়ে যাচ্ছিস কেন? আমি এখন কলকাতায় যাই, তারপর এক সময়ে সবাই মিলে তোদের বাড়ী চড়াও হবো। সেটাই ভাল হবে না?

হিমাংশু জানলার বাইরে চেয়ে রইল। কোন কথা কইলে না।

শৈলেন বললে, কৈ, কোন কথা বল্‌চিস না?

হিমাংশু বললে, কি আর বলব বল্? একটু আগে তুই ট্র্যাজিডি'র কথা বলছিলি না, তোকে নিয়ে গিয়ে সেই ট্র্যাজিডিটাই যতটা সম্ভব হাল্কা করতে চাইছি। এতে যদি তোর আপত্তি থাকে, তাহলে যাস্ নি—আমি তোকে জোর করব না।

শৈলেন ব্যস্ত হ'য়ে বললে, তুই একটুতেই এত রাগ করিস কেন? আমি কি বলেছি আমি যাব না! আচ্ছা বাবা, ও কথা থাক্। এই তোকে আমি কথা দিচ্চি, তুই যা বলবি, আমি তাই করব।

হিমাংশু হেসে ফেললে। বললে, কথা দিচ্চিস্?

নিশ্চয়ই।

শাশ্বতীও যদি আমার শত্রুতা করে, তাহলেও তুই আমার দলে থাকবি?

শৈলেন হেসে বললে, থাক্‌ব, থাকব, থাকব। হোলো তো!

দুই বন্ধুতে যখন বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল তখন সকালের কাজকর্ম্ম নিয়ে ঝি-চাকরেরা বাইরে এমনি ব্যস্ত যে, তাদের আগমন কেউ লক্ষ্যই করলে না।

অবিনাশ এখনো বাইরে এসে তাঁর ইজি-চেয়ারখানি দখল করেন নি। শাশ্বতী তার মায়ের ঘরেই আছে। অতএব বাড়ীর ভিতরটা একরকম নিস্তব্ধই।

হিমাংশু শৈলেনকে নিয়ে সোজা তার মায়ের ঘরের দিকে গেল। তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করতে লাগল।

শাশ্বতী কি একটা কাজে বাইরে আসতেই হিমাংশুকে দেখে ছুটে এল—পিছনে শৈলেনকে দেখে সে একটু থমকে গেল। দাদার পায়ের কাছে টিপ্ ক'রে মাথাটা ঠুকতেই হিমাংশু বললে, আগে আসল লোককে কর্, পোড়ারমুখী।

শাশ্বতী লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে শৈলেনের পায়ের উপর মাথা স্পর্শ করলে। প্রথম প্রভাতের স্পর্শের মতই সে-স্পর্শ শৈলেনের সমস্ত দেহ-মনকে আপ্লুত ক'রে তুলল।

হিমাংশু বললে, মা কোথায়, শাশ্বতী ?

শাশ্বতী বললে, মা এইমাত্র মুখ ধুতে গেছেন। বাবা মুখ ধুয়ে ঘরে এসেছেন।

হিমাংশু ও শৈলেন অবিনাশের ঘরে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

অবিনাশ বললেন, তোমাদের আসার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলুম, বাবা। তোমরা তো বেশ ভাল আছ ?

শৈলেন বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, আমরা দু'জনেই ভাল আছি।

অবিনাশ বললেন, তোমার উপর দিয়ে খুব বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল বাবা। এ ক'দিন ঠাকুরের কাছে মনে মনে কেবল তোমারই কথা জানিয়েছি।

শৈলেনের চোখ দুটি ছল্ ছল্ ক'রে উঠল।

অবিনাশ বললেন, তোমার জ্যাঠাইমা'র অবস্থা ভাল নয় বাবা।

শৈলেন বললে, হিমাংশুর কাছে তাই-ই তো শুনলুম।

অবিনাশ যথাসাধ্য নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে বললেন, যা পারিনে তার দুঃখ থেকে যাবে চিরদিন আমার মনে, কিন্তু যা পারি তা থেকে ওকে বঞ্চিত করব কেন বাবা। তাই, তোমাকেই আজ আমার বড় প্রয়োজন—

কথাটা তাঁর সমাপ্ত হ'লো না। অবরুদ্ধ অশ্রুর প্লাবন এই চিরপ্রশান্ত প্রৌঢ়ের দুই গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শৈলেন সকল লজ্জা, সকল সঙ্কোচ দূর ক'রে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে বললে, আপনি যা আদেশ করবেন জ্যাঠামশাই—

অবিনাশ চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ওঠ বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।

হিমাংশু যে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, অবিনাশ তা লক্ষ্য করেন নি। বললেন, হিমাংশু বুঝি তার মায়ের কাছে গেছে। তুমিও তোমার জ্যাঠাইমা'র সঙ্গে একবার দেখা কর না বাবা।

অন্যমনস্কভাবে শৈলেন বললে, আজ্ঞে, যাই।

হিমাংশু সোজা তার মায়ের ঘরে এসেছিল, কিন্তু তখনও তিনি মুখ ধুয়ে ঘরে আসেন নি। হঠাৎ হিমাংশুকে ঘরের মধ্যে দেখে আলোকলতা একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন।

এ কি ! এই কি তার মায়ের মূর্ত্তি ! —মা ! হিমাংশু শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে তার মাকে জড়িয়ে ধরলে ।

শৈলেন এসে মাতা-পুত্রের এই অশ্রুবন্যার মধ্যে যেন ভেসে গেল । অস্ফুটস্বরে ডাকলে, জ্যাঠাইমা ?

আলোকলতা সে-ডাকে মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চোখের জলে তাঁর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল । শুধু অনুভব করলেন কার হাত দু'খানা তাঁর পা দু'টো চেপে ধ'রে আছে ।

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই গ্রন্থের সূচনা করেছেন শরৎচন্দ্র। অসাধারণ কুশলী লেখকের সূচনাতেই যে সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে, তা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে, বিচিত্রসৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে 'আপনাকে প্রত্যক্ষ' জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরন্ত আনন্দে, যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন অন্য কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি।' বিশ্বকবির এই বাণীর মধ্যেই শরৎ-সৃষ্টির সমস্ত গুণাবলী প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। জীবন-দর্শনে, মানসিক অবলোকনে, বিশেষ ক'রে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অন্তর্ভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সমবেদনা বিশেষ অনুভূতিসাপেক্ষ। সাহিত্যে বাস্তবতার ও ব্যাপকভাবে ধরলে বর্ত্তমান অতি-কথিত গণ-সাহিত্যের তিনি হচ্ছেন প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। এক কথায় সামাজিক মানুষের হৃদয়-রহস্যের গভীর অতলে ডুব দিয়ে, সেখান থেকে মণি-মাণিক্য সংগ্রহ ক'রে মণিহার গাঁথার প্রকৃত গুণীর আবির্ভাব কোন জাতির জীবনে ক্বচিৎ সংঘটিত ঘটনা, এবং সেদিক থেকে বাঙলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্র এক বৈপ্লবিক আবির্ভাব!

সতের বৎসর বয়সে প্রথম শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সূচনা দেখা দেয় এবং ১৮৯৪ সালে তিনি 'কাশীনাথ' রচনা করেন। বাইশ থেকে চব্বিশ বৎসরের মধ্যে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত 'মন্দির' নামক গল্প ১৩০৯ সালে কুন্তলীন পুরস্কার পায় এবং 'বড়দিদি' প্রথম উপন্যাস হিসেবে 'ভারতী'তে ১৩১৪ সালে এবং যমুনা'তে সর্ব্বপ্রথম রচনা 'বোঝা' নামক গল্প প্রকাশিত হয়। বৈপ্লবিক উপন্যাস হিসেবে ১৩২৯ সালে 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত 'পথের দাবী' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের অসামান্য সাহিত্যিক দান। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এ ধরণের প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্র একক। রাজনৈতিক

কারণে গবর্ণমেণ্ট বইখানি বাজেয়াপ্ত করেন ; পরবর্তীকালে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ব্যতীত শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁর স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় মেলে।

১২৮৩ সালের ১৫শে ভাদ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। জীবনের বহুদিন নানা দুঃখ-দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ব'লে ভাগ্য-বিড়ম্বিত, দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর দরদ ছিল যথেষ্ট। ১৯০৩ সালে নিঃসম্বল অবস্থায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যান এবং ১৯১৩ সালে রেঙ্গুন থেকে ফিরে শিবপুরে বসবাস করতে থাকেন। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের বিক্রয়-সংখ্যা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁর বহু গ্রন্থের কুড়ি-বাইশটি সংস্করণ হয়েছে এবং অধিকাংশই ছায়াছিত্রে রূপায়িত ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ শরৎচন্দ্রের তিরোভাব ঘটে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের মাতুল ও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ। ভাগলপুরে এই গাঙ্গুলী পরিবারেই শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনের কিছুকাল অতিবাহিত করেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে এই মাতুলালয়ের প্রভাব ছিল যেমন গভীর, তেমনি মাতুল সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চিরদিন তাঁর হৃদ্যতাও ছিল নিবিড়। বিশেষ ক'রে আত্মভোলা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনকে বাইরে প্রচার করার মূলে প্রথম দিকে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যম যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথই অগ্রণী হ'য়ে প্রথম শরৎচন্দ্রের জীবনী বিখ্যাত 'কল্লোল' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে বেশীদিন তা সেখানে প্রকাশিত হয়নি।

"কল্লোল"কে কেন্দ্র ক'রে যে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল, তার রচনাকারদের মধ্যে সকলেই যে বয়সে তরুণ ছিলেন তা নয়। এই অ-তরুণ লেখকদের মধ্যেই প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথকে আমরা পাই "কল্লোলের" মধ্যে। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর মনের রমণীয় তারুণ্যের জন্যেই।

খর্ব্বাকৃতি, স্বল্পভাষী, সদাপ্রসন্ন এই মানুষটির কথাবার্ত্তায় আছে রসিকের সরসতা আর ভাষায় আছে মনোহারী মিষ্টতা। কল্লোলের পরে "ভারতবর্ষে" তিনি পুনরায় শরৎ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। বর্ত্তমানে 'শরৎ-পরিচয়' নামে তাঁর একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কিয়দ্দিন "প্রবাহ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। সুরেন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে বেশ একটি মজার ঘটনা আছে। ১৩০৯ সালে এইচ্. বোস প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কুন্তলীন পুরস্কার" নামক বার্ষিক পত্রিকায় তাঁর নামে "মন্দির" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরে জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজের রচিত এই গল্পটি সুরেন্দ্রনাথের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন। "কল্লোল" ব্যতীত "ভারতী" বৈঠকের তৎকালীন সাহিত্যিক ধুরন্ধরদের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। "বারোয়ারি উপন্যাস"-এর বারো জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভূঁইয়াদের, যথা —শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অবদান হচ্ছে "বৈরাগী" নামক উপন্যাস। উপন্যাসখানি জনপ্রিয়তার জন্য বহু বিক্রিত হয়, এবং তদানীন্তনকালে পুস্তক-বিক্রয় ব্যাপারে এ ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পর স্বতঃই সাহিত্যিক মহলে তাঁর সুনাম বিস্তৃতিলাভ করে এবং প্রকাশক মহলেও তাঁর কৃতিত্বের সাড়া জাগে। এই সময় পর পর তাঁর "স্মৃতির আলো" "পূর্ব্বরাগ" "মৃগতৃষা" নামক আরও কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের ভাষা মিষ্টি, ভাব গভীর এবং ঘটনাও অভিনব। সমাজ-জীবনের বাঁধন ভাঙতে তাঁর সাহিত্য যেমন মুখর, তেমনি ভাষার জড়তা ভেঙ্গে তাকে গতি-চঞ্চল ক'রে তুলতে তাঁর লেখনী তেমনি প্রখর। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের মত তাঁর ভাবগুলি খণ্ড খণ্ডভাবে অসংখ্য ফুটকির সাহায্যে পাতার উপর ছড়িয়ে পড়ে। "কল্লোল" যুগের প্রথম দিকটা এই ফুটকির ব্যবহার-বাহুল্য অনেকের মধ্যেই প্রসার লাভ করেছিল—ভাষার জড়তা ভাঙতে অনেকেই এই ফুটকির সাহায্য নিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রভূত নিবন্ধ রচনা করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে জানবার যত সুযোগ সুরেন্দ্রনাথ পেয়েছেন গাঙ্গুলী পরিবারের আর কেউই ততটা পাননি ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

"বৈরাগী" উপন্যাসের লেখক সুরেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক জীবনেও যেমন বাঁধন-হারা, সাংসারিক জীবনেও তেমনি বাঁধন-হারা বৈরাগী। তাঁর ঘর ও বার একই সুরে বাঁধা। এদিক থেকে তাঁর নিষ্ঠা অসাধারণ। আজীবন তিনি শিক্ষাব্রতী, পাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়া তাঁর শিক্ষক জীবনের ব্যতিক্রম ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ উপাধি অর্জ্জন করেন।

১৮৮০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। শরৎচন্দ্রের জন্মের চার বৎসর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান সময় শৈলজানন্দের রচনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হলেও, এক সময়ে তাঁর মত ক্ষমতাশালী দ্রুত-লিখিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব কম ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিছুকাল হ'ল ছায়াচিত্র জগতে পরিচালক ও গল্প লেখক হিসেবে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভ ও প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তাঁর সেই দ্রুত রচনা-শক্তি হ্রাস পায় এবং সাধারণভাবে গল্প উপন্যাস রচনায় ভাঁটা পড়ে। সম্প্রতি তিনি আবার গল্প উপন্যাস রচনায় মনোনিয়োগ করেছেন।

প্রথম দিকে শৈলজানন্দ তাঁর গল্প-উপন্যাসের নরনারী ও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে একটি বিশেষ শ্রেণী ও স্তরকে আশ্রয় করেছিলেন। সাধারণতঃ গ্রাম্য পরিবেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত নরনারীর জীবন-চিত্রই ছিল এর মধ্যে প্রধান। এ ছাড়া আরো নীচে নেমেছিলেন তিনি। কোল, ভীল, সাঁওতাল, ডোম, বাগ্দী, কুলি-মুটে-মজুর প্রভৃতি অপাঙ্‌ক্তেয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর গল্পের উপজীব্য।

সমাজচিত্র নানা দুঃখ-দৈন্য, প্রেম-বিরহের মধ্য দিয়ে প্রথম দিকে তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যা সকল স্তরের মানুষকেই আনন্দ দিয়েছিল অপরিসীম। তাঁর রচিত 'নারী জন্মের' মধ্যে এই ধরণের বহু শ্রেষ্ঠ গল্পের

সন্ধান মেলে। সর্ব্বক্ষেত্রেই বুদ্ধির দৌড়ের চেয়ে অন্তরের আবেগই তাঁর সার্থকতায় প্রধান নিদর্শন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'ঝোড়ো হাওয়া'। ১৯০৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে শৈলজানন্দ জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর পৈতৃক বাস ছিল বীরভূম জেলার রূপসী গ্রামে। বাল্যকালে এবং প্রথম দিকে সাহিত্যিক জীবনেও তাঁকে নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে কাটাতে হয়। 'কালি-কলম', 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে শৈলজানন্দ প্রথম জীবনে সংযুক্ত ছিলেন, এবং পরবর্ত্তীকালে 'সাহানা', 'ছায়া' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে, 'খরস্রোতা', 'আকাশকুসুম', 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'কয়লাকুঠী', 'অনাথ আশ্রম', 'নন্দিনী', 'অভিশাপ' প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সমসাময়িক খ্যাতিমান কয়েকজন লেখকের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তিনি কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি সংখ্যাধিক রচনার পক্ষপাতী নন্। সে-কারণ, অন্যের ক্ষেত্রে সকল সময়ে রচনার একটা নির্দ্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা সমতা বজায় রাখা যেখানে সম্ভব হয় না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা সেখানে ত্রুটিহীন। অত্যন্ত স্বল্পক্ষেত্রেই তাঁর গল্পের অসম্পূর্ণতা বা সমতা-বিপর্য্যয় ঘটতে দেখা যায়। বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন শক্তিমান সাহিত্যিকের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, লেখকের মধ্যে তা সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান এবং অধিকন্তু বুদ্ধি ও আবেগের নিখুঁত ব্যালেন্স সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে, যে রম্যতা সৃষ্টি করে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তার নিখুঁত শিল্পী। অতিশয়োক্তি বর্জ্জিত বর্ণনা, অনাড়ম্বর শব্দবিন্যাস, সকল চরিত্রের প্রতি সম-আন্তরিকতা, গভীর সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়। ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ই তাঁর গল্পকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহ্য ক'রে তোলে। ওস্তাদ তীরন্দাজের দৃষ্টি তাঁর; সে-দৃষ্টিতে মানুষের মনের নিভৃতস্তরের খুঁটিনাটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। একদেশদর্শিতা কোথাও তাঁকে স্পর্শ করেনি, এবং তাঁর ভাষা ভাবের অদ্ভুত অনুগামী।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু গল্পের মধ্যেই বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকার্য্য

নজরে পড়ে। 'শৃঙ্খল', 'বেনামী বন্দর', 'ভস্মশেষ', 'সংসার সীমান্তে', 'কেশবানন্দের তিরোধান' 'তেলিনিপোতা আবিষ্কার' প্রভৃতি এই মতবাদ সমর্থনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম দিকে 'কল্লোল'কে কেন্দ্র ক'রে যে ক'জন মুষ্টিমেয় লেখক খ্যাতিলাভ করেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। বাঙ্গালা দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বহুদিন সাংবাদিক জীবনযাপন করতে হয় এবং নানাভাবে বহু পত্রিকার সম্পাদনা ও সহঃ সম্পাদনা করেন তিনি। 'কালি-কলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাসী', 'সংবাদ', 'নবশক্তি,' 'কবিতা,' 'নিরুক্ত', 'রংমশাল' (ছেলেমেয়েদের) প্রভৃতি পত্রিকাগুলির এ সম্পর্কে নাম করা যায়। কবি হিসেবেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' ও দ্বিতীয় 'সম্রাট' বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্তর্গত। ছেলেমেয়েদের জন্য রচনাতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র সিদ্ধহস্ত।

১৯০৪ সালে বারাণসীধামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষালাভ করেন ঢাকা ও কলকাতায়। বর্ত্তমানে ছায়াচিত্র শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন ব'লে সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কমেনি। সাহিত্যের কথায় বা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে, অন্যান্য সমস্ত কিছুই তিনি বিস্মৃত হয়ে যান।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ স্বনামখ্যাত হ'লেও, শরৎচন্দ্রের এক মাতুল হিসেবে তাঁর অপর একটি বিশেষ পরিচয় ও মর্য্যাদা আছে।

উপেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে অসুন্দর ও অকল্যাণের স্থান নেই। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব হৃদয়গ্রাহী। ঘটনা-বিন্যাসে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ ব'লে এবং প্রধানতঃ রচনার মধ্যে গল্পাংশই প্রধান ব'লে সহজেই মানুষের মনকে তা আকৃষ্ট করে। বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও দক্ষ ব্যবহারজীবীর মতই তিনি শান্ত, ধীর, অথচ যুক্তির অকাট্যতায় মর্ম্মঘাতী। তাঁর 'রাজপথ', 'ছদ্মবেশী', 'বিদুষী ভার্য্যা', 'অভিজ্ঞান' প্রভৃতি রচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁর উপর্য্যুক্ত মন্তব্যের সঙ্গে অবশ্যই একমত হবেন। উপন্যাস, গল্প ব্যতীত প্রবন্ধ, কবিতা এবং সমালোচনাও উপেন্দ্রনাথ বহু লিখেছেন। বারো বৎসর বয়সে 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় 'সন্ধ্যা'

নামক একটি কবিতা তাঁর জীবনের প্রথম রচনা এবং ১৯১২ সালে প্রকাশিত 'সপ্তক' নামক গল্পগ্রন্থখানিই সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম গ্রন্থ। সুদীর্ঘ বারো বৎসর উপেন্দ্রনাথ অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিকপত্রিকা 'বিচিত্রা'র সম্পাদকতা করেন এবং উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে এক নূতন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

উপেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান গ্রন্থসংখ্যা প্রায় সতের-আঠারোখানি। বর্ত্তমানে তিনি তাঁর বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন এবং 'গল্প-ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

মানুষ হিসেবে উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সদালাপী, সুরসিক ও বিচক্ষণ। সাহিত্য ও শিল্প ব্যতীত সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান যথে.। বয়সে প্রবীণ হলেও, বার্দ্ধক্যের জড়তা তাঁকে স্পর্শ করেনি। এখনো হেসে-খেলে, সভা সমিতিতে উপস্থিত হ'য়ে, প্রাণখোলা গল্পগুজব ক'রে নিজেকে তিনি নবীনের মতই প্রফুল্ল রেখেছেন। ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৩ সালে ভাগলপুরে উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। একাকী পথ চলতে চলতে চিন্তাবিলাস উপেন্দ্রনাথের জীবনের এক বিশেষ আকর্ষণ।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

চিরকাল সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে বহু সাহিত্যিকের যেমন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তেমনি বহু সাহিত্যিকও সাংবাদিকতা করেছেন। সরোজকুমারের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন সেদিক থেকে অবিমিশ্রভাবে জড়িত। তাঁর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয় 'আত্মশক্তি' নামক জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত। ব্যক্তিগতভাবে সরোজকুমারের স্বাদেশিক মন তাঁকে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ও তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে আনে। নেতাজীর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং এই সুভাষচন্দ্রই তাঁকে 'আত্মশক্তির' সম্পাদকীয় বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করে দেন। ১৯৩০ সালে 'নবশক্তির' সম্পাদক হিসাবে তিনি একবার কারাবরণ করেন। কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'শৃঙ্খল' নামক একখানি উপন্যাসই তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খ্যাতিবান ক'রে তোলে। ইতঃপূর্ব্বে যদিও তিনি 'আত্মশক্তি', 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' প্রভৃতি পত্রিকায়

নানা ধরণের গল্প ও 'বন্ধনী' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন বটে, কিন্তু 'শৃঙ্খল' তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হিসাবে সর্ব্বজনসমর্থিত হয়। এরপর নানা উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহ-কপোতী', 'সোমলতা', 'মনের গহনে', 'ক্ষণবসন্ত', 'আকাশ ও মৃত্তিকা', 'শতাব্দীর অভিশাপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০৩ সালে হাজারিবাগে সরোজকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসভবন মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং কাব্যচর্চ্চার দিকে অনুরাগী। তাঁর উল্লেখযোগ্য মার্জ্জিত প্রাঞ্জল ভাষার মত তিনি নিজেও অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, শান্ত, সদালাপী ও প্রিয়বাদী। সংযত সাংসারিক পুরুষের যে সকল গুণ থাকাব প্রয়োজন, সরোজকুমারের মধ্যে তার সকলগুলিই বর্ত্তমান।

'আত্মশক্তি' থেকে আরম্ভ করে তিনি 'নবশক্তি', 'বৈকালী', 'নায়ক', 'বাংলাব কথা', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনায় নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আজ কযেক বৎসর নিজেই 'বর্ত্তমান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ কবেছেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল

বর্ত্তমানকালে যে ক'জন বিখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যেব মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে পাঠকের অন্তর জয় করেছেন, প্রবোধকুমার তাঁদেরই অন্যতম। অন্যান্য লেখকদের' তুলনায় অপেক্ষাকৃত যেমন বহু-বৈচিত্র্যেভরা প্রবোধকুমাবেব সাহিত্য, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও। নানা দুঃখ কষ্ট ও নানা রকমেব কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রথম জীবন কাটে। এক সময় সৈন্য ও ডাক বিভাগেও ইনি চাকুরি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্য শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভ্রাম্যমাণ হিসাবে প্রবোধকুমাবেব নাম বিখ্যাত। ভারতের বিভিন্ন দুর্গম পর্ব্বতে, অবণ্যে, জলে স্থলে তিনি অভিজ্ঞতা আহরণ করে বেড়িয়েছেন, আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রেখে দিয়েছেন তাদের বিচিত্র পরিচয। নিবিড় নিসর্গ-নিষ্ঠা ও বিচক্ষণ শিল্পদৃষ্টি না থাকলে এই অপরিচয়েব ক্ষেত্রে, অজানা

রাজ্যের এমন প্রত্যক্ষ রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হ'ত না। এ সম্পর্কে তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' এক অমর কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ নিয়ে এক সময় বাংলা-সাহিত্যের আসরে সবিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি এই গ্রন্থখানির চিত্ররূপ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া 'দেশ দেশান্তর', 'অরণ্য পথ', 'ইতস্ততঃ', 'জল-কল্লোল', এই পর্য্যায়ের নামকরা বই।

প্রবোধকুমারের পিতৃপুরুষের আদিবাস ফরিদপুরে হলেও, ইংরেজী ১৯০৭ সালে কলিকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গল্প-সংগ্রহের মধ্যে 'তরঙ্গ', 'অঙ্গার', 'চেনা ও জানা', 'অঙ্গরাগ', 'শ্যামলীর প্রেম', 'নিশিপদ্ম', 'অবিকল', 'আগ্নেয়গিরি' এবং উপন্যাসের মধ্যে 'প্রিয় বান্ধবী', 'আঁকাবাঁকা', 'তরুণীসঙ্ঘ', 'নবীন যুবক', 'দিবাস্বপ্ন' ও 'মল্লিকা' এবং 'হাসুবানু' যথেষ্ট নাম করেছে। হৃদয়স্পর্শী রসপ্রধান রচনা হিসাবে প্রবোধকুমারের গ্রন্থ জনসাধারণে অন্যান্য গ্রন্থকার অপেক্ষা বহু বিক্রিত হয়। তাঁর মিষ্ট হাতের ছোঁয়াচ প্রত্যেক মানুষের মনকেই স্পর্শ করে।

নরেন্দ্র দেব

কবি-দম্পতি হিসাবে শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর নাম বিখ্যাত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজনের জন্য অপরজনের নাম স্বভাবতঃই মানুষের মনে আসে। বংশ-গৌরবে নরেন্দ্র দেবের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর পিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র দেব সরকার শোভাবাজারের মহারাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এক দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। নরেন্দ্র দেবের পিতার নাম ৺নগেন্দ্রচন্দ্র দেব। ১২৯৫ সালের ২৩শে আষাঢ় কলিকাতায় নরেন্দ্র দেব ভূমিষ্ঠ হন। কিশোর বয়স থেকেই এঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা ও সাহিত্য সাধনার প্রয়াস দেখা দেয়। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখতে হয় এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মত পিতার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনে যেতে হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ নরেন্দ্র দেব অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করার পরই, তাঁর পিতাপুত্রের চিকিৎসা, বৈষয়িক গোলযোগ ও মামলা-মোকদ্দমার ফলে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত

হয়ে পড়েন এবং তাঁহার সংসারে নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দেয়। এই সময় নিরুপায় হয়ে নরেন্দ্র দেবকে কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাকুরীতে ঢুকতে হয়। কিন্তু অপরিণত বয়সে এই সাংসারিক দুরবস্থার মধ্যে রোজগারের চেষ্টায় বিব্রত হয়ে উঠলেও সাহিত্য সেবার প্রতি তাঁর আবাল্য অনুরাগ অব্যাহত থাকে। অধুনা-লুপ্ত "প্রবাহিনী" পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা 'অভিমন্যু-উত্তরা-কাব্য' প্রকাশিত হয়। তিনি বিখ্যাত মাসিক "ভারতী" (অধুনালুপ্ত), "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিবিধ লেখা লিখে আসছেন। তবে প্রধানতঃ কবি হিসাবেই নরেন্দ্র দেব খ্যাত, যদিও উপন্যাস ও গল্প তিনি বড় কম লেখেন নি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "চতুর্ব্বেদাশ্রম" গল্প-পুস্তক এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গরমিল' একখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। তাঁর কাব্যধর্ম্মী মনের প্রথম প্রকাশ মেলে পরবর্ত্তী পুস্তক "বসুধারার" মধ্যে। এই প্রথম কাব্যগ্রন্থই কবি হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে রসিক সমাজে। এর পর ক্রমান্বয়ে তাঁর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। "খেলার পুতুল", "যাদুঘর", "আকাশ কুসুম", "মেঘদূত", "গৌতমের গত জন্ম", "বোঝাপড়া", "আনন্দ মেলা", "পরাগ ও রেণু", "সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র", "সুহাসিনী", "রাজপুতের দেশ" প্রভৃতি বইগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত নরেন্দ্র দেবের নাম ও কাব্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায় "ওমরখৈয়ামে"। তাদের (কবি-দম্পতি) সম্পাদিত "কাব্যদীপালী" আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কাব্য ও সাহিত্য ব্যতীত সিনেমা-শিল্পের প্রতিও নরেন্দ্র দেবের অনুরাগ প্রকাশ পায় তাঁর "সিনেমা" নামক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশে।

নিরহঙ্কার, পরোপকারী কবি নরেন্দ্র দেব। মন স্নেহপ্রবণ এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় ও সভাসমিতিতে অনুরোধ মাত্রই উপস্থিত হওয়ায় আজও তাঁহার অদম্য উৎসাহ।

নরেন্দ্র দম্পতির ভ্রমণের নেশা অপরিসীম। সম্প্রতি সস্ত্রীক তাঁরা একমাত্র কন্যাসহ ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। উক্ত কাহিনী "দেশ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নরেন্দ্র দেব "পাঠশালা" নামক ছেলেমেয়েদের একখানি মাসিক পত্রিকা পনর বৎসর ধরে সম্পাদনা করছেন।

রাসবিহারী মণ্ডল

আধুনিক পাঠক শ্রেণীর নিকট রাসবিহারীবাবু খুব বেশী পরিচিত না হলেও, সত্যিকার সাহিত্যরসিকের মনে আজও তাঁর স্থান অটুট আছে। এর প্রধান কারণ তাঁর 'অগ্নি-পরীক্ষা', 'স্ফুলিঙ্গ', 'আগাছা', 'ঝিকিমিকি' প্রভৃতি উপন্যাস যাঁরাই পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে তাঁকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

বৰ্দ্ধমান জেলার সোনা পলাশী গ্রামে বাঙ্গালা ১৩০২ সালের ৭ই মাঘ রাসবিহারী মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন, এবং ১৯১৪ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে, ইউনিভারসিটি ল'কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দেন। তারপর পুলিশ কোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি বহুকাল নিযমিত লিখেছেন এবং এখনও মধ্যে মধ্যে লিখে থাকেন। 'অর্চ্চনা' নামক মাসিক পত্রিকা ও 'বাতায়ন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর 'প্রদীপ ও শিখা' নামক উপন্যাস বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। অধুনালুপ্ত 'অঞ্জলি' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা এঁর সম্পাদনায় কিছুকাল সগৌরবে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে দেশ-ভ্রমণ, অঙ্কন ও সৌখীন রন্ধনে রাসবিহারীবাবুর যথেষ্ট সখ দেখা যায়। ছাত্রজীবনে তিনি একজন সুঅভিনেতাও ছিলেন। ব্যবহারজীবাদের মধ্যে এমন পরোপকারী সহৃদয় সাহিত্যিক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

অধুনা সাহিত্যিক হিসাবে অবিনাশচন্দ্রের নাম পাঠকমহল বিস্মৃতপ্রায় হলেও, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, অবিনাশচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। সত্যিকার এমন একজন নাম-যশাকাঙ্ক্ষাহীন, উদার, আত্মভোলা সাহিত্যিক আমাদের দেশে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যের জন্য সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া, এবং

সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বৈরিতার যে তাপ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এদেশের সাহিত্যিকদের বরণ করে নিতে হয়েছে,—অবিনাশচন্দ্রের জীবনে তা ঘটেছে বিচিত্রভাবে। বড় হবার, প্রখ্যাত হবার, লক্ষ্মীর বরপুত্র হবার সমস্ত সম্ভাবনাকে তিনি স্বেচ্ছায় সরিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবন থেকে। এ কথা বলছি এই কারণে যে, তিনি যে শক্তির অধিকারী ছিলেন, যে সুযোগ-সুবিধা তাঁর করায়ত্ত ছিল, তার সদ্ব্যবহার করা কিছুই বিচিত্র ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু দারিদ্র্যের নির্লজ্জ স্বরূপ, রিক্ততার রুক্ষমূর্ত্তি, অভাবের অভাবনীয় স্বাদ উপলব্ধি করার মোহ তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল,—তার সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্ব্বিশঙ্ক মন নিয়ে তাই তিনি ঐশ্বর্য্যের দিকে হাত বাড়ান নি—সব সময়েই যেন স্বেচ্ছায় থাকতে চেয়েছেন বিষয় বাসনা থেকে দূরে।

বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী অবিনাশচন্দ্র। স্বল্পভাষী ও রসিক। সত্যিকার সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সবার উপর। অসূয়ার বিষ তাঁর স্থান পায় নি ব'লে সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁর কাছে সম্মানের ও সমাদরের। অত্যন্ত বাল্যাবস্থা থেকে অবিনাশচন্দ্র সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর শিক্ষাকাল কাটে। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মাত্র কয়েক বৎসর তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে উক্ত ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মনে-প্রাণে ছাত্রজীবন হতেই শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। শরৎ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর শ্রদ্ধা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। শরৎচন্দ্রের সমূহ রচনার বিভিন্ন চরিত্র, তাদের বক্তব্য এবং বিশেষ বিশেষ পঙক্তি তাঁর কণ্ঠস্থ। সে কারণ, শরৎচন্দ্রের প্রভাব তাঁর রচনার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থের নাম 'ঝড়ের পরে'। 'ঝড়ের পরের' সাফল্য তাঁকে পরবর্ত্তীগ্রন্থ 'তচনচ' নামক উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করে। 'ঝড়ের পরে' সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রচারলাভ করে এবং বহুকথিত গ্রন্থ 'তচনচ' উপন্যাসখানি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র লেখেন, 'তচনচ' বইটা খুবই চমৎকার হয়েছে। বইটা পোষ্টে পেয়েই আমি একরাত্রে পড়ে ফেলেছিলুম।" প্রকৃতপক্ষে এই বইখানি রসিক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের চরম সাফল্য হিসাবে পরবর্ত্তী রচনা 'সব মেয়েই সমান' বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের কারণ হয়—সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক ও সাহিত্যিক

মহলে, লেখক ও তাঁর গ্রন্থ বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর রচনা সম্বন্ধে 'বাংলা-সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত একস্থানে লিখেছেন, "যৌনবৃত্তির নানা ব্যতিক্রম স্বাভাবিক জীবনের ও সহজ ভব্যতার আড়াল থেকে কি করে জীবনে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, অবিনাশচন্দ্র তা অনাবৃত করে দেখিয়েছেন এবং তাতে দুঃসাহসের অভাব নেই।"

অবিনাশচন্দ্রের এবম্বিধ সাহিত্যিক প্রতিভা থাকা ও প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনা বাধা প্রাপ্ত হয় "বাতায়ন" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ফলে। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক "বাতায়ন" অল্পকালের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক লাভালাভের উপর নির্ভর না করেই দীর্ঘদিন সর্ব্বশক্তি নিয়োগ ক'রে তিনি এই পত্রিকা পরিচালনা করেন। "কল্লোল যুগ" গ্রন্থে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অবিনাশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "অবিনাশ ঘোষাল ··প্রথমে সাহিত্যিক পরে সাংবাদিক।·· ক্ষয়োদয়রহিত একনিষ্ঠ সাধক—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। ·মলয় হাওয়ার আশায় সারাজীবন সে পাখা করতে প্রস্তুত, এত সুবুদ্ধিময় তার কাজ।"

শরৎচন্দ্রের প্রতি আবাল্য শ্রদ্ধা, শরৎ সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ, সাংবাদিক জীবনেও শরৎ সাহিত্যের প্রচার অবিনাশচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। ঐ কথা শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতির মধ্যেও নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মূলতঃ সমসাময়িক সাহিত্যিকদের পক্ষে অবিনাশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ শেষ করা কখনই সম্ভবপর নয়। অবিনাশচন্দ্র সম্বন্ধে সাহিত্যজগতেব অন্যতম দিক্‌পাল মনীষী প্রথম চৌধুরী একবার এই সাহিত্য প্রসঙ্গেই তাঁকে লিখেছিলেন, "তোমায় বহুত বহুত সেলাম অবিনাশ, বহুত বহুত সেলাম।" এই উক্তি থেকে অবিনাশচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি যে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, এ সম্বন্ধে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত "মহারাজা সমীপে" একটি প্রবন্ধ তার বিশেষ সাক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, প্রথম দিকে, যাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এই সাহিত্যিক খ্যাতির সম্ভাবনা দেখা দিত না, তিনি হচ্ছেন 'হিমানী'-খ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও সাহিত্যানুরাগী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ র সম্পাদিত "নিরুপমা বর্ষস্মৃতি"তে অবিনাশচন্দ্রের প্রথম গল্প "স্বামী" প্রকাশিত হয়। শরৎ সাহিত্যের গুণাগুণ প্রচার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা অতুলনীয়। দেশের

বিভিন্ন ইংরেজী সংবাদপত্রে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নানা নিবন্ধ তিনি রচনা ও আলোচনা করেছেন। সাংবাদিক জীবনে "সার্ভেন্ট" পত্রিকার সহিত তাঁর বিশেষ যোগ ছিল।

১৩০৬ সালের ২১শে ফাল্গুন কলিকাতাতেই অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলার অযোধ্যা গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাসভূমি। পৈতৃক সে-গ্রামের সঙ্গে বর্ত্তমানে তাঁর বিশেষ যোগ নেই।

বিশু মুখোপাধ্যায়